শরীয়াহ্ আইন
ও দণ্ডবিধির প্রয়োগ

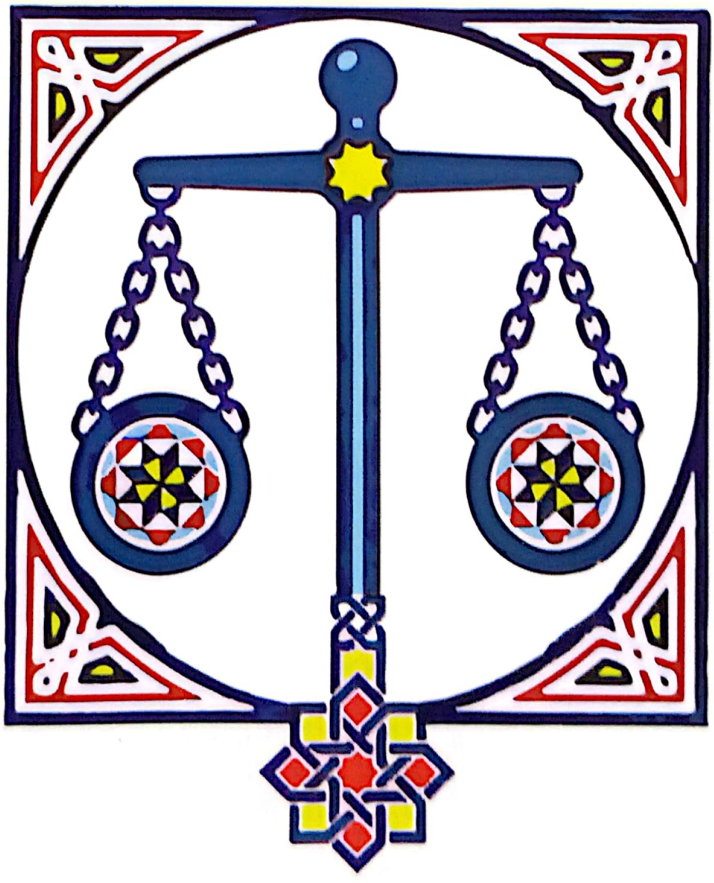

ড. মুহাম্মদ আবু ইউসুফ

শরীয়াহ্ আইন ও দণ্ডবিধির প্রয়োগ

শরীয়াহ্ আইন ও দণ্ডবিধির প্রয়োগ

ড. মুহাম্মদ আবু ইউসুফ

বাংলাদেশ ইনিশিয়েটিভ অব রিসার্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (বার্ডস)
বাড়ি # ৪, রোড # ৩/২, ব্লক-এ, ঢাকা উদ্যান, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

শরীয়াহ্ আইন ও দণ্ডবিধির প্রয়োগ

ড. মুহাম্মদ আবু ইউসুফ

© ড. মুহাম্মদ আবু ইউসুফ

প্রথম প্রকাশ:
এপ্রিল ২০২৬

প্রচ্ছদ : নির্ঝর নৈঃশব্দ্য

মূল্য : ৫০০ টাকা

প্রকাশক:

বাংলাদেশ ইনিশিয়েটিভ অব রিসার্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (বার্ডস)
বাড়ি # ৪, রোড # ৩/২, ব্লক-এ, ঢাকা উদ্যান মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

Shariah Ain O Dondabidhir Proyog (Application of Shariah Law and Penal Code) by Dr. Mohamad Abu Yousuf
Publised by Bangladesh Initiatives of Research & Development Society (BIRDS), Home # 4, Road # 3/2, Block-A, Dhaka Uddan, Mohammadpur, Dhaka-1207, Bangladesh

ISBN: 978-984-35-8960-6

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয়
বাবা মরহুম আলী আহমেদ
ও
মা বেগম শামসুন নাহার

আমার জীবনের প্রতিটি প্রাপ্তির নেপথ্যে রয়েছে
তাদের ত্যাগ, অনুপ্রেরণা, দোয়া ও আদর্শ।
আজ তাঁরা আল্লাহর জিম্মায়,
কিন্তু তাদের শিক্ষা, স্নেহ ও প্রেরণা আমার অন্তরে অম্লান।
রূহের মাগফিরাত কামনা করে এই সামান্য প্রয়াস
তাদের পবিত্র স্মৃতির প্রতি বিনম্রভাবে নিবেদন করলাম

মুখবন্ধ

সমসাময়িক বিশ্বে শরিয়াহ্ আইন নিয়ে নানা বিতর্ক, অপপ্রচার ও ভুল ব্যাখ্যা প্রচলিত রয়েছে। বিশেষত দণ্ডবিধির প্রয়োগকে কেন্দ্র করে ইসলামী আইনকে অনেক সময় কঠোর, অমানবিক বা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে অক্ষম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। অথচ শরিয়াহ্ আইন একটি পূর্ণাঙ্গ ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থা, যার মূল উদ্দেশ্য মানবকল্যাণ, সামাজিক ভারসাম্য এবং নৈতিক শৃঙ্খলার সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

ড. মুহাম্মদ আবু ইউসুফ রচিত 'শরিয়াহ্ আইন ও দণ্ডবিধির প্রয়োগ' গ্রন্থটি এ বিষয়ে একটি সময়োপযোগী ও গবেষণাধর্মী প্রয়াস। লেখক কুরআন, সুন্নাহ্, ফিকহি ব্যাখ্যা এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের আলোকে শরিয়াহ্ দণ্ডবিধির দর্শন, উদ্দেশ্য ও বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন।

লেখক এখানে দেখিয়েছেন শাস্তি ইসলামের মূল লক্ষ্য নয়; বরং অপরাধ প্রতিরোধ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সমাজকে অনৈতিকতা থেকে রক্ষা করাই শরিয়াহ্ আইনের প্রধান উদ্দেশ্য। যুক্তি, দলিল ও তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, শরিয়াহ্ আইন কেবল শাস্তিমূলক নয় বরং একটি সমন্বিত ন্যায়বিচার কাঠামো। এই গ্রন্থ পাঠককে আবেগ নয়, যুক্তির ভিত্তিতে শরিয়াহ্ আইনকে বুঝতে সহায়তা করবে এমন প্রত্যাশা করা যায়।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
ইসলামি স্কলার, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব,
চেয়ারম্যান, মসজিদ কাউন্সিল

ভূমিকা

শরীয়াহ আইন নিয়ে সমকালীন বিশ্বে যেমন গভীর আগ্রহ বিদ্যমান, তেমনি রয়েছে বিস্তর বিতর্ক, সংশয় ও বিভ্রান্তি। "শরীয়াহ" শব্দটি আরবি "শারআ" ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ সুস্পষ্ট পথ বা বিধিবদ্ধ জীবনদর্শন। ইসলামী পরিভাষায় শরীয়াহ বলতে বোঝায় আল্লাহ প্রদত্ত সেই সামগ্রিক নীতিমালা, যা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে নৈতিক ও আইনি কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত করে। এ আইন কেবল দণ্ডবিধির সমষ্টি নয় বরং ইবাদত, আচার-আচরণ, লেনদেন, পরিবারব্যবস্থা, বিচার প্রক্রিয়া ও শাসন নীতির সমন্বিত নির্দেশনা।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যেখানে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র সবক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট নীতিমালা নির্ধারিত হয়েছে। তবে শরীয়াহ ও ফিকহের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য অনুধাবন করা জরুরি। শরীয়াহ হলো ঐশী উৎসভিত্তিক মূলনীতি যার ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাহ। আর ফিকহ হলো সেই নীতিমালার মানব-ব্যাখ্যাত ও প্রণীত আইনগত রূপ। ফলে শরীয়াহ্‌র উদ্দেশ্য (মাকাসিদুশ শরিয়াহ্) চিরন্তন হলেও তার প্রয়োগ, ব্যাখ্যা ও বিধানিক রূপায়ণ সময়, সমাজ ও বাস্তবতার আলোকে পরিবর্তনশীল হতে পারে। ইসলামী আইনশাস্ত্রের ইতিহাসে বিভিন্ন মাযহাবের উদ্ভব এবং একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ফিকহী মতামত এই গতিশীলতার প্রমাণ বহন করে।

শরীয়াহ আইনের বিশ্লেষণে সাধারণত দুটি স্তর বিবেচ্য নীতিগত ও প্রয়োগিক। নীতিগত স্তরে শরীয়াহর মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, মানবজীবন, ধর্ম, বুদ্ধি, সম্পদ ও বংশরক্ষা নিশ্চিত করা। অর্থাৎ আইন এখানে মূলত কল্যাণমুখী, শাস্তিমুখী নয়। প্রয়োগিক স্তরে দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারা হুদুদ, কিসাস ও তাজির আলোচিত হয়, যা কঠোর প্রমাণপদ্ধতি, সাক্ষ্যগ্রহণের নির্দিষ্ট মানদণ্ড এবং ন্যায়সংগত বিচার প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। ইসলামী ঐতিহ্যে সামাজিক ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত পূরণ ছাড়া দণ্ডবিধি কার্যকর করার প্রশ্ন উত্থাপিত হতো না।
বর্তমান বিশ্বে শরীয়াহ আইন বিভিন্ন দেশে ভিন্নভাবে প্রচলিত। কিছু রাষ্ট্রে এটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় আইন ব্যবস্থার অংশ; কোথাও পারিবারিক আইন যেমন বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ; আবার কোথাও ব্যক্তিগত ও

নৈতিক দিক নির্দেশনা হিসেবে চর্চিত। দেশ, কাল ও স্থানভেদে সামাজিক সংস্কৃতি, রাজনৈতিক কাঠামো, সাংবিধানিক ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক আইন ব্যবস্থার প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে এর প্রয়োগে ভিন্নতা দেখা যায়। ইসলামী আইন চিন্তায় সময় ও প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের সঙ্গে বিধানের প্রয়োগে ভিন্নতার স্বীকৃতি রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রেও একটি সতর্কতা জরুরি। শরীয়াহর নামে কখনো কখনো কিছু গোষ্ঠী বা শাসক শ্রেণি আইনকে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক আধিপত্য বা ভীতি-সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। বিচার বহির্ভূত শাস্তি, ফতোয়ার অপব্যবহার, নারীর অধিকার খর্ব করা কিংবা প্রমাণবিহীন দণ্ড প্রয়োগ শরীয়াহর মৌলিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ শরীয়াহর লক্ষ্য শাস্তির প্রদর্শন নয় বরং ন্যায়, নিরাপত্তা ও সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা।

'শরিয়াহ্ আইন ও দণ্ডবিধির প্রয়োগ' গ্রন্থে লেখক প্রথমে শরিয়াহ্ আইনের মৌলিক ধারণা, উদ্দেশ্য (মাকাসিদুশ শরিয়াহ্) এবং ন্যায়বিচারের দর্শন বিশ্লেষণ করেছেন। এরপর হুদুদ, কিসাস ও তাজিরসহ দণ্ডবিধির বিভিন্ন দিক আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, এসব বিধান অপরাধ প্রতিরোধ, সামাজিক স্থিতি ও ন্যায়সংগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রণীত। পাশাপাশি আধুনিক আইনব্যবস্থার সঙ্গে শরিয়াহ্ আইনের কিছু দিক তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যাতে পাঠক একটি সামগ্রিক ও প্রেক্ষিতনির্ভর ধারণা লাভ করতে পারেন।

সার্বিকভাবে এই গ্রন্থের লক্ষ্য হলো শরীয়াহ আইন সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা দূর করা, আবেগ নির্ভর অবস্থানের পরিবর্তে জ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা এবং শরীয়াহ্-কে শাসনের হাতিয়ার নয় বরং ন্যায়ভিত্তিক সামাজিক কল্যাণের একটি নৈতিক কাঠামো হিসেবে অনুধাবনের পথ সুস্পষ্ট করা।

মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, বার এট-ল
সিনিয়র আইনজীবী
আপিল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা

লেখকের কথা

শরিয়াহ্ আইন ও দণ্ডবিধি নিয়ে বর্তমান বিশ্বে যে বিতর্ক ও বিভ্রান্তি বিরাজমান, তা আমাকে দীর্ঘদিন ধরে ভাবিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মরহুম ড. আফতাব আহমদের তত্বাবধানে 'বাংলাদেশের সমাজে ধর্মের ব্যবহার, অপব্যবহার, অসদ্ব্যবহার ১৯৯১-২০০১ঃ ফাতওয়ার একটি রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' বিষয়ের ওপর পি.এইচ.ডি করতে গিয়ে একজন গবেষক ও শিক্ষাবিদ হিসেবে আমি উপলব্ধি করেছি শরিয়াহ্ আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও দর্শন স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা সময়ের দাবি। এই গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য শরিয়াহ্ দণ্ডবিধির মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক দিক তুলে ধরা। অনেক সময় শরিয়াহ্ আইনকে কেবল শাস্তিমূলক কাঠামো হিসেবে দেখানো হয়; কিন্তু বাস্তবে এ আইন একটি সমন্বিত ন্যায়বিচার ব্যবস্থা, যার ভিত্তি আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনা এবং মানবকল্যাণের দর্শন।

আমি চেষ্টা করেছি কুরআন, সুন্নাহ্ ও ফিকহি ব্যাখ্যার আলোকে বিষয়গুলো যুক্তি ও দলিলসহ উপস্থাপন করতে। আবেগ বা প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার মাধ্যমে পাঠকের সামনে একটি সুসংহত ধারণা তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে লেখা নয় বরং জ্ঞানভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে শরিয়াহ্ আইন সম্পর্কে সুষম উপলব্ধি তৈরি করাই লক্ষ্য। আল্লাহ আমাদের সকলকে ন্যায় বুঝার ও প্রতিষ্ঠা করার তাওফিক দান করুন।

বইটি নির্ভুল করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল ত্রুটি, অসঙ্গতি থেকে গেলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। একইসঙ্গে, গ্রন্থে ভুল-ত্রুটি বা সংশোধনযোগ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা যথাযথভাবে সংশোধনের প্রয়াস নেওয়া হবে। গ্রন্থটি সম্পর্কে মতামত, সংযোজন-বিয়োজন ও পরামর্শ একান্তভাবে কাম্য।

ড. মুহাম্মদ আবু ইউসুফ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রসঙ্গ কথা ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্ম, মানব জীবন ও মানুষের কল্যাণে ইসলাম ২২

ধর্মের শব্দের অর্থ ২৩

ধর্মের সংজ্ঞা ২৫

ধর্মের উৎপত্তি ৩৪

ধর্ম ও মানব জীবন ৪৭

ধর্ম ও সংহতি ৫১

স্বভাবধর্ম ৫৫

ইসলাম ৫৫

মানবকল্যাণে ইসলাম ৫৮

জীবনের নিরাপত্তা ৫৯

ব্যক্তিগত সম্পদের নিরাপত্তা ৬৫

মান সম্মানের নিরাপত্তা ৭০

ব্যক্তি স্বাধীনতার নিরাপত্তা ৭৮

ন্যায় বিচার ৮১

সদাচরণ ৮৪

অসহায়দের সেবা করা ৯০

প্রতিবেশীদের অধিকার ৯৩

পরিবারের অধিকার ৯৫

সন্তানদের অধিকার ৯৭

অমুসলিমদের অধিকার ১০০

ধর্মীয় অধিকার ১০৩

সামাজিক অধিকার ১০৩

পরিবেশ সংরক্ষণ ১০৪

ইসলামে পারস্পরিক অধিকার ১০৫

ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা ১০৭

রোমান সমাজে নারীর অবস্থান ১১০

হিন্দু ধর্মে নারী ১১১

খৃষ্ট সমাজে নারী ১১২

বৌদ্ধ ধর্মে নারী ১১৩

ইহুদি ধর্মে নারী ১১৪

ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা ১১৪

নারীর পারিবারিক অধিকার ১১৮
নারীর অর্থনৈতিক অধিকার ১২৪
নারীর সামাজিক অধিকার ১২৪
নারীর রাজনৈতিক অধিকার ১২৬
নারীর আইনগত অধিকার ১২৭

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামের কতিপয় প্রায়োগিক বিধান ১৩০
ইসলামে বিবাহ ১৩০
বিবাহ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ ১৩২
পাত্র পাত্রী নির্বাচন ১৩৪
তালাক ১৩৭
তালাক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ১৩৯
তালাক দানের পদ্ধতি ১৪১
তালাক সম্পর্কিত কুরআনের বক্তব্যের নির্যাস ১৪৫
তালাকের শ্রেণি বিভাগ ১৪৮
তালাকে সুন্নাত ১৪৮
তালাকে বিদআত ১৪৯
তালাক প্রয়োগের শর্ত ও ইসলামী দর্শন ১৫০
হিলা ১৫৪
নেকাহ্ তাহলীল ১৫৬
ইসলামী শরীয়তে এ ধরনের বিয়ের অবস্থান ১৫৮
তাহলীল সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত ১৬০
যেনা বা ব্যভিচার ১৬১
যেনার স্বাক্ষী ১৬৩
যেনার শাস্তি ১৬৪
সাক্ষ্যদানের পদ্ধতি ১৭৩
শাস্তি কার্যকর করার পদ্ধতি ১৭৫
শাস্তি কার্যকর করার পরিবেশ ১৭৭
ইসলামের দৃষ্টিতে ফাতওয়ার প্রয়োগিক বিধান ১৮০
ইসলামী দণ্ডবিধি (হদ) ১৮১
সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় করণীয় ১৮৪
উপসংহার ১৮৫
গ্রন্থপঞ্জি ১৮৬

প্রথম অধ্যায়
প্রসঙ্গ কথা

পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে ধর্ম মানব সমাজের একান্ত সহযাত্রী হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় দেখা যায়, মানুষ ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে সে সময় থেকে অদ্যাবধি ধর্মের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। ধর্ম অস্বীকারকারী ও সম্পূর্ণ ধর্মত্যাগীদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। এ কারণে মানব সমাজে ধর্ম একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। তাই মানব জাতির যাত্রালগ্ন থেকে ধর্ম ও সমাজের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এর কয়েকশত বছরের ইতিহাস পাঠে জানা যায় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে ধর্ম তাদের আদর্শ হিসেবে কাজ করেছে এবং ধর্মকে কেন্দ্র করে এক একটি সভ্যতা মানব জাতিকে জ্ঞান ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় চীন, মিশর, পারস্য, বেবিলন, ভারত, রোমান ও গ্রীক প্রতিটি সভ্যতা ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তবে একথাও ঠিক যে বিভিন্ন সময়ে ধর্মের অনুসারীরা সংকীর্ণ ব্যক্তি ও গোষ্ঠি স্বার্থে ধর্মের অপব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার করেছে। কখনো কখনো কেউ হয়ত সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা না করে গোঁড়ামীর আশ্রয় নিয়েছে, আবার কখনো এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, ধর্মকে গণস্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। এটি অনেকক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলা যেতে পারে। তথাপি সভ্যতার বিনির্মাণে ধর্মের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কারো কারো মতে, ধর্মই সকল দ্বন্দ্ব ও অশান্তির মূল। তাদের ধারণা মতে, অতীতে ধর্মকে কেন্দ্র করে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ ও অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। তাদের এ ধারণা কতখানি সঠিক ও যুক্তিযুক্ত বিষয়টি সত্যিকার অর্থে খতিয়ে দেখলে এর আসল কারণ বেরিয়ে আসবে।

পৃথিবীতে সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহ, অন্যায়, অবিচার ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের কতভাগ ধর্মকে কেন্দ্র করে আর কতভাগ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা, সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জন ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার জন্য তার পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষা করলেই আসল কারণটি বেরিয়ে আসবে।

পটভূমি ও সমস্যা নির্ধারণ

সমাজের সাথে ধর্মের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। সমাজের সাথে সংস্কৃতির এবং তার ধারক মানব গোষ্ঠির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ফলে ধর্মের সাথে শুধু যে সমাজের যোগসূত্র রয়েছে তাই নয়, ধর্মের সাথে সংস্কৃতিরও নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। সমাজের সংহতি বিধানে ধর্মের ভূমিকা অনস্বীকার্য ও অপরিহার্য। কেননা মানুষ পরস্পরের সঙ্গে নিরন্তন আদান-প্রদান, লেনদেন, সম্ভাব ও সংঘাতে লিপ্ত থাকে। এমতাবস্থায় তার মধ্যে পাশবিকতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এ পাশবিকতাকে দমনের জন্য কোনো একটি বিশেষ ব্যবস্থা বা পদ্ধতির প্রয়োজন। সে ব্যবস্থা একমাত্র এবং কেবলমাত্র ধর্মের মাধ্যমেই সম্ভব। মানুষের মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও পরিশীলিত জীবন ধর্ম নির্ভর। কেবলমাত্র এটিই সমাজের মূল্যবোধকে বিশ্বাসের একতা দিয়ে বিপদাপন্ন ব্যক্তি ও ভঙ্গুর সমাজকে রক্ষা করে। ধর্ম মানব জীবনের পাশবিকতা ও হীনস্বার্থ সিদ্ধির অপচেষ্টাকে হ্রাস করে, আশাহতের বেদনাকে লাঘব করে সমাজকে করে সুসংহত।

ইসলাম আল্লাহ তা'য়ালার মনোনীত একমাত্র দ্বীন-একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মানব জাতির জন্য আল্লাহ তা'য়ালার প্রেরিত এই জীবন ব্যবস্থার সকল বিধি-বিধান কুরআন সুন্নাহর বিধি বিধানের ওপর নির্ভরশীল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নবুওয়াতী জীবনের দীর্ঘ ২৩ বছর এই বিধানকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ধারণ করেছেন এবং নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছেন অনাগত কালের মানব গোষ্ঠী তার জীবন পথে কীভাবে ইসলামকে মেনে চলবে। এর মধ্যে তিনি প্রমাণ করেছেন ইসলামের একটি বিধানও এমন নেই যা মানুষের জীবনে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। মানুষের ওপর আল্লাহর কি অধিকার, তার প্রতি মানুষের কি কর্তব্য এবং মানুষের প্রতি কি দায়িত্ব রয়েছে সে সম্পর্কেও ইসলাম এক সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনকে সর্বাংশে সুন্দর ও পরম সৌহার্দপূর্ণ করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইসলাম এসেছে।

ইসলাম জ্ঞান ও বিবেকের সাথে সঙ্গতি রেখে পৃথিবীর সকল ধর্মের ওপর নিজ শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণ করেছে, সমন্বয় সাধন করেছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে। এতে রয়েছে মানব জীবনের পূর্ণ বিকাশ, সহজ স্বচ্ছন্দ গতি ও পরিণতির দিক নির্দেশনা- যা মানবিক সুবিচার ও শান্তির গ্যারান্টি। এখানেই ইসলাম ও তার মহান নবীর শ্রেষ্ঠত্ব ও অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা অন্য কোনো শান্তি ও মুক্তির বার্তা বাহকগণের ক্ষেত্রে খুব কম দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হলো আল্লাহর বিধান ও রাসুলুল্লাহ

(সা.) এর জীবন আদর্শের প্রতি নিরঙ্কুশ ও অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণ। ইসলামি জীবন ব্যবস্থার বাইরে অন্য কোনো কিছুই মানব জাতির জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। এবং এটি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যও নয়। তাই ইসলামের পূর্ণতা, মৌলিকত্ব ও স্বাতন্ত্র পরীক্ষিত ও কালোত্তীর্ণ। মানব জাতির জন্য ইসলামি বিধানের মধ্যে রয়েছে সার্বিক কল্যাণ, সামাজিক শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও মুক্তির বিধান। ইসলামই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যেখানে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত। ইসলাম দলমত, ধর্ম-বর্ণ, সাদা-কালো, নির্বিশেষে সকলের মুক্তি ও কল্যাণের নিশ্চয়তা। ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় আইন (শরীয়াহ) একটি কেন্দ্রীয় উপাদান। শরীয়াহ কেবল ইবাদত সংক্রান্ত বিধান নয় বরং ব্যক্তি, পরিবার, অর্থনীতি, বিচার ও রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালা নির্ধারণ করে। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো দণ্ডবিধি যার উদ্দেশ্য অপরাধ দমন, ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু সমকালীন বিশ্বে শরীয়াহ্ দণ্ডবিধি নিয়ে বিভ্রান্তি ও বিতর্ক রয়েছে। কেউ একে মানবাধিকার বিরোধী বলে আখ্যায়িত করেন, আবার কেউ কেউ সর্বোত্তম ন্যায়ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করেন। বাস্তবে তাত্ত্বিক কাঠামো, ঐতিহাসিক প্রয়োগ ও আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বাস্তবতার মধ্যে একটি জটিল সম্পর্ক বিদ্যমান। 'শরীয়াহ আইন ও দণ্ডবিধির প্রয়োগ' গ্রন্থে এই জটিল প্রশ্নগুলোকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। তাই এই গবেষণা গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে একটি বিশ্লেষণাত্মক কাঠামো নির্মাণ করবে।

গবেষণার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ধর্ম একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শক্তি। এটি জনমতের উৎসও বটে। সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষের ধর্মবিশ্বাস তার রাজনৈতিক চেতনাকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। রাজনীতি বিজ্ঞানও তাই ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে একেবারে উদাসীন নয়। পৃথিবীতে ধর্মের মাধ্যমে যেমনি সমাজ, দেশ ও সভ্যতা গড়ে উঠেছে তেমনি আবার ধর্মকে কেন্দ্র করে অথবা ভুল বুঝাবুঝির কারণে সমাজ, দেশ ও সভ্যতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসের মতো আমাদের বাংলাদেশের সমাজেও বিভিন্ন সময়ে রাজনীতির মতো ধর্ম ও ধর্ম কেন্দ্রিক বিভিন্ন বিষয়ে নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। বিশেষ করে '১৯৯১-২০০১' দশকে ফতোয়াকে ঘিরে যে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে গ্রামীণ সালিশ, আত্মহত্যা, মামলা-মোকদ্দমা, গ্রেফতার, সামাজিক আতঙ্ক, আর্থিক ক্ষতি এবং দীর্ঘস্থায়ী ভীতির পরিবেশ তা শুধু একটি ধর্মীয় ইস্যু নয় বরং একটি বহুমাত্রিক সামাজিক সংকট। এটি মূলত একিট

চিরচেনা কায়েমী স্বার্থবাদী ইসলাম বিদ্বেষীদের তৈরি করা একটি নাটক। অনেক ক্ষেত্রে দরিদ্র মানুষ জমি-জমা বিক্রি করে আইনি জটিলতা মোকাবিলা করেছে, কেউ গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে, কেউ বা সামাজিক অপমান ও মানসিক চাপে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে ধর্মীয় সিদ্ধান্তের নামে সংঘটিত যে কোনো অপপ্রয়োগ সমাজের দুর্বল শ্রেণির ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এই প্রেক্ষাপটে 'শরীয়াহ আইন ও দণ্ডবিধির প্রয়োগ' গ্রন্থকে সামনে রেখে গবেষণাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ-

১. প্রকৃত শরীয়াহ আইন ও স্থানীয় অনিয়ন্ত্রিত সালিশি প্রথার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করবে।

২. শরীয়াহর মূল উদ্দেশ্য মানবকল্যাণ, জীবন ও মর্যাদার সুরক্ষা-এর আলোকে বাস্তব ঘটনার মূল্যায়ন করবে।

৩. ধর্মীয় বিধানের অপব্যাখ্যা, রাজনৈতিক প্রভাব ও গণমাধ্যমের ভূমিকা বিশ্লেষণের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

৪. সামাজিক আতঙ্ক ও আইনি জটিলতার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব চিহ্নিত করবে।

৫. ভবিষ্যতে ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও রাষ্ট্রীয় আইনসম্মত কাঠামো প্রণয়নে নীতি নির্ধারকদের জন্য সুপারিশ প্রদান করবে।

একদিকে যেমন ধর্ম ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে একাডেমিক আলোচনায় অবদান রাখবে, অন্যদিকে তেমনি গ্রামীণ সমাজে ধর্মীয় সিদ্ধান্তের প্রয়োগ সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যাগুলোর একটি সমন্বিত চিত্র উপস্থাপন করা হবে। এটি প্রমাণ করবে যে শরীয়াহর প্রকৃত দর্শন দমন বা ভীতি সৃষ্টি করা নয় বরং ন্যায়, ভারসাম্য ও সামাজিক সংহতি নিশ্চিত করা। অতএব, এই গবেষণা শুধু একটি ধর্মীয় বা আইনি আলোচনায় সীমাবদ্ধ না থেকে সামাজিক ন্যায়, মানবাধিকার, প্রশাসনিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার সমন্বিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় বিধানের সঠিক উপলব্ধি ও প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য এই গবেষণা গ্রন্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা

ধর্ম মানব জীবনে সামাজিক শৃঙ্খলা, ন্যায় ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। ইসলামের ক্ষেত্রে এই প্রভাব আরও সুস্পষ্ট, কারণ শরীয়াহ্ কেবল আধ্যাত্মিক দিক নয় বরং তা মানুষের জীবন ও আচরণের পূর্ণাঙ্গ নিয়মাবলী। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে গঠিত শরীয়াহ্ আইন মানুষের

প্রতিদিনের জীবন, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক দায়িত্ব ও নৈতিকতা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করে। এ কারণে, 'শরীয়াহ্ আইন ও দণ্ডবিধির প্রয়োগ' মানব সমাজে আইনশৃঙ্খলা, ন্যায়বিচার এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

শরীয়াহ্ আইন ও দণ্ডবিধি নিয়ে প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে বোঝা যায় যে, বিষয়টি বহু গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, 'ফতোয়ায়ে আলমগীরি' গ্রন্থটি সম্রাট আওরঙ্গজেবের তত্ত্বাবধানে ১০৪৭-১০৮২ হিজরিতে সংকলিত। এতে হানাফি ফিকহের অধীনে হুদুদ, কিসাস ও তাআযীর শাস্তির নিয়ম ও প্রয়োগ, প্রমাণ ও সাক্ষ্য, বিচার প্রক্রিয়া, এবং ফিকহের বিশেষ মাসায়েলার বিশ্লেষণ সংরক্ষিত। বইটি গবেষকদের জন্য ফিকহ ও দণ্ডবিধির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বোঝার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে, আল-হিদায়া গ্রন্থে হানাফি মাজহাবের দণ্ডবিধি, হুদুদ শাস্তির শর্ত, প্রমাণ গ্রহণ, সাক্ষ্য ও ন্যায্য বিচার প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। যা প্রথাগত দৃষ্টিকোণ ও ধারাবাহিকতার নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে বিবেচিত। আধুনিক গবেষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তা আইনের নৈতিক ভিত্তি ও ফিকহগত বিশ্লেষণ প্রদানের সক্ষমতা রাখে।

প্রচলিত হানাফি ফিকহের দিক থেকে 'আল-হিদায়া' গ্রন্থটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে দণ্ডবিধি, হুদুদ শাস্তি, প্রমাণ গ্রহণ ও ন্যায্য বিচার প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথাগত ধারাবাহিকতার নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে বিবেচিত।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ফতোয়া ও দণ্ডবিধির প্রয়োগের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বোঝার জন্য ইসলামিক ল রিসার্চ সেন্টার ও লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ প্রকাশিত 'ফতোয়া গুরুত্ব ও প্রয়োজন' গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। এখানে ফতোয়া বিভিন্ন সময়ে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি ও সমাধানের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজে সালিশ ও ফতোয়ার প্রয়োগের ফলে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘন ও ভয় সৃষ্টি, আত্মহত্যা, মামলা এবং সামাজিক অশান্তি সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও, শরীয়াহ ও দণ্ডবিধি গ্রন্থে আধুনিক ইসলামি চিন্তাধারার আলোকে দণ্ডবিধি ও হুদুদ শাস্তি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লেখক নৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের ওপর জোর দিয়ে দেখিয়েছেন কিভাবে শরীয়াহ্ আইন সমাজের কল্যাণ, শৃঙ্খলা ও নৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে। গবেষণার দিক থেকে এ গ্রন্থ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং প্রায়োগিক

প্রেক্ষাপটের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। অন্যদিকে, 'ফতোয়া' গ্রন্থটি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ইসলামি পণ্ডিত আল্লামা ইউসুফ আল কারজাভীর রচনা, যা হাফেজ মুনীর উদ্দীন আহমেদ অনূদিত এবং প্রকাশ করেছে আল কোরআন একাডেমী, লন্ডন, বাংলাদেশ শাখা। এই গ্রন্থে মোট এগারটি অধ্যায়ের মাধ্যমে ফতোয়ার সকল বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশেষ করে দশম অধ্যায়ে নারী ও পারিবারিক মাসায়েল, বিবাহ, তালাক ও হিল্লার মতো বিষয়গুলো আলোচ্য গবেষণার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। গ্রন্থটির তথ্য ও তত্ত্ব অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, কারণ এতে ইসলামের মৌলিক সূত্র ও ফিকহগত বিশ্লেষণ একত্রিত হয়েছে।

বাংলাদেশে ফতোয়া ও দণ্ডবিধি সম্পর্কিত সামাজিক বাস্তবতার ওপর আলো ফেলেছে 'আদালতের কাঠগড়ায় ফতোয়া-বিবাহ, তালাক, দেশবরেণ্য আলেমদের অভিমত' গ্রন্থটি। তৌহিদুর রহমান সম্পাদিত ও আরআইএস পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত এই বইটিতে আদালতের মধ্যস্থতায় ফতোয়ার প্রয়োগ, বিবাহ, তালাক, হিল্লো ও নারী অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলা ও আলেমদের অভিমত সংকলিত হয়েছে। যদিও এটি প্রথাগত গবেষণা নয়, তথাপি তথ্যবহুল ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটের জন্য উপযোগী। এ ছাড়াও খন্দকার মোঃ কবির আহমদের এমফিল থিসিস 'আল-কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ফতোয়া ও প্রায়োগিক বিশ্লেষণ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ' গুরুত্বপূর্ণ। এতে ফতোয়ার উৎপত্তি, বিকাশ, বাংলাদেশে প্রয়োগ এবং সমস্যা সমাধানের দিক আলোচিত হলেও পরিসংখ্যান ও জরিপভিত্তিক বিশ্লেষণ সীমিত।

সাহিত্য পর্যালোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, শরীয়াহ্ আইন ও দণ্ডবিধি সম্পর্কিত গ্রন্থগুলি প্রাচীন ও আধুনিক উভয় ক্ষেত্রেই তথ্য ও তত্ত্বের ভাণ্ডার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। তবুও, বাংলাদেশে এ বিষয়ে সমন্বিত ও প্রায়োগিক গবেষণা সীমিত। অধিকাংশ প্রকাশনা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বা মতামতকে কেন্দ্র করে লেখা হলেও, সমাজ, আইন ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বাস্তব প্রভাব নিয়ে স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ তেমন নেই। এ কারণে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 'শরীয়াহ্ আইন ও দণ্ডবিধির প্রয়োগ' বিষয়ে গবেষণা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ গবেষণা শুধু ইসলামী আইন ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নয়, বরং সমাজ, মানবাধিকার, আইন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত বাস্তব সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানের পথ দেখাবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। এখানকার অধিবাসীদের প্রায় নব্বই শতাংশ মুসলমান। কুরআন হাদিসের জ্ঞানে সমৃদ্ধ জ্ঞানী মুসলমানের সংখ্যা কম হলেও এখানকার অধিকাংশ মুসলমান ধর্মভীরু। একদিকে পরকালের ভয়ে ভীত মানুষের সংখ্যা যেমন কম নয় তেমনি আবার ধর্ম নিয়ে যারা ব্যবসা করেন তাদের সংখ্যাও কম নয়। ধর্ম নিয়ে ব্যবসা ও ধর্মবিদ্বেষ দু'টি যখন একই সমান্তরাল রেখায় একত্রিত হয় তখনই এর অপব্যবহার ও অসদ্ব্যবহারের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। বিগত এক দশকে সংঘটিত ঘটনায় কতিপয় ক্ষেত্রে অন্তত তাই মনে হয়েছে। কোনো একটি ঘটনাকে ভিন্নভাবে চিত্রায়িত করে এর থেকে নিজের খেয়াল খুশিমতো ফায়দা হাসিলের চেষ্টা থেকে এ ধরনের ধারণা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কোনো কোনো তুচ্ছ ঘটনায় যেমন জীবনহানি ঘটেছে আবার কোনো কোনো ঘটনা প্রচারণার ক্ষেত্রে তিলকে তাল বানিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রূপ পেয়েছে। এমতাবস্থায় এ সকল ঘটনার নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। আলোচ্য গবেষণার মাধ্যমে যা অনুসন্ধান করা হয়েছে তা হলো–

১. ধর্ম কী?
২. মানব জীবনে ধর্মের ভূমিকা
৩. সমাজের সংহতি বিধানে ধর্মের অবদান
৪. ইসলাম ও শরীয়াহ্ আইন মানব কল্যাণে কীভাবে কাযকর তা বিশ্লেষণ করা
৫. সমাজে সংহতি, ন্যায় এবং মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ধর্মের অবদান চিহ্নিত করা।
৬. ইসলাম ও শরীয়াহ্ আইন মানব কল্যাণ, নৈতিকতা এবং সামাজিক শৃঙ্খলায় কীভাবে কার্যকর তা বিশ্লেষণ করা।
৭. শরীয়াহ্ আইন ও দণ্ডবিধি কার্যকর করার পরিবেশ, পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া বোঝা।
৮. বাংলাদেশের সামাজিক ব্যবস্থায় শরীয়াহ আইন ও দণ্ডবিধির কার্যকারিতা নিরীক্ষণ করা।
৯. আইন ও দণ্ডবিধি প্রয়োগের মাধ্যমে সামাজিক শান্তি, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার রক্ষায় কীভাবে অবদান রাখা যায় তা বিশ্লেষণ করা।
১০. সামাজিক সমস্যা ও দ্বন্দ্ব নিরসনে শরীয়াহ্ আইন ও দণ্ডবিধির প্রয়োগের প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করা।

এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে গবেষণাটি কেবল ইসলামী আইন ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নয় বরং বাংলাদেশে শরীয়াহ্ আইন ও দণ্ডবিধির বাস্তব সমস্যা, সামাজিক প্রতিক্রিয়া, মানবাধিকার এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত দিকগুলোও স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হবে।

গবেষণা পদ্ধতি

'শরীয়াহ্ আইন ও দণ্ডবিধির প্রয়োগ' গ্রন্থটি আমার পিএইচডি থিসিস 'বাংলাদেশের সমাজে ধর্মের ব্যবহার, অপব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার ১৯৯১-২০০১' এর দুইটি অধ্যায়ের সংযোজিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ। গবেষণা সমস্যার (Research Problem) প্রকৃতি, গবেষণার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও পরিধি বিবেচনা করে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে আল কুরআন, হাদিস, ক্লাসিক্যাল ফিকহ গ্রন্থ এবং মাধ্যমিক (Secondary) তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের প্রাপ্ত ধর্ম, ইসলাম, ফতোয়া, ইসলামি আইন ও বাংলাদেশে ফতোয়ার অপব্যবহার সম্পর্কিত গ্রন্থ, বিশ্বকোষ, অভিসন্দর্ভ, জার্নাল-নিবন্ধ, অপ্রকাশিত প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, প্রতিবেদন ইত্যাদি উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখিত গ্রন্থাবলী ও প্রকাশনা থেকে গবেষণাবিষয়ক মৌলিক ধারণা লাভের সাথে সাথে তাত্ত্বিক ও কাঠামোগত জ্ঞানও লাভ করা সহজ হয়েছে। বিশেষ করে পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদন (১৯৯১-২০০১)-কে এ ক্ষেত্রে মূলসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণার পরিধি তিনটি স্তরে সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রথমে, ধর্ম ও সভ্যতার ঐতিহাসিক সম্পর্ককে গুরুত্ব দেওয়া হবে। মানবজাতির ইতিহাসে ধর্ম কেবল আধ্যাত্মিকতার একটি মাধ্যমই নয়, এটি সামাজিক শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিভিন্ন সভ্যতায় ধর্মের প্রভাব, তার সামাজিক ও নৈতিক দিক, এবং মানব সমাজে এর স্থায়িত্ব ও প্রভাবের প্রেক্ষাপট এখানে বিশ্লেষণ করা হবে। দ্বিতীয় স্তরে, ইসলামি জীবনব্যবস্থার তাত্ত্বিক কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হবে। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা কেবল আধ্যাত্মিক নির্দেশনা নয়, বরং মানব জীবনের সকল দিক– পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক নিয়ন্ত্রণের জন্য সুসংগঠিত বিধান প্রদান করে। কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী তাত্ত্বিক শিক্ষার আলোকে এই কাঠামোকে বিশ্লেষণ

করা হয়েছে, যাতে দেখা যায় কিভাবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার নীতিমালা সামাজিক কল্যাণ ও ন্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তৃতীয় ও শেষ স্তরে, শরীয়াহ আইন ও দণ্ডবিধির প্রয়োগ সম্পর্কিত বিষয়গুলো বিশদভাবে আলোচনা করা হবে। এই পর্যায়ে মূলত মানব সমাজে শৃঙ্খলা, ন্যায়বিচার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে শরীয়াহ ও দণ্ডবিধির ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হবে। গবেষণার আলোচনায় পারিবারিক আইন বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিস্তারিত আলোচনা সরাসরি অন্তর্ভুক্ত হবে না, যদি না তা দণ্ডবিধির প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে। এইভাবে, গবেষণার পরিধি ধর্ম, ইসলামি জীবনব্যবস্থা এবং শরীয়াহ আইন ও দণ্ডবিধির প্রয়োগের মধ্যকার সম্পর্ক ও প্রভাবকে কেন্দ্র করে নির্ধারণ করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ন্যায়, সামাজিক শৃঙ্খলা এবং মানবাধিকার নিশ্চিতকরণের দিকগুলো বোঝার জন্য প্রাসঙ্গিক।

উপসংহার

ধর্ম একটি শক্তিশালী সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা। এর সঠিক প্রয়োগ সমাজকে সংহত করে, আর অপব্যবহার সমাজকে বিভক্ত করে। বাংলাদেশে ফতোয়া-সংক্রান্ত সংকট এই দ্বৈত বাস্তবতার একটি উদাহরণ। অতএব, শরীয়াহ আইন ও দণ্ডবিধির প্রকৃত দর্শন, রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও সামাজিক বাস্তবতার সমন্বিত বিশ্লেষণ ছাড়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এই গবেষণা প্রস্তাব সেই সমন্বিত বিশ্লেষণের ভিত্তি নির্মাণের উদ্দেশ্যে প্রণীত।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ধর্ম, মানব জীবন ও মানুষের কল্যাণে ইসলাম

ধর্ম শব্দটি মানব জীবন ও সমাজের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। পৃথিবীর আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানব সমাজে ধর্মের উপস্থিত ছিল যেমন ছিল তেমনি আজও তা বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। অনেকের ধারণা, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও ভূমিকা গৌণ হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি তেমন নয়, কেননা সত্যিকার অর্থে কল্পিত ধর্মের কথা বাদ দিলে ধর্ম ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাখ্যার মধ্যে মৌলিক কোনো বিরোধ নেই। বরং দেখা যায় যে, বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু আসমানি বা ঐশি ধর্মের মৌলিক নীতিমালা ততটা পরিবর্তনশীল নয়।

বিজ্ঞানের মৌলিক সুত্রের যেমন স্থায়ী থাকে, তেমনি আসমানি ধর্মের মৌলিক সূত্রও অপরিবর্তনীয়। যতটুকু ঘটে থাকে তা কেবলমাত্র সাধারণ বা পারিপার্শ্বিক বিষয়ের ক্ষেত্রে। যিনি বিজ্ঞানের স্রষ্টা, তিনি তো আধার ধর্মের (আসমানি ধর্মের) স্রষ্টাও বটে। অতএব ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো মৌলিক বিরোধ থাকার কথা নয়। ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বা দূরত্ব দেখা যায়, তা মূলত এর ব্যাখ্যাকারীদের অজ্ঞতা বা ভুল ব্যাখ্যার ফলেই সৃষ্টি হয়।

আল্লাহর সৃষ্টির এক অপার বৈচিত্র্য হলো পৃথিবীর মানুষকে তিনি নানা অঞ্চল, ভাষা, বংশ, গোত্র ও চিন্তাধারার ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মধ্যে চেহারা, আকৃতি, প্রকৃতি, জ্ঞান ও চিন্তাধারার অতীতে যেমন কোনো ঐক্য বা মিল ছিল না, ঠিক তেমনি বর্তমানেও এর কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। আবার ভবিষ্যতেও এরকম মিল খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে করারও কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। পৃথিবীর নানা ধরনের মানুষের নানা ধরনের বিশ্বাস, রুচি, অভ্যাস, চাল-চলন ও আচার-আচরণ ইত্যাদির কারণে ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। যে কারণে আমরা লক্ষ্য করি, ধর্মের বিভিন্ন রূপের সাথে এর ব্যাখ্যারও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মানব জাতির ইতিহাসে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো ধর্মের নানা বিভাগ ও রূপের। নিম্নে ধর্মের কয়েকটি সংজ্ঞা তুলে ধরা হলোঃ

ধর্ম শব্দের অর্থ

ওয়েবস্টারের অভিধান অনুযায়ী ইংরেজী Religion শব্দটি religare শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে যার অর্থ হলো বন্ধন (Bond), যা দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখে।[১] একজন মানুষ যখনই কোনো অদৃশ্য শক্তি অথবা স্রষ্টায় বিশ্বাস স্থাপন করে তখনই তার ওপর কতিপয় বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। কাজেই তখন Religion শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ দাঁড়ায় নিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ। ল্যাকটেনটিয়াস Lectantius মনে করেন যে, 'বন্ধন বলতে কোনো নেতিবাচক অর্থ বুঝায় না বরং এর দ্বারা ইতিবাচক অর্থ প্রকাশ করে তা হলো, স্রষ্টার সঙ্গে বন্ধন বা তার প্রতি আকর্ষণ।'[২] প্রকৃতপক্ষে ধর্ম শব্দটি দুই ধরনের অর্থই প্রকাশ করে একটি ইতিবাচক ও অন্যটি নেতিবাচক। ইতিবাচক হবে তখন যখন ধর্মের মাধ্যমে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে দুনিয়াতে সুখ-শান্তি লাভকরার সাথে সাথে পরকালেও মুক্তি পাওয়া যাবে তখনই ধর্মের বদৌলতে মানুষ লাভ করবে আনন্দ-উল্লাস। এভাবে সম্পূর্ণ বিষয়টি দাঁড়াবে ইতিবাচক অর্থে। আবার যখন ধর্মের বিধি-নিষেধ লঙ্ঘনের কারণে মানুষ দুনিয়াতে লাভ করবে মনোবেদনা, ধিক্কার ও নিন্দা এবং পরকালে পাবে শাস্তি, তখনই পুরো বিষয়টি গিয়ে দাঁড়াবে নেতিবাচক অর্থে ।

সিসেরো (Cicero) এর মতে Religon শব্দটি Religare শব্দ থেকে উদ্ভুত যার অর্থ হলো পুনরায় পাঠ করা, পুনরাবৃত্তি করা। যে কারণে ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি বলতে তাদের বোঝায় যারা ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে যা কিছু যুক্ত তাকে অধ্যবসায় সহকারে পূর্ণ বিবেচনা করেন।[৩] যে কোনো ধর্মের একজন অনুসারী ধর্মীয় বিষয়াদি তার জীবনে রারংবার এমনকি শত-সহস্রবার পালন বা অনুসরণ করে থাকেন বলেও ধর্মের অর্থ পুনরায় পাঠ করা ও পুনরাবৃত্তি করা বুঝায়। উদাহরণ হিসেবে আমরা যদি কেবল পূজা-পার্বণ, ঈদ উৎসব ও আনুষ্ঠানিক বড় বড় ইবাদতের কথাই ধরি তবে একজন মানুষ জীবনে বহুবার এবং বারবার এ ধরনের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে থাকেন, ফলে উপর্যুক্ত অর্থটি যথাযথ বলে বিবেচিত হওয়াই স্বাভাবিক। মূল কথা হলো ধর্মের অনুসরণের দিক থেকে পুনরাবৃত্তির অর্থ যথার্থ বলে বিবেচিত হতে পারে।

---

[১] গুপ্ত, প্রমোদ বন্ধুসেন: ধর্মদর্শন, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা, ২০০২, পৃ. ৮০।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

রাইস ডেভিডস (Rhys Davids) এর মতে Religion শব্দটির অর্থ হলো একটি নিয়মনিষ্ঠ, দ্বিধাগ্রস্থ, বিবেকি মনের গঠন।[৪] রাইস ডেভিডস এর কথার মর্মার্থ হলো, একজন মানুষ ধর্ম গ্রহণের পূর্বে তিনি থাকেন নিয়ম শৃংখলাহীন, দ্বিধাগ্রস্থ যার জীবনে থাকে না কোনো ধরনের নিয়ম কানুন, নীতি, নৈতিকতাবোধ, তিনি থাকেন বাধা বন্ধনহীন। কিন্তু ধর্ম গ্রহণের পরই তিনি ধর্মের নিয়ম নীতির অনুসরণ করে থাকেন। তার জীবনে আসে আমূল পরিবর্তন। তিনি নিজের জীবনকে গড়ে তোলেন নতুন আঙ্গিকে। জীবনকে তিনি নতুনভাবে মূল্যায়ন করতে শিখেন। তিনি তার পুরো জীবন এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রাত্যহিক জীবনকে নতুন আঙ্গিকে সাজিয়ে তোলেন। এভাবে আসে তার জীবনে সংশয়ের পরিবর্তে প্রত্যয়। দ্বিধাগ্রস্থতার বদলে আসে দৃঢ়বিশ্বাস। বিশৃঙ্খলার পরিবর্তে আসে শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতা। এর মাধ্যমে গড়ে উঠে বিবেকি মনের বিকাশ, লাভ করে মনুষ্যত্ব ও মানবতা। ধীরে ধীরে পাশবিকতার বদলে মানবিকতা প্রতিষ্ঠা পায়।

সত্যিকার অর্থে ধর্মের অনুসারী একজন মানুষ 'আশরাফুল মাখ্‌কাত' হিসেবে নিজেকে বিকশিত করতে পারে। যদি ইংরেজি শব্দ Religion শব্দটির উদ্ভব হয় Religare শব্দ থেকে তখন তার অর্থ হয় বন্ধন (Bond) তাহলে বলা যেতে পারে যে, ব্যক্তির ও জাতির জীবনে যা সংহতি আনে তাই ধর্ম।[৫] এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক জীবনে একমাত্র ধর্মই সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। ইতোপূর্বে ধর্ম যেভাবে, যে প্রক্রিয়ায় অথবা যে মূল্যবোধের মাধ্যমে সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল তা অন্য কোনো মাধ্যমে সম্ভব হয়নি। ধর্ম যেভাবে আরব-অনারব, সাদা-কালো, আশরাফ-আতরাফের প্রভেদ দূর করতে পারে অন্য কোনো পন্থা তা পারে না।

পৃথিবীর সকল মানুষ না হলেও অধিকাংশ মানুষ যে যুগে যুগে ধর্মের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ছিল ও আছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অতএব, ব্যক্তি ও জাতির জীবনে কেবলমাত্র ধর্মই সংহতির ভীত রচনা করতে পারে এ কথা সঠিক ও যথার্থ। যা ধারণ করে তাই ধর্ম। ধর্ম শব্দটি ধাতুগত অর্থও তাই। অন্তর এবং বাহির মিলে মানুষের জীবনে যে পূর্ণ সামঞ্জস্য তার মধ্যে যা মানুষের জীবনকে ধরে রাখে সামাজিক জীবনের বৃহত্তর ঐক্যের মধ্যে যা মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, তাকে ধর্ম বলা যেতে পারে।

---

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

ধর্মের সংজ্ঞা

ধর্ম সম্পর্কে এতো বিচিত্র এবং পরস্পর বিরোধী মত রয়েছে যে ধর্মের প্রকৃত চরিত্রটি অনুধাবন করা বেশ কষ্টকর। কেননা ধর্মের সংজ্ঞা এত বেশি ও ব্যাপক যে, এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে রীতিমত হিমসিম খেতে হয়। সমাজ বিজ্ঞানের বিষয় হিসেবে এটি এত বেশি গতিশীল ও পরিবর্তনশীল যে, কোনো একটি সংজ্ঞার ওপর স্থির নিশ্চিত থাকা কষ্টকর। তাত্ত্বিক বিষয় হিসেবেও বিষয়টি জটিল ও কঠিন। এ বিষয়ে বহু সংখ্যক দার্শনিক নানা ধরনের মত প্রকাশ করেছেন।

ধর্মের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে লক্ষ্য করা যায় যে, ধর্মের অগ্রগতি সর্বত্র সমানভাবে একমুখী হয়নি। বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের ফলাফলও ভিন্ন হয়েছে। কোথাও প্রগতি রুদ্ধ হয়েছে, কোথাও পশ্চাৎমুখী হয়েছে, কোথাও সম্প্রসারিত হয়েছে। তবুও সামগ্রিকভাবে প্রগতির ধারাটি অক্ষুণ্ন থেকে সবকিছুর ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছে। যদিও এখনো পৃথিবীর কোথাও সর্বপ্রাণবাদ, ফেটিশবাদ এবং টোটেম বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে তবুও উচ্চ সংস্কৃতি সম্পন্ন অনেক মানুষ আজ ঐসব স্থূল বিশ্বাসকে পেছনে ফেলে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে এবং তাদের মধ্যে উন্নততর এবং অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য আধ্যাত্মিক ধর্মের বিকাশ ঘটেছে। সুতরাং সামগ্রিকভাবে ধর্মের অগ্রগতি যে হয়েছে একথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়। অবশ্য ধর্মের এ প্রগতি জীবনের অন্যান্য দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে সামাজিক সংগঠন এবং সংস্কৃতির অগ্রগতির সঙ্গে ধর্মীয় অগ্রগতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। ধর্মের প্রগতি কখনো যেমন অন্যান্য প্রগতির ফলে ঘটেছে তেমনি ধর্ম কখনো আবার অন্যান্য প্রগতির কারণও হয়ে উঠেছে। ধর্মের প্রগতির কথা প্রসঙ্গে ধর্মের মান বা মূল্যায়নের ভিত্তি অনুমানের প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ তার সাহায্যে আমরা কোন্‌টি উন্নত ধর্ম এবং কোন্‌টি অনুন্নত ধর্ম তা নির্ণয় করতে পারি। যেমন বহু স্রষ্টাবাদকে আমরা সর্বপ্রাণবাদ অপেক্ষা উন্নততর বলে মনে করি, আবার এক স্রষ্টায় বিশ্বাসীকে মনে করি বহু স্রষ্টাবাদ অপেক্ষা উন্নততর। মূলতঃ ধর্মের সংজ্ঞার ওপর ধর্মের মান নির্ভর করবে।[৬]

একটি ধর্মকে অন্য ধর্ম অপেক্ষা তখনই উন্নততর বলা যাবে যখন সে ধর্ম বিশ্বাস ধর্মের প্রকৃত অর্থ এবং আচরণকে সুন্দরতর করে ব্যাখ্যা করতে পারবে। এ প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করতে হলে আমাদের বৈষম্যের মধ্যে ঐক্যকে, বিচ্ছিন্নতার

[৬] রমেশচন্দ্র মুন্সী, শ্রী: ধর্মতত্ত্ব পরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, ২০০০, পৃ. ২০।

মধ্যে ধারাবাহিকতাকে এবং পশ্চাৎপদতার মধ্যে প্রগতিকে আবিষ্কার করতে হবে। কিন্তু সেই অনুসন্ধান করতে গিয়ে চক্রক[৭] যুক্তিকে এড়িয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠবে। কারণ আদর্শের সাহায্যে যদি ধর্মের মৌল উপাদানগুলি নির্ণয় করা হয় এবং আবার যদি ধর্মের মৌল উপাদানগুলির সাহায্যে ধর্মের আদর্শ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয় তাহলে যুক্তিটি অবশ্য চক্রক দোষেদুষ্ট হবে। আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক হবে যদি প্রথমেই আমরা বর্ণনামূলক এবং আদর্শমূলক সংজ্ঞার পার্থক্য নির্ণয় করে ফেলতে পারি। অবশ্য একথাও ঠিক যে, দুটিকে সব সময় পৃথক করে রাখা সম্ভব নয়। আমাদের যুক্তি যদি কেবলমাত্র আকৃতিগত পাণ্ডিত্যাভিমানী বা নিস্ফলা না হয় তাহলে আমরা চক্রক দোষকে এড়িয়ে যেতে পারবো কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এতো বিচিত্র এবং পরস্পর বিরোধী মত ধর্ম সম্পর্কে রয়েছে যে, ধর্মের প্রকৃত সংজ্ঞা অনুধাবন করা কষ্টকর। তবুও বিভিন্ন ও বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্যের সমন্বয়ে দার্শনিকগণ উপযুক্ত সংজ্ঞা দানের চেষ্টা করেন।

ইতিহাসে ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন রকম এবং এমন পরস্পর বিরোধী মত দেখা যায় যে, ধর্মের মৌলিক চরিত্রটি প্রকাশের চেষ্টা হয়তবা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। বিশেষ করে একটি জটিল বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধর্মের বিকাশ হয়েছিল বলে কাজটি আরো দূরহ হয়ে পড়েছে। স্থিতিশীল কোনো কিছু অপেক্ষা গতিশীল বিষয়ের সংজ্ঞা নিরূপন করা অপেক্ষাকৃত কষ্টকর। তা সত্ত্বেও ধর্মের একটি স্বতন্ত্র ও সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য অবশ্যই রয়েছে। তা না হলে 'ধর্ম' কথাটি দিয়ে বিশেষ কোনো অর্থ প্রকাশ করা যেত না। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বৈচিত্রের আলোচনা করতে গেলেও ধর্মীয় অভিজ্ঞতার 'সংজ্ঞা' নির্ণয়ের প্রয়োজন। নিশ্চয় এমন কতকগুলি সাধারণ ধর্ম আছে যার মধ্যে বিশেষ ধর্মগুলি অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আরও একটু স্পষ্ট করে ধর্মের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যটি আলোচনার চেষ্টা করলে আমাদের বিভিন্ন রকম মতবাদের সম্মুখীন হতে হবে। অনেকে অনেকভাবে ধর্মের সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। জন মোরলে বলেছেন, কথিত আছে ধর্মের দশ হাজার রকম সংজ্ঞা আছে। এই উক্তিটি একটু অতিশয়োক্তি হতে পারে কিন্তু ধর্মের সংজ্ঞা যেমন অসংখ্য এবং বিচিত্র তাদের যথেষ্ট নিদর্শন এবং সুন্দর শ্রেণিকরণ অধ্যাপক লিউবার (Prof Leuba) Psychological Study of Religion গ্রন্থের পরিশিষ্টে পাওয়া যাবে।[৮] ধর্মের স্বরূপ বা প্রকৃতি কয়েকটি বিখ্যাত ও স্থায়ী

[৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-২০।

[৮] Leuba, J.H: Psychological Study of Religion, Macmillan, 1912, p-339.

মতবাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে প্রয়োজন। দেখা যাবে প্রত্যেকটি মতবাদের কিছু না কিছু সত্য আছে। কিন্তু হয় তারা একদেশদর্শী নয়ত একটি জটিল বিষয়ের অতি সরলীকরণ দোষেদুষ্ট।

(ক) বৌদ্ধিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের সংজ্ঞা

হেগেলের মতে ধর্ম এক প্রকারের জ্ঞান।[৯] মহান আল্লাহ তা'য়ালার জ্ঞান বা পরম জ্ঞান। এই জ্ঞানের সাহায্যে অসীম ও সসীমের মধ্যে একটি চরম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ধর্মের কিছু কিছু সংজ্ঞা মানুষের মানস প্রকৃতির একটি দিকে ধর্মকে আবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করে। এই সংজ্ঞাদাতাদের মধ্যে কেউ কেউ ধর্মকে ধীশক্তি থেকে উৎপন্ন বলে মনে করেন। যেমন হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) এর মতে, ধর্ম হলো একটি জনপ্রিয় দর্শন। ধর্মীয় সত্যের উপলব্ধি হয় আবেগ ও রূপকের মধ্য দিয়ে। আর প্রকৃত দর্শনে সত্য তার সংবেদনশীল পোষাকটি ত্যাগ করে। অর্থাৎ শুদ্ধ চিন্তার সহায়তায় দর্শন সত্যকে জানবার চেষ্টা করে। তিনি বলেছেন, ধর্মে সসীম মন অসীমের জ্ঞান লাভ করে। আবার অন্যত্র ঐশ্বরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেন, সসীম জ্ঞান নিজেই সসীম আত্মার মধ্যে সঞ্চারিত হয়।[১০] তাহলে ধর্ম হলো এক রকমের জ্ঞান পরম সত্তার জ্ঞান বা পরম জ্ঞান, অসীম ও সসীমের মধ্যে একটি চরম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এমন একটি জ্ঞান। হেগেল ধর্মের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে তিনি যৌক্তিক ঐক্য ও সঙ্গতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তার ফলে ধর্মের মূল্যায়নের দিকটি অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু মূল্যায়নও ধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। হেগেলপন্থী ব্যতিত অন্য অনেক দার্শনিক আবার ধর্মকে এক ধরনের বিশ্বাস বলে অভিহিত করেছেন। যেমন টাইলর ধর্মের ন্যুনতম সংজ্ঞায় বলেছেন, ধর্ম হলো অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস। ম্যাক্সমূলার বলেছেন ধর্ম হলো অসীমের প্রত্যক্ষণ বা অনুমান। [১১]

(খ) অনুভূতির দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের সংজ্ঞা

অনেক দার্শনিক আবেগ বা অনুভূতির দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। শ্লায়ার মেকারের বিখ্যাত সূত্রটি এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁর মতে, সৃষ্টিকর্তার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরতার অনুভূতিতেই ধর্মের মূল

---

[৯] Chatterjee, Satish Chandra: The problem of Philosophy, The University of Calcutta, Calcutta, 1964, P. 339.

[১০] Ibid, P. 44.

[১১] Caldecott and Mackintosh: Selection from the Literature of Theism, T and T. Clark, 1904, P. 256.

নিহিত। শ্লায়ারমেকার মনে করেন, শুদ্ধ ধর্ম হলো স্বচ্ছ অনুভূতি।[১২]এই অনুভূতি একদিক থেকে চিন্তার সঙ্গে যোগসূত্রহীন আবার অন্যদিক থেকে নৈতিকতা বা কোনো ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কহীন। ধর্মের জন্য জ্ঞানের কোনো প্রয়োজন নেই। জ্ঞান ছাড়াই ধর্মের প্রকৃতি জানা যেতে পারে। একজন মানুষ যে কোনো ধারণা-ই পোষণ করুন না কেন ধার্মিক হতে তাতে কোনো বাধা নেই। ধারণা, পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়গুলি ধর্মের ক্ষেত্রে বাহুল্য মাত্র। ধারণা ও পদ্ধতির যত কিছু সম্পর্ক তা হলো জ্ঞানের সঙ্গে। জ্ঞান জীবনের একটি পৃথক বিভাগ। ধর্মের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ধর্ম আবার নৈতিকতা থেকেও স্বতন্ত্র। নৈতিকতা প্রকাশ পায় নিজ কার্য সাধনের দক্ষতা ও আত্মসংযমের মধ্য দিয়ে। অপর পক্ষে পরম স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ এবং আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে ধর্মবিশ্বাস প্রকাশিত হয়। নৈতিকতা স্বাধীনতার ধারণার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে অর্থাৎ স্বাধীনতাকে পূর্বশর্ত হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েই নৈতিক আলোচনা সম্ভবপর হয়। বিপরীত পক্ষে ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রয়োজনের কোনো সম্পর্ক নেই। অতএব ধর্মবিশ্বাস বিজ্ঞান এবং অনুশীলনের, চিন্তা এবং ইচ্ছার মধ্য পথটি গ্রহণ করে জীবনের তৃতীয় অপরিহার্য দিক রূপে পরিগণিত হয়। মূল্য এবং গৌরবের দিক থেকে জ্ঞান বা অনুশীলন অপেক্ষা ধর্ম কোনোমতেই খাটো নয়।[১৩] ধর্ম হলো সসীমের মাঝে অসীমের উপলব্ধি। এক নিবিড়, অন্তরঙ্গ তাৎক্ষণিক উপলব্ধি, সম্পূর্ণতার কাছে নির্ভরতার উপলব্ধি।

শ্লায়ারমেকার এক দিকে উষর বুদ্ধিবাদ থেকে অন্যদিকে শুদ্ধ নৈতিকতার হাত থেকে ধর্মকে উদ্ধার করে এক মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। ধর্মের বিষয়ে আমরা আগেই অনুভূতির ওপর সমধিক গুরুত্বারোপ করেছি। শ্লায়ারমেকার ঠিকই বলেছেন, জ্ঞানের পরিমাণই ধর্মের পরিমান নয়।[১৪] অন্তত দু'টি বিষয়ে শ্লায়ারমেকারের মতবাদ সমালোচনাযোগ্য। প্রথমত ধর্মের যে অনুভূতির কথা বলা হয়েছে তা কেবলমাত্র অনুভূতি হতে পারে না। অনুভূতির একটা কিছু না কিছু বিষয় থাকবে, ধারণা থাকবে। কিন্তু অনুভূতিকে প্রয়োজনীয় এবং তার বিষয়কে অপ্রয়োজনীয় বলা যায় না। জীবনে অনুভূতির সঙ্গে চিন্তা ও ইচ্ছা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ধর্মীয় অনুভূতিকে তার বিষয় থেকে পৃথক করা যায় না। কারণ বিষয়টি বুদ্ধিগম্য, আচরণের বাহ্য প্রকাশ থেকে তাকে জানা যায়। দ্বিতীয়ত নির্ভরতার

---

[১২] Ibid, P. 256.

[১৩] Ibid, P. 304.

[১৪] Ibid, P. 304.

উপলব্ধিকে শ্লায়ারমেকার (Schleirmacher) স্বতন্ত্রভাবে ধর্মীয় অনুভূতি বলেছেন। কিন্তু এই অনুভূতি অধার্মিকদেরও থাকতে পারে। এমনকি গৃহপালিত পশুদের মধ্যেও এ অনুভূতি থাকতে পারে। সুতরাং কেবলমাত্র নির্ভরতার সাহায্যে ধর্মীয় এবং অধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে পৃথক করা যায় না। তাছাড়া যখন স্রষ্টার বা অসীমের ওপর নির্ভরতার কথা বলা হয় তখনই অনুভূতির সঙ্গে একটি বিষয়ের কিংবা যতই অস্পষ্ট হোক একটি ধারণার সঙ্গে অনুভূতির সংযোগ ঘটে। সুতরাং ধর্ম কেবল শুদ্ধ অনুভূতির বিষয় নয় একথা স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে এও বলা যেতে পারে যে ধারণা ধর্মে অবাঞ্ছিত নয়।

(গ) নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের সংজ্ঞা

অনেকে আবার নৈতিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধর্মের সংজ্ঞা দানের চেষ্টা করেছেন। বস্তুতপক্ষে তাঁর নৈতিক চেতনাকে ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে এক করে ফেলেছেন। কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) এর দেওয়া ধর্মের সংজ্ঞা এই প্রচেষ্টার প্রাচীন নিদর্শন। তাঁর মতে, দৈব নির্দেশ হিসেবে সকল কর্তব্য সম্পাদন করাই হলো ধর্ম।[১৫] ম্যাথু আর্ণাল্ড কান্টের মতই নৈতিকতাকে গুরুত্ব দিলেও কিছুটা আবেগ তার সঙ্গে যোগ করে দিয়েছেন। তাঁর মতে, ধর্ম হলো আবেগের স্পর্শযুক্ত নৈতিকতা।'[১৬]

আমি শুধু এই কথাটিতে তুলে ধরতে চেয়েছি যে ধর্ম ও নৈতিকতা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই এদের একেবারে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা সমীচীন নয়। তদুপুরি কান্টের ধর্মীয় ধারণায় স্রষ্টাকে ঘিরে কোনো রহস্যময় অভিজ্ঞতার স্থান নেই। অর্থাৎ প্রার্থনা, উপাসনা, শ্রদ্ধাবোধের মতো উপাদানগুলো সেখানে অনুপস্থিত। কিন্তু এগুলিই মূলত ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত। এ পযন্ত আলোচিত সংজ্ঞাগুলোর প্রতিটি আংশিক সত্য বহন করে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ধর্ম মানুষের স্বভাবের কোনো একটি অংশ মাত্র অধিকার করে নেই। শ্রেষ্ঠ সত্তা বলে মানুষ যাকে স্বীকার করে, তাদের গন্তব্যস্থল তাঁরই কাছে বলে মানুষ বিশ্বাস করে। সেই সত্তার প্রতি মানুষের সমগ্র চেতনার একটি প্রতিক্রিয়া হয়। ধর্মের উৎপত্তি আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা যখন মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করি তখন আমাদেরকে অবশ্যই এ বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।

---

[১৫] Bradley, F.H: Essays and Addresses on the Philosophy of Religion, Dent, 1921, p.7-9

[১৬] Ibid, p. 11.

(ঘ) ধর্মের সংজ্ঞা নিরূপনের কয়েকটি আধুনিক সংজ্ঞা

এবার ধর্মের সংজ্ঞা নিরূপনে কয়েকটি আধুনিক প্রচেষ্টার উল্লেখ করা হবে। সালোমন রেইনাকের উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞাটি দিয়েই আলোচনা করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন 'ধর্ম মানেই নিয়ন্ত্রণ; ব্যক্তি ইচ্ছার ওপর নিয়ন্ত্রণ কিংবা বলা যেতে পারে মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ।[১৭] অবশ্য এ নিয়ন্ত্রণ কোনো পার্থিব নিয়ন্ত্রণ নয়। ধর্ম যত উন্নত হয় তার নিয়ন্ত্রণের পরিধিও তত বিস্তৃত হয়। আমি এভাবে ধর্মের সংজ্ঞা দিতে চাই, আমাদের কর্মদক্ষতার স্বাধীন প্রকাশকে বাধাদান করে যে সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব তার সমষ্টিকেই ধর্ম বলে। তিনি মনে করেন সকল ধর্মের অপরিবর্তনীয় উপাদান হলো এ দ্বিধা ও সংশয়। তিনি আরও বলেছেন, মনে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয় থাকে তাদের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। তাদের তিনি 'টাবু' বলেছেন।'[১৮] অর্থাৎ এ সংশয়গুলি সম্পূর্ণরূপে যথেচ্ছ ও যুক্তিহীন। এ সংজ্ঞাটির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এখানে ধর্মের নেতিবাচক দিকটির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবহারিক প্রয়োজন থেকে উদ্ভুত নয়। কিন্তু আমাদের কর্মদক্ষতার স্বাভাবিক ও স্বাধীন বিকাশের অহেতুক অন্তরায়। এ নিষেধকে ধর্মের মূল হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু সকল ধর্মকে 'টাবু' এর নিয়মে ব্যাখ্যা করলে তাতে অর্ন্তদৃষ্টির অভাব সূচিত হয়। ধর্মের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন বা অনুসন্ধান করাও সম্ভব হয় না। যথেচ্ছ ও অযৌক্তিক বিধি-নিষেধ ধর্মীয় জীবনের একটি বড় অংশ যে দখল করে রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেখানে অযৌক্তিক বিধি-নিষেধের প্রাধান্য বড়ই বেশি ছিল। কিন্তু আদিম সমাজে ও জীবনের বাস্তব প্রয়োজনে অথবা বলা যেতে পারে জীবন সংগ্রামে যতদিন কাজে লাগত ততদিনই 'টাবু' বেঁচে থাকতে পারতো। আদিম 'টাবু' নিয়েও মানুষ কম চিন্তা ভাবনা করেনি। অনেক ভাবনা চিন্তার পর আদিম মানুষ 'টাবু' নির্বাচন করতো। অভিজ্ঞতার সাহায্যে যেগুলিকে প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে তাই কেবল টিকে গেছে। একথা অনস্বীকার্য যে অযৌক্তিক বিধি-নিষেধ প্রগতির পরিপন্থি।[১৯] এমনকি অনেক উন্নত ধর্মেও বিধি-নিষেধের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। কিন্তু ধর্মের কাজ হলো প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধগুলিকে স্বাধীনতার আনন্দে রূপান্তরিত করা। যে ঐ জীবন ত্যাগ করলো সে-ই এ জীবন পাবে। আমি এসেছি যাতে তোমরা জীবন পেতে পার।[২০]

---

[১৭] George Galloway: Principles of Religious Development, Macmillan, London, 1909, p.3

[18] Ibid, p. 3-4

[19] Ibid, p. 7

[20] Ibid, p. 9

সুতরাং ধর্ম আমাদের কর্মদক্ষতার ওপর যথেচ্ছ বিধি-নিষেধ আরোপ তো করবেই না বরং জীবনকে ক্রমশ পূর্ণ থেকে পূর্ণতর করে তুলবে, আত্মোপলব্ধিও ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করবে। যারা ধর্মকে জীবনাকাঙ্খা পুরণের এবং আত্মবিকাশের উপায় বলে মনে করেন তারাই ধর্মের প্রকৃত স্বরূপের অনেকটা যথার্থ ব্যাখ্যা দান করেন। বিপরীত পক্ষে যারা মনে করেন ধর্ম আত্মাকে সংকীর্ণ করে, সঙ্কুচিত করে বা অবসন্ন করে ফেলে তারা সত্য থেকে অনেক দূরে থেকে যান। রেইনাক (Reinach) এর সংজ্ঞাটিকে অনুন্নত ধর্মের বর্ণনা হিসেবে গ্রহণ করা যায় তা হলেও তাকে আদর্শগত সংজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ বা স্বীকার করা যায় না। বিষয়টির আরো গভীরে প্রবেশ করতে হলে আমাদের আরো কয়েকটি আধুনিক সংজ্ঞার আলোচনা করা প্রয়োজন। যে একটা পার্থক্য রয়েছে সেই বিষয়টি আলোচনারও একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। Lotza মূল্যায়নের প্রণালির সঙ্গে অনুভূতিকে যুক্ত করেছেন। Lotza লিখেছেন, আমরা মঙ্গল বলতে যা বুঝি তা সম্পূর্ণরূপে নিহিত আছে তৃপ্তির অনুভূতির মধ্যে।[২১]

যখন অনুভূতির গুরুত্ব স্বীকার করা হচ্ছে তখন আমাদের পরামর্শ হলো মূল্যের ধারণাকে নিষ্ক্রিয় সুখ-দুঃখের অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত না করে, মানুষের সংগঠিত কামনা-বাসনা এবং সক্রিয় উদ্দেশ্যের সঙ্গে, যাকে এক কথায় বলা যেতে পারে, ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত করাই ভাল। Dr. Pringle pattison এর ভাষায় আমাদের চরম আকাঙ্খা এবং গভীরতম চিরস্থায়ী বাসনা নিবৃত্তির তৃপ্তি যাতে প্রতিবিম্বিত হয়, তাকেই চরম মূল্য বলা যায়। পরম সত্তার মতবাদের সঙ্গে মূল্যের ধারণার আলোচনায় আমাদের আলোচ্য বিষয় ধর্মের সংজ্ঞা নির্ণয় করা। মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের সংজ্ঞার প্রথম নির্দশনটি পাওয়া যায় Harold Hoffding এর লেখা Philosophy of Religion গ্রন্থে। এখানে সম্পূর্ণরূপে মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের সংজ্ঞাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। Hoffding এর মূল বক্তব্য হলো, মূল্যের নিত্যতার ওপর আস্থাই ধর্মের প্রধান উপাদান। তিনি বলেছেন 'মূল্যের নিত্যতাই হলো ধর্মের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বতঃসিদ্ধ।[২২] মূল্য বলতে কোনো বস্তুর গুণকে বুঝায়। যার দ্বারা তাৎক্ষণিক পরিতৃপ্তি লাভ করা যেতে পারে। অথবা পরিতৃপ্তি লাভের সেটি একটা পন্থাও হতে পারে। ধর্মের প্রকৃত উপাদান হিসেবে ব্যাপকতর কোনো গুরুত্ব

---

21 Hermann Lotza, Outlin of Philosophy of Religion, Conybear's Tran's, 1892, p. 123.

22 Pringle-Pattison, A.S.: The idea of God in the Light of Recent Philosophy, Clarendon press, 1917, p. 335.

নেই। অস্তিত্বের মূল্যায়নই সবকিছু। ধর্মীয় ধারণা সেই সব বাস্তব অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যার থেকে জীবন সর্বশ্রেষ্ঠ।

(ঙ) মূল্যের ধারণা থেকে ধর্মের সংজ্ঞা

অনেকে মূল্যের ধারণা থেকে ধর্মের সংজ্ঞা নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। অনুভূতির সাহায্যে ধর্মের সংজ্ঞা দানের প্রচেষ্টার সঙ্গে আধুনিক প্রচেষ্টার অনেক খানি সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু মূল্যের ধারণা শ্লায়ার মেকারের বিশুদ্ধ অনুভূতি অপেক্ষা অধিকতর উন্নত ও তাৎপর্যপূর্ণ। অভিজ্ঞতার অন্যতম উপাদান হলো উদ্দেশ্য। এই উপাদানটিতে মূল্যের ধারণা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। মূল্যের ধারণাই বর্তমান চিন্তাধারার মৌলিক নীতি। প্লেটো মঙ্গলকে চরম ধারণা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। প্লেটোর এই মতবাদের মধ্যে মূল্যের ধারণা প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে। কিন্তু আধুনিককালে কান্ট এর থেকেই এই আলোচনার সূত্রপাত হয়। কান্টের বিখ্যাত উক্তি হলো শুভ ইচ্ছা কোনো কিছু ছাড়াই শুভ। রত্নের মত নিজের আলোকে নিজে ভাস্বর। তিনি চরম মূল্যের মতবাদে বিশ্বাসী। এই মতবাদের ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তির নৈতিক শৃঙ্খলা এবং আদর্শ জগতের ধারণা গড়ে উঠে। বাস্তব জগতে কার্যকারণ সম্পর্ক ও পরিমাণগত সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে প্রাকৃত জগতের ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রাকৃত জগতের ধারণাও আদর্শ জগতের ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ হয়ে ওঠে। অবশ্য মানুষের মূল্যবোধ বা মূল্য উপলব্ধির পর যে সত্তাটির ধারণা জন্মায় তার থেকে আদর্শের ধারণা অনেক বেশি বিমূর্ত। সেই জন্যই সম্ভবত Herbert Lotza, Ritschel প্রমুখ দার্শনিক মূল্যের ধারণাকে দার্শনিক আলোচনার বিষয় করে তুলেছিলেন এবং সেই সঙ্গে বর্ণনার মনোবৃত্তির সঙ্গে মূল্যায়নের মনোবৃত্তির মূল্যটি লাভ করা সম্ভব। কারণ, ধর্ম এ বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে জগতে মূল্যের কোনো বিনাশ নেই। আমি মূল্যের 'নিত্যতা' শব্দটি এজন্য ব্যবহার করেছি, যার ফলে 'শক্তির নিত্যতা' কথাটির সঙ্গে এর সাদৃশ্য বোঝানো যায়। অর্থাৎ সকল পরিবর্তনের মধ্যেও 'মূল্যের নিত্যতা' স্বতঃসিদ্ধ।[২৩]

Hotfding এর মতে, সকল ধর্মের বিপরীত মতবাদ হলো প্রকৃতিবাদ। কারণ মূল্য সম্পর্কে জগতের অপরিসীম অনাসক্তিতে প্রকৃতিবাদ আস্থাশীল। Hoffding ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করেছেন। মানুষের ধর্মীয় চেতনা একটি বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেই বিশ্বাসটি হলো, মানুষের মূল্যবোধের পিছনে একটি সহানুভূতিশীল জগত আছে। মানুষের মূল্য উপলব্ধির

---

[23] Hoffding, H.: The Philosophy of Religion, London, 1906, p. 326.

এবং সংরক্ষণের প্রচেষ্টাই সেই জগত সহায়তা করে। মানুষ ভাল করে জানে তার একক প্রচেষ্টাই মঙ্গলের উপলব্ধি তার পক্ষে কোনো মতে সম্ভব নয়। যে জগতে মানুষ বাস করে সেই জগতের অনন্ত সম্পদের ওপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব করার ক্ষমতা তার নেই। সে নিজেই সে জগতের নগণ্য অংশমাত্র। সর্বোত্তম মূল্য সংরক্ষণের জন্য মানুষের সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। ধর্মবিশ্বাস সৎ হওয়ার জন্য মানুষের সামর্থ্যের ওপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল নয়। আদর্শ লাভের চেষ্টাকে যে শক্তি সুনিয়ন্ত্রিত করে তার উপরেই সে আস্থা স্থাপন করে। মানুষ বিশ্বাস করে যে প্রত্যেকে যে যার সাধ্যমত চেষ্টা করে কিন্তু সহানুভূতিশীল জগৎ লক্ষ্য রাখে যাতে কোনো প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যেতে না পারে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের ধর্মবিশ্বাস প্রকৃতির কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। মানুষের হৃদয়ের সহস্র আশা-আকাঙ্খাকে এ বিশাল বিশ্ব সুনিশ্চিত করবে এবং তার প্রত্যাশা পুরণ করবে এ প্রত্যয় মানুষের আছে। যে প্রত্যয়টি হলো শুভ বা মঙ্গলের কোনো নাশ নেই। যে স্রষ্টা মানুষের হৃদয়কে প্রশস্ত করেছেন তিনিই তা পূর্ণ করতে সমর্থ। যে বিশ্ব নিয়ম অনুসারে মানুষের মনে স্থায়ী চরিতার্থতার পন্থাটিও নিহিত রয়েছে। অন্য ভাষায় বলা যায় মানুষের মূল্যের ধারণা এবং পরম সত্তা একটি ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ। ধর্মীয় বিশ্বাস যখন এ অনুমানের ওপর নির্ভর করে কাজ করে তখন সে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দূরে সরে যায়। বিজ্ঞান তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যকে অপ্রাসঙ্গিক ভেবে অগ্রাহ্য করে। বিজ্ঞান বিশ্ব নিয়মকে পরিমাণগত সম্পর্কের পদ্ধতি দিয়ে সীমাবদ্ধ করে। এ পদ্ধতির সঙ্গে গুণগত সম্পর্কের কোনো যোগ নেই। কিন্তু গুণগত সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করেই মানুষের সৌন্দর্যচেতনা নৈতিকতার ধারণা এবং ধর্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছে। অবশ্য ধর্মীয় চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কারণ তাদের চিন্তার পদ্ধতি এক নয়। বিজ্ঞান করে বর্ণনামূলক আলোচনা, আর ধর্ম করে আদর্শমূলক আলোচনা। এ দু'টি পদ্ধতি পরস্পরের সম্পূরক। তবুও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে অধিকতর ব্যাপক ও মৌলিক বলে মনে হয়। বরং কিছু কিছু দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে ধর্মের যথেষ্ট বিরোধ আছে। এতক্ষণ ধর্মের সংজ্ঞা বিষয়ে যে আলোচনা করা হলো তা থেকে অনুমেয় যে, ধর্ম কোনো বিভাগীয় আলোচনা নয়। মানুষের সকল রকম অভিজ্ঞতায় এবং সমগ্র জীবনেই ধর্ম বিস্তৃত। তবুও ধর্ম সর্বব্যাপক হলেও সে তার স্বাতন্ত্র্য এবং প্রাধান্যকে বিসর্জন দিতে পারে না। কারণ মনুষ্য সভ্যতায় তার একটি বিশেষ অবদান আছে। তার প্রভাব সর্বত্র বিস্তৃত। কারণ জীবনের কেন্দ্রভূমি সে দখল করে রয়েছে। এমনটি আর কেউ পারেনি।

ধর্মের সংজ্ঞা পরিচ্ছেদে আমরা ধর্ম বলতে প্রধানত উন্নত ধর্মকেই বুঝিয়েছি। বিভিন্ন দেশে ও কালে ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ কি, তার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিনি। আমরা এ্যারিষ্টোটলের কথাটাই মনে রেখে সমগ্র বিবর্তনের ধারায় যে স্বভাব উপস্থিত থাকে, পরিণতিতে সেই স্বভাবের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে।

ধর্মের উৎপত্তি

ধর্মের উৎপত্তির বিষয়ে যদি কোনো পূর্বসিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে আলোচনা আরম্ভ করি তাহলে ধর্মের প্রকৃতি, মানুষের জীবনে ধর্মের গুরুত্ব প্রভৃতি, অনুসন্ধানের সূত্র খুঁজে পাবো। ধর্মের উৎপত্তি প্রসঙ্গে অধুনালুপ্ত প্রাচীন দুটি মতবাদের আলোচনা করার পূর্বে ধর্মের উৎপত্তির বিষয়টি আধুনিক কাল পর্যন্ত বিজ্ঞান সম্মতভাবে আলোচিত হয়েছে কি হয়নি সে বিষয়ে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। তবে আধুনিক মতবাদগুলি আলোচনার আগে আমরা সংক্ষেপে দু'টি মতবাদের উল্লেখ করবো। উৎপত্তি প্রসঙ্গে এ দু'টি মতবাদ খুবই জনপ্রিয় ছিল। এখন অবশ্য মতবাদগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে অথবা যেতে বসেছে।

(ক) ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ

এ মতবাদটি অত্যন্ত প্রাচীন। এ মতবাদকে ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশবাদ বলা হয়। ইহুদি, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মমতে এ বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এ মতবাদ আদিম একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হলেও পরবর্তী সময়ে এ মত থেকে বহুখোদাবাদের পুনর্জন্ম হয়েছে। ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশবাদে ধর্মের উৎপত্তির প্রসঙ্গটি অত্যন্ত বৌদ্ধিক ও যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ মতানুসারে একসঙ্গে তৈরি করা ঢালাও কতকগুলি ধারণা মানুষের শূন্য মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেবার ফলে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি অত্যন্ত স্থূল ও অমনস্তাত্ত্বিক মতবাদ। এ মতানুযায়ী প্রত্যাদেশ স্রষ্টার একটি ক্রিয়া মাত্র। মানুষের অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ কিভাবে এ প্রত্যাদেশকে প্রভাবিত করলো এবং মানুষ কিভাবে এ প্রত্যাদেশকে গ্রহণ করলো সে সব কিছু জানতে এ মতবাদ আমাদের সাহায্য করে না।[২৪] এ প্রসঙ্গে Shelling এর সমালোচনা খুবই যুক্তিযুক্ত। কোনো এক সময় ঐশ্বরিক সংস্পর্শে এসে এবং ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ লাভ করেই যদি মানুষ ধার্মিক হয়ে ওঠে তাহলে মেনে নিতে হয় যে, আল্লাহর সংস্পর্শে আসার আগে মানুষ ধর্মহীন এবং নিরীশ্বরবাদী ছিল। আবার যদি মেনে নেওয়া হয় যে মানুষ নিরীশ্বরবাদী এবং

---

[২৪] রমেশচন্দ্র মুন্সী, শ্রীঃ ধর্মতত্ত্ব পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, এ. মুখার্জী এ্যান্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ৭২-৭৩।

তাদের কোনো ধর্মীয় ধারণা ছিল না, তাহলে সেই মানুষ কি করে প্রত্যাদেশের ফলে ধর্মীয় চেতনা লাভ করলো? বিষয়টিকে অবিশ্বাস্য মনে হয়। সমস্যাটি সমাধানের যোগ্য না হলেও এখনো এর সমাধান করা সম্ভব হয়নি। যে মনের কোনো ধর্মীয় চেতনা বা ধর্মবোধ নেই একেবারে বাহ্যিক প্রত্যাদেশ থেকে সেই মনে কি করে ধর্মীয় ধারণা সৃষ্টি হতে পারে? অবশ্য এ ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের প্রয়োজনীয়তা আছে। এর ফলে ধর্মবিশ্বাসের একটা বাস্তব ভিত্তি পাওয়া যায় এবং ধর্মের সার্থকতা প্রমাণেরও সুবিধা হয়। তাছাড়া মানুষের ধর্মীয় জীবনে আল্লাহর নেতৃত্ব রক্ষার জন্য এ মতবাদেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেই ক্ষেত্রেও এ প্রত্যাদেশের ধারাবাহিকতা থাকা দরকার এবং মানুষের সেই সময়ের গ্রহণ করার ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গতি রাখা প্রয়োজন। প্রত্যাদেশকে কেবল শ্বাশত বললে চলবে না; আবার যথেচ্ছ নির্ধারিত কয়েকজনের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেও একে আটকে রাখা ঠিক নয়। কেবলমাত্র ধর্মযাজক, পুরোহিত ও ধর্মবেত্তারা এ প্রত্যাদেশ পাওয়ার অধিকারী হবেন কেন? অধিকন্তু স্বর্গ থেকে কিছুটা বৌদ্ধিক জ্ঞান বা কতকগুলি ধারণা মানুষের মনে ঢুকিয়ে দেওয়াকে প্রত্যাদেশ বলে না। প্রত্যাদেশ হবে মানুষের সামগ্রিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে।[২৫] সে যাই হোক, প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রকাশিত ধর্মীয় ধারণার মত উন্নত ও জটিল ধারণা গ্রহণ করার ক্ষমতা যে আদিম মানুষের একেবারে ছিল না, বিবর্তনের ইতিহাস থেকে আমরা সে তথ্য জানতে পেরেছি।

(খ) অতিবর্তী মতবাদ

অপর মতবাদটি হলো অষ্টাদশ শতকের তথাকথিত বৃটিশ অতিবর্তী দার্শনিক মতবাদ। এ চিন্তাবিদেরা নবীদের আবির্ভাব বা প্রত্যাদেশের ফলে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে একথা স্বীকার করেন না। তাদের মতে, মানুষের বিচারবুদ্ধি থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। ধর্মের মৌলিক সত্যগুলি হলো আল্লাহর অস্তিত্ব, আত্মার অমরতা, নৈতিক নিয়মের প্রভুত্ব প্রভৃতি। এ সত্যগুলি যুক্তিযুক্ত। এ যৌক্তিক সত্যগুলি হলো সকল স্বাভাবিক ধর্মের উপাদান। জগতের বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে এ সাধারণ উপাদানগুলি পরিলক্ষিত হয়। এসব দার্শনিক অভিমত হলো গাণিতিক সত্যের মত। এ উপাদানগুলির সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ সম্ভব। মানুষের পক্ষে যুক্তি দিয়ে ধর্ম জ্ঞান লাভ করাই স্বাভাবিক। এসব ধর্মজ্ঞান তাদের প্রথম থেকেই ছিল।

---

[২৫] পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩।

কিন্তু এক সময় পুরোহিত, ধর্মযাজক ও ধর্মবেত্তারা জনগণকে আয়ত্ব করে রাখার জন্য তাদের ভীতি ও বিশ্বাস প্রবণতাকে নিজেদের কাজে লাগানোর অপকৌশল গ্রহণ করে। ফলে স্বাভাবিক ধর্মবিশ্বাসের স্থান দখল করেছিল ব্যাপক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার। তাহলে ধর্মের উৎপত্তি হলো দু'ভাবে। একঃ বুদ্ধি থেকে উৎপন্ন স্বাভাবিক ধর্ম ও দুইঃ ধর্মযাজক, পুরোহিত ও ধর্মবেত্তাদের প্রতারণা থেকে উদ্ভুত সমস্ত প্রকৃত ঐতিহাসিক ধর্ম। ধর্মবেত্তা, ধর্মযাজক ও পুরোহিতদের প্রতারণা ও দুর্নীতি প্রবেশ করার আগে আদিম মানুষের ধর্ম বিশ্বাস ছিল অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও সুসম্পন্ন। পরবর্তীকালের সংযোজনগুলি কেবলমাত্র অপ্রয়োজনীই নয় দুরভিসন্ধিমূলক। Lord Herbert এবং John Toland ছিলেন অতিবর্তীবাদের প্রবর্তক। [২৬]

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে La Mettre, D. Alembert, Voltaire প্রভৃতি ফরাসি চিন্তাবিদেরা এ মতবাদের সমর্থন করেন। প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যেও এ মতের অনেক সমর্থক ছিল। কিন্তু এ মতবাদ এখন সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে গেছে, কারণ এর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি ছিল। এ মতবাদে ধর্মের উৎপত্তির কারণ হিসেবে যুক্তিকে খুব বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যে আবেগ ও সংজ্ঞার দীপ্তি ধর্মীয় অভিজ্ঞতার উৎস হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাদের অবজ্ঞা করা এ মতালম্বীদের ঐতিহাসিক চেতনার অভাব ছিল। তাহলে ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ কেবল ধর্মে নয়, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সক্রিয়তাকেও এ মতবাদে অবহেলা করা হয়েছে। আদিম মানুষেরা ধর্মীয় চিন্তার মত একটি পরিণতির চিন্তা করতে সক্ষম এ ধারণাও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ ধর্মীয় ধারণার উপলব্ধি করতে মানুষের অনেক যুগ সময় লেগেছিল। ঐশ্বরিক মতবাদেও আমরা একই ত্রুটি লক্ষ্য করেছি। এ মতবাদের সবচেয়ে অবাস্তব যুক্তি হলো যে স্বার্থপর ও লোভী পুরোহিতরা সুচিন্তিত ভণ্ডামির সাহায্যে ঐতিহাসিক, ধর্মমতগুলো আবিষ্কার করে। পুরোহিতেরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রায় যে মানুষের ধর্ম প্রবণতার সুযোগ গ্রহণ করতো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পুরোহিতদের এ অপচেষ্টার পূর্বে যে বিশ্বাসের অস্তিত্ব ছিল তাকেই কেবল তারা কাজে লাগাতে পেরেছিল। পুরোহিতরা স্রষ্টা ছিল, তারা ছিল সংরক্ষক।[২৭]

---

[২৬] সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ, ধর্মে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৭৪, পৃ. ৩৯-৪১।

[২৭] Jastrow, Ch. M.: The study of Religion, Alen and Co Ltd. London, 1901, p. 19, 108.

প্রকৃত স্রষ্টা ছিলেন অবতারেরা। বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব প্রভৃতির সঙ্গে তাদের প্রায় কোনো সম্পর্ক ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক ধর্মের উৎপত্তিতে পুরোহিত অপেক্ষা সাধারণ মানুষের অবদান বেশি। এ ছিদ্রান্বেষী মতবাদ অনুসারে, ধর্ম একটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত আবিষ্কার। মানুষের স্বভাবের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ হিসেবে ধর্মকে ব্যাখ্যা করতে এ মত অসমর্থক। এ মতকে কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না। বর্তমানে এর কোনো সমর্থকও নেই।

(গ) ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

এসব প্রাক-বৈজ্ঞানিক প্রাচীন মতবাদগুলির আলোচনা না করে ধর্মের উৎপত্তি প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো। এ আলোচনা নৃতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হতে পারে। নৃতত্ত্ব ধর্মের প্রাগৈতিহাসিক উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা করে। যেমন, দেশকালে ধর্ম কিভাবে আবির্ভূত হলো? মানুষের ধার্মিক প্রকৃতি কিভাবে আত্মপ্রকাশ করল? যে আদিম ধর্ম থেকে সকল ক্রমবিকাশ ঘটেছে বলে অনুমান করা হয় সেই ধর্মের একেবারে আদিরূপটি কেমন ছিল? অপরদিকে মনস্তত্ত্বের সমস্যা হলো কেবল সূচনাতেই নয়, সর্বকালে ও সর্বদেশে মানুষের কোনো আত্মিক প্রকৃতি থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে? মানুষের মনের গহনে, কোনো অপরিবর্তনীয় উপাদানগুলি পরিবেশের সঙ্গে মিশ্রণের ফলে ধর্মীয় মনোভাব লাভ করেছে? কোনো তীব্র আকাঙ্খা, প্রচারণা, সংকল্প বা প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ অতীন্দ্রিয় শক্তিকে উপলব্ধি করেছে এবং নিজের জীবনকে সেই উপলব্ধির উপযোগী করে তুলেছে? মানুষের মনে এমন ধারণা কি করে জন্মে যেখানে মানুষ আছে সেখানে কোনো না কোনো রূপ ধর্ম আছে? এ দুই প্রস্থ প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে অবিচ্ছেদ। নৃবিজ্ঞানীগণ তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য মনোবিজ্ঞানীদের সাহায্য যেমন প্রত্যাশা করেন একইভাবে মনোবিজ্ঞানীরাও নৃবিজ্ঞানীদের সাহায্য কামনা বা প্রয়োজনবোধ করেন। বিশেষ করে নৃবিজ্ঞানী আদিম মানুষের ধর্ম বিষয়ে কিছু বলার আগে আদিম মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে পরিজ্ঞান লাভের প্রয়োজনবোধ করেন। বস্তুতপক্ষে, তাদের কাজকে মনো বৈজ্ঞানিক বলা যেতে পারে।[২৮] কারণ, প্রাচীনতম ধর্মগুলির যেমন বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহ্য নেই তেমনি কোনো লিখিত প্রামাণ্য দলিলও নেই। তাঁরা ইতিহাস অনুসরণ করে যেমন ধর্মের আদিতে গিয়ে পৌঁছতে পারে না তেমনি মানুষ কি করে ক্রমশ ধর্মমুখী হয়ে ওঠল সে আলোচনা করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ

---

[২৮] Coe, G. A.: Psychology of Religion, Chicago University Press, Chieago, 1916, p. 426.

ইতিহাসের সূচনাকালে মানুষ পুরোপুরি ধার্মিক হয়ে ওঠে। আর মানুষের ইতিহাস আরম্ভ হয় ধর্মের ইতিহাস থেকে। তাহলে আধুনিককালে অসভ্য মানুষ ও শিশুদের মন ও তাদের জীবনধারা সহানুভূতির সঙ্গে পর্যালোচনা করে এবং গঠনমূলক কল্পনার ভিত্তিতে তথ্য বিশ্লেষণ করে নৃবিজ্ঞানী আমাদের জন্য আদিম মানুষের ধর্মীয় ধারণার পুনর্গঠন করতে পারেন। তাঁর এ পুনর্গঠন হবে সম্পূর্ণ অনুমান সিদ্ধ। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে আমরা অসভ্যদের ধর্ম সম্পর্কে অনেক তথ্য পেয়েছি। এর সাহায্যে আমরা সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের ধর্মবিশ্বাসকে ধর্মের উৎসরূপে গণ্য করতে পারি। কিন্তু ভুল গেলে চলবে না যে এ জ্ঞান অনুমান মাত্র। এ অনুমানের সত্যতা মনোবৈজ্ঞানিক পরিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে। মানুষের মনের কোন্ গহনে ধর্মের উৎসটি রয়েছে-আমাদের প্রধান আগ্রহ হলো সেই জ্ঞান লাভ করা। এ মনস্তাত্ত্বিক আগ্রহ নিবৃত্তির কাজে সাহায্য করবে ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব। ধর্মের স্বরূপ আবিষ্কারের সফল পদ্ধতি হলো Hoffding এর ভাষায় মনস্তাত্ত্বিক উৎপত্তি বিষয়ক পদ্ধতি।[২৯] এ কথা মনে রেখে আমরা প্রথম কয়েকটি আধুনিক নৃতাত্ত্বিক মতবাদ আলোচনা করবো। তারপর আরো সুনির্দিষ্টভাবে মনস্তাত্ত্বিক মতবাদগুলি আলোচনা করবো। অজস্র মতবাদের মধ্যে আমাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মাত্র মতবাদ এখানে আলোচনা করা সম্ভব হবে।

(১) E. B. Tylor এর সর্বপ্রাণবাদঃ Tylor এর সর্বপ্রাণবাদকে ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক মতবাদ বলা যেতে পারে। এখানে আদিম নর-নারীর মন ও আচার-আচরণের সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। Tylor তার Primitive culture গ্রন্থে এ মতবাদ ব্যক্ত করেন। সংস্কৃতির একটা স্তরে মানুষ প্রকৃতির সকল বিষয়কে স্বপ্রাণ বলে ভাবত। গাছ, নদী, পর্বত, মেঘ, প্রস্তর, নক্ষত্র সবকিছুকে তারা প্রাণবাদ বলে মনে করতো। আদিম মানুষ যা কিছু দেখত নিজেদের মত তাদের সবকিছুকেও স্বপ্রাণ বলে ভাবত। আদিম মানুষের একটি মাত্র যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা ছিল। সেটি হলো সাদৃশ্যের নীতি। তারা এ যুক্তি প্রয়োগ করেছে সেই সম্পর্কে তারা সচেতন থাকত না। সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে নিজেদের অভিজ্ঞতাকে তাবৎ জিনিসের ওপর আরোপ করতো। চারিদিকে মানুষ যে সব গতি প্রত্যক্ষ করতো নিজেদের গতির সাদৃশ্যে যারা তাদের ব্যাখ্যা করতো। তাদের তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝতে পারতো যে, নিজেদের গতির কারণ হলো তাদের আত্মা অথবা সেই আত্মার ইচ্ছা। অতএব গতিশীল

[২৯] Harold Hoffding, The Philosophy of Religion, Macmillan, London, 1906, P. 265.

প্রকৃতি প্রাণময় আদিম মানুষের মত বর্তমান যুগের এক শ্রেণির মানুষ যারা চিন্তার দিক থেকে পশ্চাৎপদ তারা মনে করে যে, সমগ্র প্রকৃতি প্রাণময়, অসংখ্য আত্মায় পরিপূর্ণ। Tylor এর মতে, সর্বপ্রাণবাদ থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। কিছু কিছু আত্মার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। অসংখ্য আত্মায় জগৎ পরিব্যাপ্ত। এ জ্ঞান লাভের পর তারা ক্ষমতাশীল আত্মাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছে এবং সেই সঙ্গে অশুভ আত্মাগুলিকে বিতাড়িত করতে চেয়েছে।[৩০] Tylor নৃতাত্ত্বিক ও তাঁর মতবাদ ধর্মীয় আলোচনার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এখন সাধারণভাবে এটা সকলে স্বীকার করে নিয়েছে যে সভ্যতার কোনো একটা স্তরে সকল মানুষ সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাস করতো। তবু ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ক আলোচনায় এ মতকে সন্তোষজনক বলা যায় না।

Herbert Spencer এর পূর্বপুরুষ উপাসনাবাদ প্রেতাত্মারূপে আবির্ভূত পূর্বপুরুষদের উপাসনা থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। স্পেনসার এ সুপরিচিত মতবাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করা যেতে পারে। পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে একটা সশ্রদ্ধ ভীতি অসভ্য জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে রয়েছে। যতই আমরা অতীতের দিকে অন্বেষণ করবো, পূর্বপুরুষদের আত্মার উদ্দেশ্য উপাসনার লক্ষণ সর্বত্র দেখতে পাবো। হার্বার্ট স্পেনসার একেই ধর্মের আদিম রূপ বলে বিশ্বাস করতেন। এ ধর্ম কালে কালে বিভিন্নরূপে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। জীবিত মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যারা চলে গেছে সেই মৃতের প্রতি ভয় থেকে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ, আচার-অনুষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে। সর্বপ্রাণবাদ কোনো মৌলিক মতবাদ নয়। অন্য মত থেকে গৃহিত। মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মা-প্রেতাত্মারূপে পুনরাবির্ভূত হয় এবং বাসস্থান হিসেবে কিছু কিছু জিনিস পছন্দ করে নেয়। এ বিশ্বাসের সার্বজনীন রূপই হলো সর্বপ্রাণবাদ। যা হোক, স্পেনসারের এ মতবাদটি অতি সারল্য দোষেদুষ্ট। তিনি এখানে একটি জটিল সমস্যার অতি সহজ সমাধান দেবার চেষ্টা করেছেন। পূর্বপুরুষদের উপাস্য করে প্রদত্ত স্পেনসারের সংকীর্ণ যুক্তির ওপর ধর্মের কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ধর্ম একটি অত্যন্ত জটিল বিষয়। যতই আদিম রূপের হোক না কোনো উপাসনাকে কোনো একটি মাত্র আবেগে বা চিন্তার দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। বরং ধর্ম হলো অনেকগুলি জটিল ও শক্তিশালী চিন্তার সৃষ্টি। এ সৃষ্টির প্রকাশ ঘটবেই যেমন পাহাড় হতে বিভিন্ন দিক থেকে নেমে আসা স্রোতধারা স্ফীত হয়ে নদী উপচে পড়ে।

---

[৩০] Tylor, E. B.: Primitive Culture, Tr. John Murray, 1871, 3rd edition, 1891, Vol.1, P. 26.

Dr. Jevons তাঁর অভিমত পোষণ করেছেন মৃতের আত্মাকে কখনোই আল্লাহরূপে চিন্তা করা হয়নি। মানুষ আল্লাহর ওপর নির্ভর করে। কিন্তু মৃত পূর্ব পুরুষদের আত্মা মানুষের ওপর নির্ভর করে। উপাসকের ধর্ম এ যে তার পূর্বপুরুষের আল্লাহ ছিলেন অতএব অমর। ঘটনাটা হলো পূর্বপুরুষদের যখন মানুষ হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে তখন আর তিনি আল্লাহরূপে উপাস্য থাকছেন না। বিপরীতক্রমে পূর্বপুরুষরা যখন আল্লাহরূপে উপাস্য হয়ে উঠছেন তখন আর তাদের মানুষরূপে বিশ্বাস করা হচ্ছে না[৩১]। কথাটির মধ্যে অত্যুক্তি থাকতে পারে। কিন্তু একথা বলতে অসুবিধা নেই যে পূর্বপুরুষদের আত্মায় বিশ্বাসী সকল অসভ্য জাতি পূর্বপুরুষদের উপাস্য করে তোলেনি। Spencer এর কল্পনা মত আমরা অসভ্যদের মধ্যে প্রেত উপাসনার বহুল প্রচলন দেখিনি। প্রকৃতির উপাসনা অপেক্ষা প্রেতাত্মা উপাসনা অধিক প্রাচীন–এ মত সমর্থন যোগ্য নয়।

(২) টোটেমবাদ ধর্মের প্রাচীনতম ও সহজতম রূপ: অনেকের মতে টোটেম মতবাদ ধর্মের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও আদিমরূপ। টোটেম বিশ্বাস এমন এক অস্বাভাবিক জটিল ঘটনা যার বিভ্রান্তিকর জটিলতাকে আমি এখানে সম্ভবত ক্ষুদ্র পরিসরে বর্ণনা করতে অক্ষম। যখন এক ধরনের প্রাণী বা লতাগুল্ম বা এক শ্রেণির জড়বস্তু এক সঙ্গে একটি সামাজিক গোষ্ঠি হয়ে বসবাস করে তখন সেই প্রাণী বা লতাগুল্ম বা জড়বস্তুকে টোটেম বলা হয়। প্রায়ই টোটেমকে গোষ্ঠির পূর্বপুরুষ হিসেবে গণ্য করা হয়। টোটেম ঠিক স্রষ্টা নন; সমজাতীয় বা সমগোত্রীয় শ্রদ্ধার পাত্র। সাধারণ কাজে একে আদৌ ব্যবহার করা যায় না। টোটেমকে অবশ্য একটা প্রজাতি হতে হবে। পবিত্রভাবে একে উৎসর্গ না করে একে হত্যা করাও যায় না। খাওয়াও যায় না। কোনো একটি মাত্র গাছ বা একটি মাত্র প্রাণীকে টোটেম হিসেবে গণ্য করা হয় না। Robertson Smith তাঁর Religion of the Semities গ্রন্থে যুক্তিনিষ্ঠ জোরালো সমর্থন জানানোর ফলে টোটেমবাদ থেকে উপাসনার উৎপত্তি হয়েছে এ মত যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল। পরবর্তী সময়ে Jevons তাঁর Introduction to the History of Religion গ্রন্থে এ মতবাদের আরও উন্নতি সাধন করেন Smith-এর মতে সব রকম উৎসর্গের পদ্ধতির উদ্ভব হয় টোটেমবাদ থেকে। তাঁর প্রতিভাদীপ্ত জোরালো যুক্তি ধর্মের বিজ্ঞানভিত্তিক অনুষ্ঠানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু বর্তমানের ধর্ম সম্পর্কিত সকল তথ্য বিশ্লেষণ করতে এ মত পর্যাপ্ত নয়। Jevons এর মতে, টোটেমবাদ হলো সমাজের

---

[৩১] Jevons, F. B.: An Introduction to the History of Religion, London, 1896, p.196.

একেবারে আদিরূপ। এক সময় এ বিশ্বাস ছিল বিশ্বব্যাপী।[৩২] টোটেমবাদ থেকে বহুস্রষ্টাবাদের প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। তিনি অবশ্য টোটেমবাদকে ধর্মের একেবারে আদি অবস্থা বলে দাবি করেননি। কারণ তিনি প্রাক-টোটেমীয় অবস্থার কথাও বলেছেন। কিন্তু সেই অবস্থায় 'ধর্মবিশ্বাসের প্রকৃতি' পুরোপুরি অনুমান নির্ভর বিষয় বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৩৩] বহির্জগতের জন্তু-জানোয়ারেরাই ছিল প্রথম উপাস্য এবং টোটেমবাদ ছিল সেই উপাসনার আদিমরূপ। এবং দীর্ঘদিন ধরে মানুষের একটি মাত্র উপাস্য ছিল যাকে টোটেম বা গোষ্ঠিদেবতা বলা যেতে পারে। এ বিশ্বাসকে একশ্বেরবাদ বলা হয়।[৩৪]

Jevons এখানে যা বোঝাতে চেয়েছেন তাতে Monotheian শব্দটি অপেক্ষা Monolatry শব্দটি মনে হয় অধিকতর অর্থবহ হবে। এ মতবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, প্রত্যেক ধর্ম টোটেম স্তর অতিক্রম করে এসেছে এ মত অত্যাধুনিক গবেষণায় স্বীকৃত হয়নি। টোটেমবাদের প্রাচীনত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ মতবাদের সার্বজনীনতাকে প্রমাণ করা সহজ নয়। অনেক অসভ্য সমাজে এ বিশ্বাস একেবারে অজ্ঞাত। অন্তত এখন তাদের মধ্যে এ বিশ্বাসের প্রচলন নেই। উদারহণস্বরূপ, শ্রীলঙ্কার ভেদ উপজাতি বা আন্দামানের অধিবাসী অথবা নিম্ন ব্রাজিলের উপজাতি। এদের মধ্যে কোনো টোটেম বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয় না। আবার অষ্ট্রেলিয়ায় উপজাতিরা টোটেম বিশ্বাস করে কিন্তু উপাসনা করে না। তাদের কাছে টোটেম কোনো দেবদেবী নয়। যদিও টোটেমবাদ ধর্মের সীমা সংলগ্ন তবুও টোটেমবাদকে কখনো সঠিকভাবে ধর্ম বলা যেতে পারে না। টোটেমবাদকে কোনো বিশেষ ধরনের আদি ধর্ম না বলে একটি সামাজিক বা উপজাতীয় সংগঠন বলা যেতে পারে। যা হোক Jevons তাঁর পরবর্তী রচনায় এ মত কিছুটা পরিবর্তন করেছেন।.

ফরাসি সমাজবিজ্ঞানীগণ বর্তমানকালে এ মতবাদের একটি নতুনরূপ দিয়েছেন। Emile Durkheim তাদের মধ্যে সমধিক বিখ্যাত। তাঁর মতে, এখন যে সব ধর্ম বিশ্বাসের সন্ধান সম্ভব, টোটেমবাদতাদের মধ্যে সহজতম এবং সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তিনি যদিও টোটেমের সার্বজনীন অস্তিত্ব রক্ষা সম্পর্কে দ্বিধা পোষণ করেন তবুও এ বিশ্বাসকে সমাজের ও ধর্মের আদিরূপ হিসেবে মেনে নিতে তাঁর কোনো আপত্তি

---

32 Jevons, F. B., lbid, P. 99-117.

33 Jevons, F. B.: lbid, p. 413.

34 Jevons, F. B.: lbid, p. 411.

নেই। জীবন নিয়ন্ত্রণকারী নৈর্ব্যক্তিক রহস্যময়ী শক্তির ধারণাই হলো ধর্মীয় বিশ্বাসের আঁধার। অবশ্য ব্যক্তির ওপর সমাজের প্রভূত্ব থেকে এ শক্তির ধারণা জন্মায়। ব্যক্তির ওপর গোষ্ঠি শক্তির প্রভাব থেকে মানুষ জগতে রহস্যময়ী শক্তির চেতনা লাভ করেছিল। টোটেম এ শক্তির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতীক। কিন্তু যে সত্তা ঐ টোটেমের পশ্চাতে থাকে অথবা টোটেম যে সত্তার প্রতীক মাত্র তা হলো সামাজিক, রাজনীতি, আবেগ ও চিন্তার শক্তি। এ শক্তিই প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি জীবনের ওপর প্রভূত্ব করে। মানুষের প্রকৃত স্রষ্টা হলো সমাজ। সমাজের শক্তিকেই মানুষ প্রকৃতপক্ষে উপাসনা করে। Durkheim এর মতে, ধর্ম সম্পূর্ণরূপে সামাজিক ঘটনা। তিনি তাঁর সামাজিক মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে টোটেমবাদের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন।[৩৫] এ বিষয়ে আর বেশি আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। আমরা আবার বলতে পারি যে পৃথিবীর একটা বৃহৎ অংশেই টোটেম বিশ্বাসের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। সত্যি বলতে কি টোটেমবাদ আদৌ কোনো ধর্ম নয়। টোটেমের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, তার কাছ থেকে সাহায্যও চাওয়া হয় কিন্তু টোটেম কখনো স্রষ্টা হিসেবে পুঁজিত হয়নি।[৩৬] কিন্তু Durkheim যখন বলেন প্রাকৃতিক শক্তিকে অথবা পূর্বপুরুষদের প্রেতাত্মাকে উপাসনা করার থেকেও ধর্ম প্রাচীন। ধর্মের মূলে রয়েছে কোনো রহস্যময় নৈর্ব্যক্তিক শক্তি সম্পর্কে অস্পষ্ট কিন্তু আবেগগত দৃঢ় প্রত্যয়, তখন তাঁর মতকে যথার্থ বলে মনে হয়।

(৩) প্রাক-প্রাণবাদী ধর্ম সম্পর্কে মানার ধারণা: আধুনিক নৃতত্ত্বে সর্বপ্রাণবাদের পূর্ববর্তী অবস্থায় ইন্দ্রজাল থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। অব্যাখ্যেয় রহস্যময় সর্বব্যাপ্ত নৈর্ব্যক্তিক শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয় থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। এ শক্তিকে Mana বলা হয়। Mana শব্দটি Melanesian পদ। বিভিন্ন ভাষায় সমার্থবোধক বিভিন্ন পদ রয়েছে। যেমন, উত্তর আমেরিকার Algonquin উপজাতি বলে Maniton, Groquian উপজাতি বলে Orenda এবং Siour বলে Wakonda। এ শব্দগুলিতে প্রকাশিত ধারণা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জাতিতে এবং সংস্কৃতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু Melanesian শব্দ Mana কে গ্রহণ করেছি এ জন্যে যে, এ শব্দের ধারণাটি অনেক স্পষ্ট। Bishop Codrington তাঁর The Melanesian গ্রন্থে Mana শব্দটি ব্যবহার করেন এ জন্যে যে, আদিম মানুষের মনে Mana-র ধারণা খুব শক্তিশালী কিন্তু তা

---

[৩৫] Emile Durkheim, Elementary from ofthe Religions Life, Tr. Geo, Alen and Unwin, 1915, p. 115.

[36], vol. 12, p. 406

অস্পষ্ট ছিল। তাঁর আবেগের দিকটি বলিষ্ঠ হলেও বৌদ্ধিক মূল্য অত্যন্ত দুর্বল। আমার গবেষণার স্বার্থে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা করতে চাই। কিন্তু বিপদ হলো আদিম মানুষের অকপট মানসিকতার সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছি। সর্বব্যাপ্ত অতীন্দ্রিয় একটি শক্তি যা অপ্রত্যাশিতভাবে কাজ করে বা বিশিষ্ট প্রাকৃতিক বস্তুতে আবির্ভূত হয় তাকে Mana বলে। Mana হলো ঐন্দ্রজালিক গুণ। Mana ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক অবস্থার মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে। Mana এর স্বভাব যতটা প্রাকৃতিক তার থেকে বেশি মানসিক। সকল বস্তুতে থাকার সম্ভাবনা থাকলেও প্রায়ই বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুতে Mana এর সন্নিবেশ ঘটে। Mana হলো পরম সত্তার এক অফুরন্ত শক্তির আঁধার। সেখান থেকে মানুষ ভালমন্দ বা কিছু সংগ্রহ করতে পারে। রাজনীতি, সমাজনীতি বা যে কোনো কাজে মানুষ তার ক্ষমতা প্রকাশ করে সেটাই হবে তার Mana[37]

যদি কোনো ব্যক্তি যুদ্ধে সফল হয় তাহলে সেই সাফল্য সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য হবে না। তা হবে কোনো আত্মার Mana এর প্রতি ভর করার ফল। আর এ সাফল্য অপার্থিব শক্তির সাহায্যে প্রার্থনা লাভের মাধ্যমে সম্ভব হয়। Mana-য় না ভর করলে একটা নৌকা দ্রুত যেতে পারে না অথবা একটা তীর মারাত্মক আঘাত হানতে পারে না।[৩৮] Codrington-এর মতে, একটি টোটেম প্রাণীর ক্ষমতা থাকতে পারে অথবা ধূর্ততাও থাকতে পারে। প্রাণীটিতে Mana আছে বলেই সে পবিত্র। মানুষ Mana লাভ করার জন্য পবিত্রভাবে সেই প্রাণীটিকে ভক্ষণ করে। সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের লেখা আধুনিক গ্রন্থগুলোতে এরকম অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায়।[৩৯] এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা ভাল যে, এ শব্দটির একটি শক্তিশালী উচ্ছাসের পরিমণ্ডল রয়েছে। এ শব্দটির দ্বারা কেবলমাত্র একটি বস্তুগত শক্তি বোঝায় না, ভয় ও বিস্ময়জাত আবেগযুক্ত প্রতিক্রিয়াকেও বুঝায়।

পরিশেষে বলা যায় নৃতত্ত্বে ও মানসিক আলোকে ধর্মের উৎপত্তির আলোচনায় লক্ষণীয় যে, হাল আমলের মানুষ ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার দিক থেকে আদিম মানুষ থেকে অনেক দূরে এসেছে তবুও মন ও দেহ উভয় দিক থেকেই হাল আমলের মানুষ তাদেরই বংশধর। হাল-আমলের মানুষ সভ্য হয়েও তার আদিম সহজাত

---

৩৭ Marett, R. R. The Threshold of Religion, 2nd ed., Methuin, London, 1914, p. 28.

38 Harthland, E. S. Ritual and Belief, lbid, p. 66.

39 Emile Durkheim, Elementary froms of the Religions Life, Tr. Geo, Allen and Unwin, 1915, p. 188.

প্রবণতাগুলি ত্যাগ করতে পারেনি। মানুষ তার অগ্রগতির সময় নুতন মূল্যবোধ লাভ করছে। নুতন পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে কিন্তু তার আদিম আবেগ ও উচ্ছ্বাস থেকে সে কখনো মুক্তি পায়নি। সেই মানুষ এখনো আমাদের মধ্যে বাস করে। অবশ্য এর মানে এ নয় যে, ধর্মের প্রাকৃত কোনো ক্রমবিকাশ ঘটেনি। সভ্য মানুষের ধর্ম হলো অসভ্য আদিম মানুষের ধর্মের নিদর্শন মাত্র। অগ্রগতি হয়েছে সেই সঙ্গে ধারাবাহিকতাও থেকেছে। ক্রমবিকাশের সম্ভাব্য শর্ত হিসেবেই ধারাবাহিকতার কথা আসে।

(ঘ) ধর্মের মানসিক উৎপত্তি

ধর্মের উৎপত্তি প্রসঙ্গে আলোচনায় ধর্মের প্রকৃত উৎস মানুষের মনোজগতে অনুসন্ধান করতে হবে। প্রশ্ন হলো-মানুষের মনে এমন কি উপদান বিদ্যমান আছে যার ফলে মানুষ ধর্মপ্রবণ হয়ে উঠল? এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। প্রশ্নের একটি বহুল পরিচিত জবাব হলো মানুষের ধর্ম প্রবণতা একটি সহজাত প্রবৃত্তি। আর সহজাত প্রবৃত্তি হলো কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণার প্রতি কোনো নির্দিষ্ট সরল স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া মাত্র। যার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। কিন্তু ধর্মীয় ধারণা এখনো কোনো অযৌগ্য ধারণা নয় যে তার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। বরং ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগের সংমিশ্রণ দেখা যায়। সুতরাং সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা ধর্মের উৎপত্তির অনুসন্ধান সম্ভব নয়।[৪০]

অনেকের মতে, মানুষের মনে বিভিন্ন বিভাগ আছে। এক একটি বিভাগ এক এক রকম কাজ করে। ধর্মের জন্য মানুষের মনে স্বতন্ত্র একটি বিভাগ রয়েছে। সেই বিশেষ মনোবৃত্তি থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে।[৪১] ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে আর একটি সুপ্রাচীন মতবাদ হলো ভয় থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। অনেক প্রখ্যাত প্রাচীন ও আধুনিক মনীষী এ মতবাদের সমর্থক। আদিম ধর্মে ভয়ের যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রকৃতির রহস্যময় শক্তি সম্পর্কে আদিম মানুষের মনে একটা শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয় সর্বদা থাকতো। তাই তারা যাদের অশুভ শক্তি বলে মনে করতো তাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতো যাতে তারা কোনো অনিষ্ট করতে না পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা প্রকৃতিতে শুভ শক্তির

---

৪০ Dougall, W. Me.: Social Psychology, 12th ed., Cambridge University Press, 1917, p. 9.

41 Jastrow, Ch. M.: The study of Religion, Alen and Co Ltd. London, 1901, p. 101.

অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো, কোনো প্রাপ্তির আশায় তাদের উপাসনা করতো। যদি ধর্ম কেবলমাত্র ভয় থেকে উৎপন্ন হত তাহলে বীভৎস্য ও ভয়ঙ্কর বস্তুসমূহ উপাস্য হয়ে উঠত। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। আর সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা প্রভৃতিকে কেবলমাত্র ভয় বলা যায় না। এগুলি এক একটি মিশ্র আবেগ। ধর্মের মূল ভিত্তি ছিল ভালোবাসা।

Dr. Marett-এর মতে ভয়, বিস্ময় এবং বিশুদ্ধ ভয় এক জিনিস নয়। আমরা যদি বিস্ময়, প্রশংসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা এমনকি ভালবাসাকেও ধর্মীয় মানবিকতার ক্ষেত্রে ভয়ের থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গ্রহণ করি তাহলে আমরা পেট্রোনিয়াসের মত ভুল করবো।[৪২] তবে 'ভালোবাসা' যে ধর্মের মূলে রয়েছে এটা বর্তমান যুগের সকল মনীষী ও ধর্মতত্ত্ববিদরা স্বীকার করেছেন। মহান আল্লাহর বিভীষিকা থেকে নয়, তার সঙ্গে আত্মীয়তার উপলব্ধি থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। আবার অনেকে স্বীকার করেছেন যে আবেগের ভূমিকা থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। Leuba বলেছেন, আদিম মানুষের ধর্ম চেতনায় ভয়ের আধিক্য যে দেখা যায় তা একমাত্র কারণ মানুষের মনে অন্যান্য আবেগের মধ্যে প্রথম ভয়ের আবেগটিই সংহত হয়েছিল। আদিম মানুষকে প্রকৃত ও কাল্পনিক বিপদের বিরুদ্ধে সুতীব্র জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হতো। ফলে তাদের চেতনায় ভয়ের অনুভূতিটি সর্বদা সজাগ হয়ে থাকতো। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি না হলেও ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতাবোধগুলি ধীরে ধীরে ভয়ের মতো মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছিল। মূলত আল্লাহর বিভীষিকা থেকে নয়, তাঁর সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কে উপলব্ধি থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। Robertson Smith এ মতের সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করেন। তিনি একটি উদ্ধৃতির মাধ্যমে দেখান যে, আদিম মানুষেরা অসংখ্য বিপদের দ্বারা নিজেদের পরিবেষ্টিত বলে মনে করত। সঠিকভাবে তারা বিপদটা কি তা জানতো না, কিন্তু অদৃশ্য কোনো ব্যক্তির রহস্যময়ী শক্তিই যে বিপদের কারণ তারা সেটা বুঝতো এবং এটাও বুঝতে পারতো যে সেই ব্যক্তি মানুষের অধিকতর শক্তিশালী এ মত যতই সত্য হোক না কেন ঐ অদৃশ্য শক্তিকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে একথাকে সত্য বলে স্বীকার করা যায় না। আদিকাল থেকেই ধর্ম এবং ইন্দ্রজালের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল। সেই সত্তা নিজেদের মধ্যে কখনো কখনো ক্রোধ প্রকাশ করে থাকতে পারে। সে যা হোক, অজ্ঞাত শক্তির ভয় থেকে নয়, দেবদেবী তাদের উপাসকদের

42 Marett, R. R. Ibid, p. 13

সঙ্গে আত্মীয়তার দৃঢ় বন্ধনে থাকতেন, সেই পরিচিত দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থেকে প্রকৃত অর্থে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে।[৪৩]

(ঙ) ধর্ম ও ইন্দ্রজাল

ধর্মের উৎপত্তি ও প্রকৃতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধর্ম ও ইন্দ্রজালের সম্পর্ক একটি মৌলিক তাত্ত্বিক প্রশ্ন হিসেবে বিবেচিত। বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানী ও ধর্মতত্ত্ববিদ এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রদান করেছেন। অনেকে মনে করেন ধর্ম ও ইন্দ্রজালের উৎস এক। ধর্মের উৎপত্তি কি ইন্দ্রজালের পূর্বে না পরে? একটির ক্রমবিকাশের ফলে অন্যটির উদ্ভব হয়েছে? Jevons এর মতে ধর্ম ইন্দ্রজালের পূর্ববর্তী, ধর্ম বিশ্বাসের অবনতিকালে ইন্দ্রজালের উৎপত্তি হয়েছে।[৪৪] এই আলোচনায় Frazer এর মত বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁর মতে, তাঁর মতে, ইন্দ্রজাল (সধমরপ) ধর্মের পূর্ববর্তী পর্যায়। মানবচিন্তার বিবর্তনের ধারায় একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে ইন্দ্রজালের উদ্ভব ঘটে এবং পরবর্তী সময়ে ধর্মের ধারণা বিকশিত হয়। তাঁর বিশ্লেষণে ধর্ম ও ইন্দ্রজাল পরস্পর বিরোধী বা পৃথক প্রকৃতির তেল ও জলের মতো।।[৪৫] যেখানে ইন্দ্রজাল কার্যকারণভিত্তিক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা এবং ধর্ম উচ্চতর শক্তির প্রতি প্রার্থনা ও নির্ভরতার প্রকাশ।

উপর্যুক্ত মতবাদের প্রধান ত্রুটি হলো এতে আদিম মানুষকে এক প্রকার বিলাসী দার্শনিক কল্পনা করা হয়েছে। এ মতানুসারে, জীবন ও জগতের রহস্য ব্যাখ্যা এবং কার্যকর সমাধান অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রজাল ব্যর্থ হওয়ায় মানুষ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু এর ব্যাখ্যা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে এ মতবাদ মূলত নেতিবাচক দিক ব্যাখ্যা দেয়। ধর্মের উদ্ভব কীভাবে ঘটল, তার কোনো সুস্পষ্ট ও ইতিবাচক কারণ এখানে নির্দেশ করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, ধর্ম ও ইন্দ্রজাল উভয়ই রহস্যময় অদৃশ্য শক্তির ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত। ইন্দ্রজাল সেই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, আর ধর্ম প্রার্থনা ও উপাসনার মাধ্যমে তার অনুকম্পা লাভের চেষ্টা করে। আদিম মানুষের কাছে ধর্ম ও ইন্দ্রজালের পার্থক্য সুস্পষ্ট ছিল না; বরং পরিবেশ ও অদৃশ্য শক্তির প্রতি তাদের আবেগগত প্রতিক্রিয়া থেকেই উভয়ের উদ্ভব হয়েছিল।

---

43 Smith, W. R, Ibid, P. 55.

44 Jovons, F. B, Ibid, P.25.

45 Frazer, Sir James, The Golden Bough, Macmillan, 3rd ed., Vol.1, 1923, P. 220-243.

ধর্ম ও মানব জীবন

জীবনের প্রতি মানুষের অতৃপ্ত বাসনা, অন্যান্য অভিজ্ঞতা থেকে ধর্মীয় অভিজ্ঞতাতেই অধিকতর সার্থকতা লাভ করে। ধর্ম মানুষকে পরিপূর্ণ জীবনের সন্ধান যেভাবে দিয়েছে তেমনটি অন্য কোনো মতবাদ দিতে পারেনি। জৈব-আকাঙ্খার বেড়াজাল ভেঙে ধর্ম জীবনকে অনেক উর্ধ্বে স্থাপন করতে পেরেছে। কেবলমাত্র অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত না রেখে মানুষকে সত্য শিব ও সুন্দরের মধ্যে উন্নততর পরিতৃপ্তির সন্ধান দিয়েছে। অবশ্য একথা সত্য নাও হতে পারে যে, ধর্মই কেবল আমাদের এ অভিনব মূল্যের সন্ধান দিয়েছে। কারণ ধর্মীয় অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক অভিজ্ঞতার সাহায্যেও মানুষ সত্য-সুন্দরের অন্বেষণ করেছে। কিন্তু ধর্ম-জীবনকেই মানুষ ঐ মূল্যগুলিকে একটা বিশাল সুসংবদ্ধ জীবন যাপন প্রণালীর মধ্যে সুসংঘটিত করতে সক্ষম হয়েছে এবং এ জীবনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। যে জীবনে আছে পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধির নির্দেশ, যে জীবনে আছে ইন্দ্রিয় জয় করার উপায়, সেই জীবনকেই আমরা আদর্শ জীবন বলি।'[৪৬]

এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, আদিম মানুষের কাছে এসব ধারণা ছিল অস্পষ্ট। সময়ের বিবর্তনে এ ধারণা ধীরে ধীরে স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। এক সময় ধর্ম ছিল পার্থিব মঙ্গল বা লৌকিক কল্যাণ লাভের উপায়মাত্র। যুদ্ধজয়, প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করাই তখন মঙ্গলের প্রতীক ছিল। বিপজ্জনক পরিবেশে নিরাপত্তা ও নিশ্চিয়তা লাভের অনুভূতি থেকে আদিম মানুষের মনে এ ধারণার জন্মেছিল। কিন্তু এ ধারণা যতই বিকাশ লাভ করতে লাগল কেবলমাত্র জৈব-আকাঙ্খার পরিতৃপ্তির মধ্যে তখন আর সে সীমাবদ্ধ থাকলো না। জীবনের বিশেষ এক ধরনের আকাঙ্খার পরিতৃপ্তির পথ সে অন্বেষণ করতে আরম্ভ করলো। দৈহিক মঙ্গলের ধারণা মানুষ ক্রমে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করলো, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় সুখে মানুষ তৃপ্ত হতে পারে না। পাকস্থলী ও আত্মা দু'টি পৃথক জিনিস।'[৪৭]

তাছাড়া ধর্ম প্রথম থেকেই আত্মিক প্রকৃতির। একটি অদৃশ্য শক্তি অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'য়ালার দ্বারা মানুষ সর্বদা নিয়ন্ত্রিত-এ বিশ্বাস থেকেই ধর্মের সূচনা হয়েছিল। সেই অস্পষ্ট অনুভূত অদৃশ্য শক্তি মহান আল্লাহর ধারণা, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক ধারণায় ক্রমশ রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর আদিকাল থেকে ধর্ম মানুষ ও মানব সমাজের একান্ত সহযাত্রী হিসেবে বিবেচিত

---

46 Thouless, R. H: Introduction to the Psychology of Religion, Cambridge University, London, 1923, p. 63.

47 lbid, p. 108

হয়ে আসছে। পৃথিবীর সূচনাকাল থেকে অদ্যাবধি অধিকাংশ মানুষ ধর্মের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। অতএব মানব সমাজে ধর্ম একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে।

মনীষী ফেজারের মতে ধর্ম বলতে বুঝায়, 'মানুষের চেয়ে এক উচ্চতর শক্তির সন্তুষ্টি বিধান, যে শক্তি মানব জীবন ও প্রকৃতির ধারাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। তাঁর মতে ধর্মের উপাদান দুইটি। একটি মানুষের চেয়ে উচ্চতর শক্তিতে বিশ্বাস। আর অপরটি সেই উচ্চতর পরম শক্তির আরাধনা করা।'[৪৮]

ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এমিল দূরখাইমও ধর্মের অনুরূপ দুইটি উপাদানের কথা বলেছেন, 'একটি হলো বিশ্বাস আর অপরটি হলো আচার।'[৪৯] ধর্ম বলতে আমরা বুঝি এমন একটি ব্যবস্থাকে যে ব্যবস্থা মানুষের সে সব চরম সমস্যা মোকাবেলা করতে চেষ্টা করে যে সব সমস্যা আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দিয়ে সমাধান করা সম্ভব নয়।

মানব সমাজের যাত্রালগ্ন থেকে আমরা দেখি ধর্ম ও সমাজের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আদিম মানুষের ক্ষেত্রে ধর্ম বিশ্বাসের চেয়ে আবার পদ্ধতি ছিল প্রধান। এই আচার পদ্ধতি বলতে বুঝায় পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের কর্ম সম্পাদনের রীতিনীতি। এই প্রার্থনা ও অর্চনার পদ্ধতি এক সময় উপাসনার বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে এবং পবিত্র সঙ্গীত, কীর্তন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে নৃত্য নিবেদন, বলিদান ও নৈবেদ্য সামাজিক রীতিনীতি তথা এক ধরনের ধর্মে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। যা কিছু মানুষের কাছে বিস্ময়রূপে দেখা দেয় এবং কোনো অস্তিত্বের কোনো ব্যাখ্যা দিতে সে যখন অক্ষম বা অপারগ হয় তখন সে বস্তু যা তার কাছে আপাত রহস্যাবৃত মনে হয় তার ওপর অলৌকিকত্বের গুণারোপ করে মূর্তি বা বিগ্রহের জন্ম দেয়। এভাবে উদ্ভব ঘটে দেবদেবীর উপাসনা এবং নিষ্প্রাণ অক্ষম এ জড় মূর্তি বা বিগ্রহের কাছে মানুষ তার সকল কামনা, বাসনা বা আকাংখা ব্যক্ত করে প্রার্থনা বা অর্চনায় রত হয়। গোত্রভিত্তিক সমাজ হওয়ায় আদিম মানুষ তাদের প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানই সমবেতভাবে করত।

মানবজাতির দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, স্থান, কাল ও সমাজভেদে বিভিন্ন ধর্ম মানবসমাজের আদর্শিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে এবং ধর্মকে কেন্দ্র করেই বহু সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। চীন, মিশর, পারস্য, ব্যাবিলন,

---

৪৮ আবুল কাসেম, ধর্ম, সমাজ ও বিজ্ঞান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ-১৯।

৪৯ আবুল কাসেম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

ভারত, রোম ও গ্রীসের মতো প্রাচীন সভ্যতাগুলো প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। এসব সভ্যতা মানবজাতিকে জ্ঞান, সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে এ কথা সত্য যে, বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তি ও সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত স্বার্থে ধর্মকে অপব্যবহার করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মের সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান না করে গোঁড়ামির আশ্রয় নিয়েছে এবং সংকীর্ণ স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করেছে। এর ফলে ধর্মের প্রকৃত গতিশীলতা ব্যাহত হয়েছে এবং মানবসমাজে নানা অকল্যাণের সৃষ্টি হয়েছে। তথাপি সভ্যতার বিকাশ ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ধর্মের অবদান অনস্বীকার্য। যদিও কেউ কেউ মনে করেন ধর্মই সকল দ্বন্দ্ব ও অশান্তির মূল, কারণ ইতিহাসে ধর্মকে কেন্দ্র করে বহু সংঘাত ও যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, যার মধ্যে ক্রুসেড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে বিষয়টি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংঘাতের প্রকৃত কারণ ছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক স্বার্থ; ধর্মকে কেবল সেই স্বার্থ বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

পৃথিবীর বুকে সংগঠিত যুদ্ধ বিগ্রহের কত ভাগ ধর্মকে কেন্দ্র করে আর কত ভাগ ক্ষমতার ভাগাভাগি অথবা অন্য কিছু নিয়ে তা একটু হিসাব করলেই বেরিয়ে আসবে। যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে হিন্দু রাজায় রাজায়, মোঘলে, পাঠানে, বর্গী ও পর্তুগীজে, ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক কালে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, জাহাঙ্গীর শাহজাহানে পিতা পুত্রের, আওরঙ্গজেব ও ভাইয়ের যুদ্ধ এর কোনোটি ধর্মকে নিয়ে নয় বরং ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়েছিল। অতীতকালে সংগঠিত যুদ্ধবিগ্রহের প্রায় ৯৫ ভাগ ঘটেছে রাজ্য ও রাজক্ষমতা লিপ্সার কারণে। এমনকি পৃথিবীর ইতিহাসে কালো অধ্যায় হিসেবে খ্যাত দুইটি বিশ্বযুদ্ধের কোনোটিই ধর্মকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়নি। ইহুদি নিধনের পেছনে ধর্ম নয় অর্থনৈতিক কারণই ছিল প্রধান। আজকে দেশে দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক এককভাবে চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ যেমন ইরান, ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া প্রভৃতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক হামলা এর কোনোটিই ধর্মকে কেন্দ্র করে নয় বরং ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে। তবে হাঁ ধর্মকে এর সাথে যদি সংশ্লিষ্ট করতে হয় তবে তা হবে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে নিজেদের ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করা। একথা অনস্বীকার্য যে, সমাজের সাথে ধর্মের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। সমাজের সাথে সংস্কৃতির এবং এর সঙ্গে তার ধারক মানবগোষ্ঠির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ফলে ধর্মের সঙ্গে শুধু যে সমাজের যোগসূত্র তাই নয় ধর্মের সাথে সমাজের প্রতিটি

ব্যক্তির ও সংস্কৃতির নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। সমাজের আর্থিক ব্যবস্থা ও তাঁর শ্রেণি বিভাজন, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, সমাজে রাজনৈতিক সমস্যা ও সংগঠন, জ্ঞাতি সম্পর্ক এমনকি পরিবার ও বিবাহ প্রথা, নন্দনতত্ত্ব এবং সামাজিক সৌন্দর্যবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানকে ধর্ম বিশ্বাস ধর্মাচার অনিবার্যভাবে প্রভাবিত করে। ধর্ম সমাজের সংহতির সহায়ক, ধর্মীয় বিশ্বাস আচার পদ্ধতি, ধর্মীয় প্রতীক ও ধর্মীয় তীর্থস্থান সমূহের মাধ্যমে ধর্ম সমাজকে সংহত করে এবং মানুষকে একটি অতিন্দ্রীয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে।

দৈনন্দিন কর্মমুখর জীবনে মানুষ নিজ নিজ ব্যক্তিগত এবং শ্রেণিগত স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত থাকে। তার অর্থ হলো সমাজের সাধারণ মানুষের সমষ্টিগত স্বার্থের বিষয়টি তখন অনেকটা অবহেলিত বা উপেক্ষিতই থাকে। সমাজের ওপর ধর্মের প্রভাব সুদূরপ্রসারী ও অনস্বীকার্য।

ধর্মীয় আনন্দ উৎসব ও আচার পদ্ধতি সমাজে মানুষের যৌথ জীবনকে মহিমান্বিত ও সমমর্মী করে তোলে। সমাজের সংহতি বিধানে ধর্মের ভূমিকা অনস্বীকার্য ও অপরিহার্য। কেননা মানুষ পরস্পরের সঙ্গে নিরন্তর আদান প্রদান লেনদেন সম্ভাব ও সংঘাতে লিপ্ত থাকে। মানুষ আত্ম-সচেতন, স্বার্থপর এবং আত্মোন্নতিতে সবসময়ে সচেষ্ট থাকে। নিজের স্বার্থোদ্ধার তার প্রধানতম লক্ষ্য, এই লক্ষ্য অর্জনে সে নিজের পছন্দসই মূল্যবোধ গড়ে তোলে। আর অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ব্যক্তি নিজ স্বার্থে অন্যের স্বার্থের শুধু পরিপন্থীই হয়েই দাঁড়ায় না সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষের বিনাশ সাধনে উদ্যোগী হয়। এতে কেউ চরম বিকৃতির তৃপ্তি লাভ করে আবার অনেকে সাফল্য অর্জন করলেও গৌরববোধ করা থেকে বঞ্চিত থাকে। অন্যকে দুঃখ দিয়ে কেউবা নিজের সুখ নিশ্চিত করে। আবার অন্যের উন্নতির পথে কেউবা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আত্মোন্নয়নের চরম শিখরে উঠতে চেষ্টা করে। এ থেকে জন্ম নেয় পরশ্রীকাতরতা যা থেকে হিংসা, বিদ্বেষ, অসূয়া, পৈশূন্য ও সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠে। আমরা মানুষের মাঝে পরস্পর বিরোধী দু'টি প্রবণতা লক্ষ্য করি। একটি হলো সমাজের হিত কামনা, অন্যটি হলো ব্যক্তির স্বার্থ। পরস্পর বিরোধী এ দু'টি সত্তার মাঝে এমন একটি মূল্যবোধ দরকার যা দিয়ে মানুষের পাশবিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তার ব্যক্তি স্বার্থ সমাজের সমষ্টিগত স্বার্থের যাতে ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য তার ওপর এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সামাজিকায়নের মাধ্যমে সঞ্চালিত মূল্যবোধ ছাড়া আর কোথায়ও পাওয়া যায়না। বলাই বাহুল্য সকল মূল্যবোধ মানুষের সংস্কৃতি ও পরিশীলিত জীবন ধর্ম নির্ভর। ধর্মই সমাজের মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত রাখে। ধর্মীয় আচার পদ্ধতির প্রকাশ্য অনুষ্ঠান ও অনুশীলন এবং

যৌথভাবে সামাজিক অনুশাসন প্রতিপালনের মধ্যদিয়ে ধর্ম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখে। পুরুষানুক্রমে ধর্মই সমাজের একাত্মবোধকে সচল রাখে। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নানা সন্ধিক্ষণে ধর্ম সকলকে বিশ্বাসের একতা দিয়ে বিপদাপন্ন ব্যক্তি ও ভঙ্গুর সমাজকে রক্ষা করে। ব্যক্তির পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টার সামনে ধর্ম পারত্রিক মুক্তি লাভের সম্ভবনা তুলে ধরে। ফলে, ব্যক্তির নিজ স্বার্থের সাথে পারত্রিক মোহের একটা আপোষের সৃষ্টি হয় যার ফলে স্বার্থসিদ্ধির তীব্রতা হ্রাস পায়। স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টাকে হ্রাস করে আশাহতের বেদনাকে লাঘব করে ধর্ম সমাজকে সংহত করে।

ধর্ম ও সংহতি

পরম সত্তা মহান আল্লাহ তা'য়ালার উপলব্ধি এবং তাঁর সাথে এক ও অভিন্ন হবার মানুষের আগ্রহ ও প্রচেষ্টাকে বলা হয় ধর্ম। ধর্ম এ অর্থে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করে। ধর্মবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ পূর্ণ ও পরম সত্তাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। ধর্ম যেমন একদিকে মানুষের আত্মিক শক্তিকে জাগ্রত ও উন্নত করে, তেমনি অপর দিকে সমাজকেও ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করে। ধর্মবন্ধনে মানুষ যেমন আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত হয়, তেমনি আবার পূর্ণ সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরস্পর ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়। ধর্ম হলো আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের অধীনে মানুষের ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি। প্রকৃত ধর্ম শুধু মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে যায় না, তার সামাজিক জীবনকেও উন্নত ও মহৎ করে তোলে। ধর্ম মানুষকে উদারতা, নিঃস্বার্থপরতা, দয়া, প্রীতি, ক্ষমা প্রভৃতি সদ গুণ শিক্ষা দেয়। যার মধ্যে প্রকৃত ধর্মবোধ জাগ্রত হয়েছে সে প্রতিবেশীকে ভালবাসে, তার সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং সমগ্র মানব সমাজের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান, আচার ও রীতি-নীতির মাধ্যমে জনসাধারণ ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তাদের সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও সুসংহত হয়।[৫০]

আল্লাহর সাথে মানুষের যোগাযোগের সম্পর্ক স্থাপন করা ধর্মের মূল লক্ষ্য বটে, কিন্তু একই সঙ্গে ধর্ম মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে সামাজিক মেলামেশার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে। ধর্মপরায়ণতা ব্যক্তির অসৎ প্রবৃত্তি গুলিকে দমন করে নিজের বাহ্যিক আচরণকে মার্জিত ও সংহত করে। এভাবে ধর্ম মানুষকে মার্জিত ও সংহত করে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে

[৫০] রমেশচন্দ্র মুন্সী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯।

প্রভূত সহায়তা করে থাকে। মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ তথা মানবতাবোধ জাগ্রত করার ব্যাপারে ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাপারে এবং সমাজের সংহতি স্থাপনের কাজে ধর্মের অবদান যথেষ্ট। ধর্ম যেমন একদিকে সমাজের ও রাষ্ট্রের ঐক্য ও কল্যাণ সাধনে এবং মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানে যথেষ্ট সহায়তা করে, তেমনিই আবার অন্যদিকে সমাজের প্রভূত অকল্যাণ করে এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে রাখে। ধর্মযাজক, ধর্মবেত্তা ও পুরোহিতরা জনসাধারণের অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের সুবিধা মত ধর্মীয় অনুশাসনের ব্যাখ্যা দেয় এবং সমগ্র জনসম্প্রদায় অন্ধ বিশ্বাসে সেই ব্যাখ্যাগুলি মানিয়ে নেয় এবং তদনুযায়ী নিষ্ক্রিয় যন্ত্রের মত পরিচালিত হয়। ফলে তাঁরা স্বাধীন বিচার বুদ্ধির ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, সম্যক ধারণা গঠন করতে পারে না, কতগুলি অহিতকর কুসংসকারে আচ্ছন্ন থেকে অদৃষ্টবাদী ও রক্ষণশীল হয়ে পড়ে এবং সংকীর্ণ বাঁধা ধরা আচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে সামাজিক প্রগতি সম্বন্ধে উদাসীন মনোভাব পোষণ করে। এজন্য সমাজ সংস্কারকদের পক্ষে সামাজিক কুসংস্কার ও দুর্নীতি দূর করা কঠিন হয়ে পড়ে, এমনকি বিজ্ঞানীদের ধর্ম প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট থেকে নানা বাধা পেতে হয়, ফলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অগ্রগতি ব্যাহত হয়। এভাবে ধর্ম সামাজিক প্রগতির পথ রুদ্ধ করে। প্রাচীনকাল থেকে দেখা যায় যে, মানুষ ধর্মের প্রভাবে চালিত হওয়ায় সমাজে, জাতি ও বর্ণভেদ প্রথার প্রবর্তন হয়েছে এবং সমাজে ঐক্য ও সংহতির পরিবর্তে নানা বিরোধ ও সংঘর্ষ দেয়া দিয়েছে। তাই অনেকে মনে করেন যে, ধর্ম মোটেই সমাজ ও রাষ্ট্রের সংহতিশক্তি নয় বরং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলার কারণ। ধর্মের প্রভাবে মানুষ সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়িক মনোভাব গঠন করে এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব গড়ে উঠে। ইতিহাসে ধর্মে ধর্মে সংঘাত ও ধর্মযুদ্ধের অনেক নজির পাওয়া যায়। কাজেই ধর্মই মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে অনৈক্য ও ভেদাভেদ সৃষ্টি করা এবং সামাজিক, রাষ্ট্রীয় আন্তর্জাতিক ঐক্যের পথ রুদ্ধ করছে। এ প্রসঙ্গে মার্কসবাদীদের মত উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মতে, 'ধর্ম মানুষের আফিম।'[৫১]

ধর্মের মাদকতায় আচ্ছন্ন মানুষ নিজের অধিকার ও সুখ-সুবিধার সম্বন্ধে উদাসীন হয় এবং অলীক ও অপার্থিব বস্তুর মুখোমুখি হয়ে পড়ে। মিথ্যা স্বর্গসুখের আশায় ধর্মভীরু জনসাধারণ পুঁজিপতিদের শোষণ নীরবে সহ্য করে যায় এবং জীবনের

---

[৫১] রমেশচন্দ্র মুন্সী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

অশেষ দুর্গতি ভোগ করে। ধর্ম এভাবে মানুষকে একত্রিত না করে বরং দুর্বল ও পঙ্গু করে দেয়। তাই মার্কসবাদীদের মতে, সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে যখন সাম্যের ভিত্তিতে শ্রেণিহীন শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে, তখন জনগণ আর ধর্মের মোহে আচ্ছন্ন থাকবে না। ধর্ম সম্বন্ধে মার্কসবাদীদের এরূপ ব্যাখ্যা সমর্থনযোগ্য নহে।[৫২] কারণ মার্কসবাদ ধর্মের মূলতত্ত্বগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত না করে তার বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি লক্ষ্য করে ধর্মের অলীকত্ব উপলব্ধি করেছেন। মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তাকে উপলব্ধির নিমিত্তে ধর্মের প্রয়োজন থাকবে। কাজেই ধর্ম অলীক নয়, সত্য ও সুন্দর চিরন্তনের সাধনা। মানুষ যখন ধর্মচ্যুত হয় তখনই সে স্বার্থান্ধ ও শোষণকারী হয়। মানুষের মনে ধর্মবোধ জাগ্রত হলে সে সমস্ত বিরোধের উর্ধ্বে উঠে সবার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। ধর্মের মূলনীতি মানুষ যত বেশী অনুভব করবে তত বেশী তাদের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত হবে। রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাধ্যম হলো ধর্মের মূল তত্ত্বগুলির অনুধাবন। ডঃ রাধাকৃষ্ণা যথার্থই বলেছেন, 'যখন আমরা বদ্ধমূল সংস্কার ও সংজ্ঞা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করি, তখন আমরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। কিন্তু আমরা যখন প্রার্থনা ও ধ্যানকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় জীবনের আশ্রয় গ্রহণ করি, তখন আমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। কাজেই সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্ত র্জাতিক সংহতি স্থাপনে ধর্মের অবদান যথেষ্ট।

ধর্ম একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শক্তি। এটি কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সমষ্টি নয়। ধর্ম জনমতের উৎসও বটে। সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রেও ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মানুষের ধর্ম বিশ্বাস তার রাজনৈতিক চেতনাকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করে। ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্কের ক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয় ধারণার সঙ্গে মুসলিম ও ইহুদি ধর্মের ধারণার যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সম্রাট কনষ্টানটাইন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে খৃষ্ট ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত খ্রীষ্ট জগতে ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা ছিল। কিন্তু প্রথম থেকে ইহুদি ধর্ম ও ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতিকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবেই গণ্য করা হতো এবং রাজনীতি ধর্মীয় ব্যাখ্যাকে লংঘন করার সাহস রাখত না।

এশিয়ার অনেক দেশে আধুনিক জাতীয়তাবাদের প্রেরণা সৃষ্টি ও জাতিরাষ্ট্রের যৌক্তিকতা প্রদর্শনে ধর্ম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের জীবনেও ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এখানকার বৈসাদৃশ্য পূর্ণ সমাজে সংহতি আনয়ন করার জন্য ইহজাগতিকতা (ধর্মনিরপেক্ষ) মনস্ক

[৫২] সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণা, ধর্ম-প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-১৩৭৪, পৃ. ৪১।

রাজনৈতিকরাও ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এখানকার সংস্কৃতিতে ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত শক্তিশালী এবং যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে এর প্রভাব সমাজমনস্ক যে কোনো ব্যক্তি লক্ষ্য করবেন। এছাড়াও এখানকার জনগণের প্রাথমিক মূল্যবোধ গঠনেও সামাজিক রীতিনীতি, রেওয়াজকে প্রাতিষ্ঠানিকতা দানে ধর্ম মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এসব দেশসমূহের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে ধর্মের ঘনিষ্ট সম্পর্কের কারণে নেতৃত্বের বৈধতা অর্জনের ক্ষেত্রেও ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আমাদের এদেশেও সিপাহী বিদ্রোহ, ওহাবী আন্দোলন, ফরায়েজী আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলনসহ প্রত্যেকটিতে ধর্ম একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে তিতুমীর, হাজী শরিয়ত উল্লাহসহ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগের পেছনে ধর্ম যে এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছে তা ইতিহাস গবেষকগণ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন। এমনকি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান ধর্ম বিষয়ে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রে বহু কথিকা পাঠ করেছেন এবং কোরআন ও হাদিসের আলোকে মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতার ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন।

সভ্যতার বিনির্মাণ, স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা যোগান, সামাজিক সংহতি ও ঐক্য সৃষ্টিতে ধর্মের অনন্য ভূমিকা থাকলেও বিভিন্ন যুগে যে ধর্মের অপব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার হয়নি তা নয়। আজকের ন্যায় বিভিন্ন সময়ে ধর্মকে ব্যক্তি ও গোষ্ঠি স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ গণমানুষের ধর্ম হলো ইসলাম। সুতরাং এদেশেও বিভিন্ন সময়ে ইসলামের অপব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। পূর্ব পরিকল্পিত বিদ্বেষপূর্ণ ও স্বার্থবাদী মনোভাব থেকে গণমাধ্যমে অপব্যবহার ও অসদ্ব্যবহারের কথা ঢালাওভাবে বলা হলেও সত্যিকার অর্থে কারা কীভাবে এবং কেন এর সাথে জড়িত তার প্রকৃত চিত্র সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে উদঘাটিত বা উন্মোচিত হয়নি। আমাদের গবেষণাকর্মে আমরা নির্মোহভাবে ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ যেমন তুলে ধরবো তেমনি সাম্প্রতিককালে ইসলামের নামে যারা ধর্মের অপব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার করছে তাদের প্রকৃত চরিত্রও তুলে ধরবো। ইসলামের অমর্যাদা করে এক শ্রেণির লোক ইসলামের নামে স্বীয় স্বার্থে ধর্মের অপব্যবহার অসদ্ব্যবহার করে নানা ধরনের ফতোয়াবাজী করে আসছে। এর ফলে অনেকের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। এই তথাকথিত ফতোয়াবাজী মূলত রাজনৈতিক ব্যক্তিস্বার্থে প্রণোদিত। আমরা এর

চালচিত্র ও স্বরূপ উদঘাটন করে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হবো যে, এ ধরনের ফাতওয়াবাজীর সাথে ইসলামের কোনো দূরতম সংশ্রব নেই।

স্বভাবধর্ম

কথাটির তাৎপর্য আমরা দু'ভাগে ও দু'দিক থেকে অনুধাবন করতে পারি। প্রথমত ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা অভিনব কোনো আকস্মিকভাবে আরোপিত জীবন ব্যবস্থা নয়। এটি মানুষের স্বভাবের মধ্যেই বিরাজমান। মানুষের স্বভাবগত প্রেরণা ও প্রবণতার সঙ্গেই পুরোপুরি সংলগ্ন। অর্থাৎ মানুষের নিজস্ব স্বভাব ও প্রকৃতিসম্মত যে আশা, অভিপ্রায় ও চাহিদা, বিবেক, হৃদয় ও মস্তিষ্কের যে আর্তি ও আকুতি তার সঙ্গে ইসলামের কোনো বিরোধ নেই। এ জন্যই ইসলাম মানুষকে তার কর্মে ও চিন্তায় শয়তানের অনুগামী হতে সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দেয় সত্য, কিন্তু সেই প্রতিরোধব্যূহ রচনা করা হয় ফেরেস্তা বানানোর জন্য নয়, বরং মানুষকে তার অন্তর্গত শক্তি ও প্রবণতার সম্যক বিকাশ ও তার লালনের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে। দ্বিতীয়ত ইসলাম সর্বকালের সকল মানুষের জীবন চলার পথে এক নির্ভুল পথনির্দেশনা, যা আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক বিধানের মতই শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়।

ইসলাম

ইসলাম[৫৩] আল্লাহ তা'য়ালার মনোনীত একমাত্র দ্বীন-একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।[৫৪] প্রত্যেক বস্তুর মূলমন্ত্র বা তত্ত্ব তাই হতে পারে যা সে বস্তুর নামে বর্তমান থাকে। দীনে ইলাহী বা আল্লাহ তা'য়ালার ধর্মের মূলতত্ত্ব নিহিত রয়েছে ইসলাম শব্দটিতে। ইসলাম শব্দটি আদেশ পালন, পরিপূর্ণ অনুসরণ এবং কোনো

---

[৫৩] শব্দটি সিলমন ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। সিলমন এবং সালামুনের অর্থ হলো কোনো বস্তু কোনো লোককে দেয়া। আর এ ধাতু থেকে সৃষ্টি হয়েছে সাল্লামা অর্থাৎ সঁপে দিয়েছে। আসলামাহ অর্থাৎ আদেশ পালন করেছে। বাস্তবিক পক্ষে ইসলামুন শব্দটিও এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আরবি ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা, আত্মসমর্পন করা, শান্তির পথে চলা ও মুসলমান হওয়া। শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহর অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা ও তার নিকট আত্মসমর্পন করা। বিনা দ্বিধায় তার আদেশ নিষেধ মেনে চলা এবং তার দেয়া বিধান অনুসারে জীবন যাপন করা। আর যিনি ইসলামের বিধান অনুসারে জীবন যাপন করেন তিনি হলেন মুসলিম বা মুসলমান।

[৫৪] ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, তৃতীয় সংস্করণ, লেখক মণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৩৩।

বস্তুকে সম্পূর্ণভাবে সোপর্দ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৫৫] অতএব ইসলামে মানব জাতির জন্য আল্লাহ তা'য়ালার প্রেরিত এ জীবন ব্যবস্থার সকল বিধি-বিধান কুরআন-সুন্নাহর মতাদর্শের ওপর নির্ভরশীল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নবুওয়াতী জীবনের দীর্ঘ ২৩ বছরে এ বিধানকে আল্লাহর পক্ষ হতে ধারণ করেছেন এবং বাস্তব জীবনে তা করে দেখিয়েছেন অনাগতকালের মানব জাতির জীবন কীভাবে ইসলামকে মেনে চলবে। এর মাধ্যমেই তিনি প্রমাণ করেছেন ইসলামের একটি বিধানও এমন নেই, যা মানুষের জীবনে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। মানুষের ওপর আল্লাহর কি অধিকার, তাঁর প্রতি মানুষের কি কর্তব্য এবং মানুষের প্রতি মানুষের কি দায়িত্ব রয়েছে, সে সম্পর্কে ইসলাম এক সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে।[৫৬] এখানে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনকে সর্বাংশে সুন্দর করে ও পরম সৌভাগ্যপূর্ণ করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইসলাম এসেছে।"[৫৭]

ইসলাম জ্ঞান ও বিবেকের সাথে সঙ্গতি রেখে পৃথিবীর সকল ধর্মের ওপর শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণ করেছে, সমন্বয় সাধন করেছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে। এতে রয়েছে মানব জীবনের পূর্ণবিকাশ, সহজ স্বচ্ছন্দ গতি ও পরিণতির দিক নির্দেশনা- যা সর্বমানবিক সুবিচার ও শান্তির গ্যারান্টি। রাসূলুল্লাহ (সা) ইসলামের মাধ্যমে কেবল এ আদর্শের সন্ধানই দেননি; তাঁর জীবনে সে আদর্শ রূপায়িত করেছেন, যা আমরা একটু আগেই উল্লেখ করেছি। এখানেই ইসলামের ও তার বার্তাবাহকের স্বাতন্ত্র্য। এ দ্বারাই ইসলামের বাস্তবানুগ হওয়ার প্রমাণ মেলে। অবশ্য এর বাইরে প্রতিটি ক্ষেত্রে আজও তা প্রমাণিত। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হলো রাসূলুল্লাহ (সা) এর জীবনাদর্শের ভিত্তিতে আল্লাহর কাছে নিঃশর্ত, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।[৫৮] ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দীন।[৫৯] এ জীবন ব্যবস্থার বাইরে আর কোনো কিছুই মানবজাতি ও সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। তাই কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।[৬০] এ বিষয়ে হাদিসে এসেছে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা)

---

[৫৫] মনিরুজ্জামান শাহ: মানব জীবনে ইসলাম, প্রথম খণ্ড, শায়খুল হিন্দ একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮।

[৫৬] বদরুদ্দৌজা, সৈয়দ: হযরত মুহাম্মদ (সা) তার শিক্ষা ও অবদান, দ্বিতীয় খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭, পৃ. ১।

[৫৭] আওদা, আব্দুল কাদের: দীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য, অনু: মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ঢাকা আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৮, পৃ. ৩।

[৫৮] আল কুরআন, সুরা আল আনআম, আয়াত-১৬২।

[৫৯] আল কুরআন সুরা আল ইমরান, আয়াত-১৯।

[৬০] আল কুরআন সুরা আল ইমরান, আয়াত-৮৫।

আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা পালন এবং যাতায়াতের সামর্থ্য থাকলে বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্জ আদায় করা।[৬১] পারিভাষিক অর্থে ইসলাম শব্দের অর্থ নিরাপত্তা ও শান্তি। নিরাপত্তা এ কারণেই বলা হয়েছে, কেননা ইসলাম শব্দটি মূল ধাতু সিল্ম, সিলাম এবং সালিম শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ দাঁড়ায় কঠিন প্রস্তর। কারণ উহাতে কোমলতা নাই, নরম হওয়া হতে মুক্ত। সালাম এর অর্থ বাবলা বৃক্ষের ন্যায় কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ; যে বৃক্ষ কণ্টক থাকায় বিপদ আপদ হতে মুক্ত থাকে।[৬২] বস্তুত ইসলাম সকল নবী রাসূলের অভিন্ন ধর্ম। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত আগমনকারী সকল নবী রাসূলগণই মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান করেছেন এবং এরই ভিত্তিতে নিজ নিজ উম্মতকে গড়ে তুলেছেন।[৬৩] ইসলাম ধর্মের মূল মর্ম হলো আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা, আর প্রত্যেক পয়গম্বরই যেহেতু নিজে আল্লাহর পূর্ণ অনুগত থাকার সাথে সাথে উম্মতকেও এর দিকে দাওয়াত দিয়েছেন, তাই সকল নবীর দ্বীনই ইসলাম।[৬৪] এ বিষয়ে আরো শক্ত উদাহরণ মিলে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটিতে, যেখানে বলা হয়েছে-

> ‘হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের উভয়কে মুসলিম তথা তোমার অনুগত বানাও এবং আমাদের বংশধর হতে এক উম্মাতে মুসলিমাহ অর্থাৎ তোমার এক অনুগত উম্মাত বানাও[৬৫]

হযরত ইবরাহীম (আ) তার সন্তানদের প্রতি ওসিয়ত স্বরূপ বলেছিলেন, যা কুরআনে নিম্নোক্তভাবে এসেছে ‘তোমরা মুসলমান না হওয়া অবস্থায় মৃত্যু বরণ করো না।[৬৬] মুসলমানদের নামকরণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এসেছে হযরত ইবরাহীম (আ) উম্মতী মুহাম্মদীয়াকে মুসলমান নামে অভিহিত করেছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে

> ‘এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত। তিনি পূর্বেই তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম এবং এই কিতাবে [৬৭]

---

[৬১] হামেদ আলী, সাইয়েদ: ইসলাম আপনার কাছে কি চায়, (অনু. আব্দুস সহীদ নাসিম), সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২৩।

[৬২] ইসলামী বিশ্ব কোষ, পঞ্চম খণ্ড, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ২৯৫।

[৬৩] দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩।

[৬৪] প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪।

[৬৫] আল কুরআন, সূরা আল বাকারাহ, আয়াত-১২৮।

[৬৬] আল কুরআন, সুরা আল বাকারাহ, আয়াত-১৩২।

[৬৭] আল কুরআন, সূরা হজ্জ, আয়াত-৭৮।

উপর্যুক্ত আয়াত তিনটিতে পরপর 'মুসলিম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব বুঝায় এবং সাথে সাথে এটিও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সকল নবী এবং রাসুলগণের প্রচারিত ধর্মের কোনো মৌলিক পার্থক্য ছিল না। তবে প্রত্যেকের শরীয়ত ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, 'আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীয়াত ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি।'[৬৮]

হযরত আদম (আ) থেকে নবী রাসূলদের যে সিলসিলা (পরম্পরা) শুরু হয় তার পরিসমাপ্তি ঘটে, হযরত মুহাম্মদ (সা) এর মাধ্যমে। তিনি সর্বশেষ নবী। তারপর আর কোনো নবী এ পৃথিবীতে আসবে না। তার আগমনে পূর্ববর্তী সমস্ত শরীয়াত রহিত হয়ে গেছে। তাই এখন ইসলাম বলতে হযরত মুহাম্মদ (সা)এর আনীত শরীয়তকে এবং মুসলিম বলতে উম্মাতী মুহাম্মদীয়াকে বুঝাবে।[৬৯] প্রকৃতপক্ষে হযরত মুহাম্মদ (সা) এর নির্দেশনা মোতাবেক নিজকে আল্লাহর নিকটে সঁপে দেয়া এবং পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করার নামই হলো ইসলাম। যে আত্মসমর্পন করে তাকে বলা হয় মুসলিম। ইসলাম গ্রহণ করার পর কোনো ব্যক্তি ইসলাম পরিপন্থি নিজস্ব খেয়াল খুশি এবং ধ্যান-ধারণা অনুসরণের কোনো সুযোগ থাকে না।[৭০] এ বিষয়ের সমর্থন পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে পাওয়া যায়-

> 'আল্লাহ ও তার রাসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলকে (সা) অমান্য করলে সেতো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে।[৭১]

এ সত্যটি কালপরিক্রমায় মানবজাতি সর্বাধিক প্রত্যক্ষ করেছে। তাই ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা, মৌলিকত্ব ও স্বাতন্ত্র আজ পরীক্ষিত ও কালোত্তীর্ণ। এর অন্যতম পরিচয় এটি মানুষের স্বভাব ধর্ম, আল্লাহ প্রদত্ত।

মানবকল্যাণে ইসলাম

ইসলামের বিধি-বিধান মানুষের কল্যাণ, সামাজিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার বিধান করে থাকে। একজন মুসলমানের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে দু'টি হক বা কর্তব্য রয়েছে। এর একটি আল্লাহর হক অন্যটি বান্দার হক। বান্দার হকসমূহের মূল

---

[৬৮] আল কুরআন, মায়েদা, আয়াত ৪৮।

[৬৯] দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৪-৩৫।

[৭০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

[৭১] আল কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত-৩৬ ।

কথা হলো, একজন মুসলমান প্রথমতঃ আল্লাহর বান্দা হিসেবে নিজেকে তৈরি করতে পারবে অন্যদিকে মানুষের অধিকার সংরক্ষণের কারণে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, মানুষ লাভ করবে কল্যাণ। মানব কল্যাণে ইসলামের বিধানসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) জীবনের নিরাপত্তা

মানব জীবন সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য, এটি অত্যন্ত পুত ও পবিত্র এবং নিতান্তই সম্মানের বস্তু। এ কারণে কোনো ব্যক্তির জানমাল ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতকে ইসলামে মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের গুরুত্ব এত বেশি যে, একটি জীবনের হত্যা বা সংহারকে সমগ্র মানব জাতির হত্যা বা সংহারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মানব জীবনের নিরাপত্তার বিষয়ে ইসলাম এতখানি গুরুত্ব দিয়েছে যে, পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্ম, মতবাদ ও বিধানে আর এরূপ নেই।[৭২] এ বিষয়ে পবিত্র কালামে পাকে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন-

> 'নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানব গোষ্ঠিকে হত্যা করল, আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে প্রাণে রক্ষা করল'।[৭৩]

পবিত্র কুরআনের আলোচ্য আয়াতের স্পষ্ট বক্তব্য হলো, কোনো অবস্থায় অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করা যাবে না। তবে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় আইনে কাউকে অভিযুক্ত করা হলে তাকে হত্যা করা বৈধ। ইসলামের মৌল উদ্দেশ্য হলো, মানব হত্যা বন্ধ করা। যাতে সমাজের শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। এক একটি হত্যা আরো বহু সংখ্যক হত্যাকে জন্ম দেয় এবং সমাজকে নিশ্চিত বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায়। তাই হত্যা অবশ্যই নিষিদ্ধ করতে হবে। পবিত্র কুরআনে অন্য আরেকটি আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

> 'আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থকারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না।' [৭৪]

---

[৭২]সালাহুদ্দীন, মুহাম্মদ: ইসলামে মানবাধিকার, অনুঃ মুহাম্মদ আবুত তাওয়াম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ২১৯।

[৭৩] আল-কুরআন, সুরা আল-মায়েদা, আয়াত-৩২।

[৭৪] আল কুরআন, সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত-৩৩।

ইসলামে হত্যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হলেও কেবলমাত্র ৬টি সঙ্গত কারণে হত্যার বিধান বৈধ রাখা হয়েছে। এ হত্যার কারণ সামাজিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা, এটি মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের নিমিত্তেই করা হয়েছে। সংগত কারণসমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার অপরাধীকে তার অপরাধের প্রতিশোধ স্বরূপ হত্যা করা। কুরআনের পরিভাষায় তাকে কিসাস বলা হয়, যার অর্থ রক্তমূল্যও বটে।

(খ) জিহাদের ময়দানে সত্য দ্বীনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের হত্যা করা।

(গ) ইসলামের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পতনের চেষ্টায় লিপ্তদের অপরাধের শাস্তিস্বরূপ হত্যা করা।

(ঘ)বিবাহিত নারী-পুরুষকে ব্যভিচারের অপরাধে হত্যা করা।

(ঙ)ধর্ম ত্যাগের অপরাধে হত্যা করা।

(চ) ডাকাতি অর্থাৎ রাহাজানি ইত্যাদি অপরাধের শাস্তিস্বরূপ হত্যা করা।[৭৫]

মহান আল্লাহ হত্যাকে এমন গুরুতর ও জঘন্য অপরাধ সাব্যস্ত করেছেন যে, এই অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ইহকালে কেসাসের শাস্তি ভোগ করা সত্ত্বেও পরকালে জাহান্নামী হবে। অধিকন্তু সে মহান আল্লাহর গজব ও চরম অভিসম্পাতে নিপতিত হবে।'[৭৬] হত্যার চেয়ে বড় আর কোনো অপরাধ নেই যা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। মানুষের জীবনের নিরাপত্তা সম্পর্কে কুরআনে আরো বলা হয়েছে

'এবং কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম, যেখানে সেস্থায়ী হবে এবং তার প্রতি আল্লাহর গজব এবং তিনি তার প্রতি মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।'[৭৭]

পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে হত্যার চূড়ান্ত শাস্তি ও এর পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে। এর চূড়ান্ত পরিণতি জাহান্নাম হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেছেন,

'দারিদ্রের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমি তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করি এবং বিশেষত তাদেরও।[৭৮]

---

[৭৫] ইসলামে মানবাধিকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৯-২২০।

[৭৬] প্রাগুক্ত, পৃ ২২০।

[৭৭] আল কুরআন, সূরা আনসি, আয়াত-৯৩

অন্যকে হত্যা করা যেমন নিষিদ্ধ ঠিক তেমনিভাবে আত্মহত্যা করাও নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন-

'তোমরা আত্মহত্যা করো না।' [৭৯]

আত্মহত্যা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, মহান আল্লাহ মু'মিনদের জানমাল বেহেস্তের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন।'[৮০] অতএব আল্লাহর দেয়া জানমালের অপব্যবহার করা যাবে না। যেহেতু জীবনের মালিক আল্লাহ অতএব আল্লাহর মালিকানাধীন বিষয় নিয়ে খেল তামাশার অধিকার বান্দার নেই।

মহান আল্লাহর নিকট মানুষের জীবনের মূল্য অত্যন্ত বেশি হওয়ার কারণে আল্লাহ কোনো মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আল্লাহর নিকট মানুষের মর্যাদা এত বেশি যে, আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন মু'মিনদেরকে লক্ষ্য করে স্পষ্টভাবে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বলেছেন–

'কোনো মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যাকরা কোনো ঈমানদার ব্যক্তির কাজ হতে পারে না'[৮১]

পবিত্র কুরআনের এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের জীবনের মূল্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। হত্যার মত জঘন্য অপরাধের জন্য ভয়াবহ শাস্তির কথা উল্লেখ করে পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে-

'যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।[৮২]

এখানে জিজ্ঞাসা করা হবে মানে প্রথমত ক্রোধ প্রকাশ করার কথা বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত কঠোর ও কঠিন শাস্তিদানের বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝানো হয়েছে। এ থেকেও বিষয়টি পরিস্কার, হত্যা কত জঘন্য অপরাধ এবং মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রকে কঠিন ও কঠোর ভাষায় হুশিয়ার করে দেয়া হয়েছে এবং এ দায়িত্ব অবহেলার কারণে শক্তভাবে জবাবদিহির কথা বলা হয়েছে। কোনোভাবেই এ বিষয়টিকে হালকাভাবে দেখার সুযোগ রাখা হয়নি। জীবনের মর্যাদা সম্পর্কে কুরআনের এসব সুস্পষ্ট বিধান তুলে ধরার পর এ বার নবী করীম (সা.) এর হাদিসসমূহ ও মানব জাতির ইতিহাসের সোনালি যুগের

---

[৭৮] আল কুরআন, আন আনাম, আয়াত ১৫১।

[৭৯] সূরা আননিসা, আয়াত ২৯।

[৮০] সূরা আত তাওবা, আয়াত ১৩৮।

[৮১] সূরা আননিসা, আয়াত-৯২।

[৮২] সূরা আত তাকভীর, আয়াত, ৮-৯।

কতিপয় দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করার চেষ্টা করা হবে। বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন,

> 'হে লোক সকল! তোমাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর ওপর হস্তক্ষেপ তোমাদের ওপর হারাম করা হলো। তোমাদের আজকের এই দিন, এই (জিলহজ্জ) মাস এবং এই শহর (মক্কা নগরী) যেমন পবিত্র ও সম্মানিত, অনুরূপভাবে উপর্যুক্ত জিনিসগুলোও সম্মানিত ও পবিত্র। সাবধান! আমার পরে তোমরা পরস্পরের হন্তা হয়ে কাফেরদের দলভূক্ত হয়ে যেও না।'[৮৩]

বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (সা) জিলহজ্জ মাস ও পবিত্র মক্কা নগরীর শপথের মাধ্যমে মানুষের জান এবং মালের হেফাজতকে নিশ্চিত করতে চেয়েছেন। মক্কা নগরীর কছম খাওয়া থেকে বুঝা যায় হুজুর (সা) বিষয়টিকে কি পরিমাণ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। এ বিষয়ে মহানবী (সা) আরো বলেন–

> জাহেলোী যুগের যাবতীয় হত্যা রহিত হলো। প্রথম যে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ আমি রহিত করলাম তা হচ্ছে আমার বংশের রবীআ ইবনুল হারিস-এর দুগ্ধপোষ্য শিশু হত্যার প্রতিশোধ, যাকে হুযাইল গোত্রের লোকেরা হত্যা করেছিল। আজ আমি তা ক্ষমা করে দিলাম। [৮৪]

বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি হত্যার প্রতিশোধ রহিত করার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে যে কোনো ধরনের হত্যাকাণ্ডকে বন্ধ করার দীপ্ত ঘোষণা দেন এবং সাথে সাথে তিনি তাঁর নিজ বংশের রক্ত মূল্য রহিত করার মাধ্যমে তাঁর নিজ ঘোষণার বাস্তবায়ন করেন। মহানবী (সা) একবার বলেছিলেন:

> 'কোনো মুসলিম ব্যক্তির হত্যার তুলনায় সমগ্র পৃথিবীর পতন আল্লাহর দৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ ব্যাপার।[৮৫]

এ হাদিসটি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হত্যাকাণ্ড কত গুরুতর অপরাধ। যে অপরাধের পরিমাণ হচ্ছে এত বৃহৎ যে, এর তুলনায় সারা পৃথিবীর ধ্বংসকেও তুচ্ছ গণ্য করা হয়েছে। নবী করীম (সা) বলেন:

> 'যে ব্যক্তি কোনো যিম্মীকে হত্যা করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতহারাম করে দিবেন।'[৮৬]

পূর্ববর্তী হাদিসটিতে মুসলমানদের জীবন সম্পর্কে উল্লেখ করা হলেও আলোচ্য হাদিসটিতে যিম্মীদের বিষয়ে উল্লেখ করার মাধ্যমে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো

---

[৮৩] ইসলামে মানবাধিকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১।

[৮৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।

[৮৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২।

[৮৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২।

যে, আসল বিষয় হলো ইসলামে মুসলিম অথবা যিম্মী নয় বরং মানুষ এবং মানুষের জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন- 'যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কোনো অমুসলিমকে হত্যা করল সে কখনো জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।'[৮৭]

এ হাদিসটিতে অমুসলিমদের হত্যার কথা উল্লেখ করা হলেও এ দ্বারা মূলত মানুষের জীবনের মূল্য বুঝানোর সাথে সাথে এর সংহারের নিষিদ্ধতার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। একবার কোনো এক যুদ্ধে মুশরিকদের কতিপয় শিশু আক্রমণের পাল্লায় পড়ে নিহত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে বলেন,

> 'মুশরিক শিশুরাও তোমাদের চাইতে উত্তম। সাবধান! শিশুদের হত্যা কর না। প্রতিটি জীবন আল্লাহর নির্ধারিত ফিতরাত (সৎ স্বভাব) নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে।'[৮৮]

উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে যে বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় তা হলো, মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধান। কোনো অবস্থায় অন্যায়ভাবে অথবা শরীয়ত নিষিদ্ধ পন্থায় কাউকে হত্যা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কাফেরদের শিশু সন্তান হত্যা নিষিদ্ধ হওয়া থেকে আরো একটি বিষয় বুঝা যায় তা হলো মুসলমানদের দীনের এবং জীবনের ক্ষেত্রে যারা হুমকি নয় তাদেরকে হত্যা না করা অর্থাৎ শিশুরা কোনোভাবেই মুসলমানদের জন্য হুমকিস্বরূপ নয়। এ বিষয়ে হাদিসে আরো এসেছে

> 'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী যুগে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া গেল, কিন্তু হত্যাকারীর কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। মহানবী হয়রত মুহাম্মদ (সা) চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে ভাগণ দিতে গিয়ে বলেন। হে লোক সকল। ব্যাপার কি? আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকতে মানুষ নিহত হচ্ছে এবং তার হত্যাকারীর পরিচয় মিলছে না। একজন মানুষকে হত্যা করার জন্য আসমান জমীনের সমগ্র সৃষ্টিও যদি একত্র হয়ে যায় তবুও আল্লাহ এদের সকলকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না।[৮৯]

এমন কি যুদ্ধের ময়দানে একদিকে বিজয়ের এবং জীবন রক্ষার মত অতি গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি সামনে থাকার পরও যারা যুদ্ধে খুব বেশি ক্ষতিকারক নয় এমন ব্যক্তিদের হত্যা করতে মহানবী (সা) স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত হাদিসটিকেও উল্লেখ করা যায়।

---

[৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২।

[৮৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২।

[৮৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২।

কোনো এক যুদ্ধে একজন স্ত্রী লোক নিহত হয়। মহানবী (সা) তার লাশ দেখে বললেন: আহ! তোমরা এ কি কাজ করলে? সেতো যোদ্ধাদের মধ্যে শামিল ছিল না। যাও সেনাপতি খালিদকে বলে দাও যে, নারী শিশু ও দুর্বলদের হত্যা কর না। মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে যে জিনিসটি প্রমাণ করেছেন তা হলো, পারতপক্ষে যেনতেন অজুহাতে মানুষকে হত্যা না করা এবং সাথে সাথে মানুষের জীবনের মূল্য কত বেশি তা বুঝানো।

ইসলাম প্রচারের সময় যে সকল ব্যক্তি মুসলমানদের সাথে এমনকি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর সাথে যুদ্ধ করেছিল, মেরে গুম করেছিল, নিজের ঘরবাড়ী থেকে বের করে দিয়েছিল, কেড়ে নিয়েছিল তাদের যাবতীয় সহায় সম্পদ, হত্যা করে চিবিয়ে ছিল কলিজা পর্যন্ত, তাদের সাথে মক্কা বিজয়ের দিন সবাইকে পরাজিত ও নিরস্ত্র অবস্থায় পেয়ে কী আচরণ করেছিলেন আল্লাহর রাসূল (সা) তা পৃথিবীর ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। মক্কা বিজয়ের সময় সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতে গিয়ে সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত ফরমানে তিনি উল্লেখ করেন। মহানবী (সা) এ ফরমানটি ছিল নিম্নরূপঃ

১. যারা অস্ত্র সমর্পণ করবে তাদের হত্যা করবেনা।
২. যে ব্যক্তি কাবা ঘরের অভ্যন্তরে আশ্রয় নেবে তাকে হত্যা করবে না।
৩. যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে আশ্রয় নেবে তাকে হত্যা করবে না।
৪. যে ব্যক্তি নিজের বাড়ীতে বসে থাকবে তাকে হত্যা করবে না।
৫. যে ব্যক্তি হাকীম ইবনে হিযামের বাড়ীতে আশ্রয় নেবে তাকে হত্যা করবে না।
৬. পলায়নকারীদের পিছু ধাওয়া করবে না।
৭. আহত ব্যক্তিকে হত্যা করবে না।[৯০]

উপর্যুক্ত ফরমান ছাড়াও তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দীপ্ত কণ্ঠে বলেন: 'আজ তোমাদের ওপর আমার কোনো প্রতিশোধ স্পৃহা নেই, যাও তোমরা সবাই মুক্ত স্বাধীন।'[৯১]

---

[৯০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪।

[৯১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪।

উপর্যুক্ত কুরআন ও হাদিসের আলোকে এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হলো যে, মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেটিকে কোনোভাবেই খাটো বা অবহেলার চোখে দেখার সুযোগ নেই। যেখানে কোনো একজন ব্যক্তিকে হত্যা করা সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করার শামিল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, সেখানে এ বিষয়টি বুঝতে কোনো অসুবিধার কথা নয়। মানুষ কখন থেকে জীবনে এ নিরাপত্তা লাভ করবে এ প্রশ্নটিও স্বাভাবিক কারণে এসে যায়। এর জবাব আমরা পাই যখন হুজুর (সা) কোনো গর্ভবতী নারীকে শাস্তি না দিয়ে ফেরত পাঠান। কেননা উক্ত মহিলা অপরাধী হলেও তার গর্ভের বাচ্চাটি তো আর অপরাধ করেনি। মাতৃগর্ভস্থ সন্তানের প্রাণের নিরাপত্তা কখন থেকে নিশ্চিত করতে হবে সংগত কারনে এ প্রশ্নটি এসে যায়, এর জবাবে ইসলামী আইনবিশারদগণ গর্ভধারণের ১২০ দিনের মাথায় প্রাণের নিরাপত্তার অধিকার ধার্য করেছেন।'[৯২] মোট কথা সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বাবস্থায় ইসলাম জীবনের নিরাপত্তাকে অতীব গুরুত্বের সাথে দেখে থাকে। যাকে কোনো অবস্থায় হেয় জ্ঞান করার সুযোগ নেই।

(খ) ব্যক্তিগত সম্পদের নিরাপত্তা

পুঁজিবাদের মত অবাধ নিয়ন্ত্রণহীন ও সমাজতন্ত্রের মত ব্যক্তি মালিকানাকে একেবারেই অস্বীকার না করে ইসলাম ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকৃতি দানের সাথে সাথে এর পূর্ণ নিরাপত্তার ও গ্যারান্টি দিয়েছে। তবে শর্ত হলো যে উক্ত সম্পদ বৈধ বা হালাল পন্থায় উপার্জিত হতে হবে, আবার তা সমাজের জন্য কোনো অবস্থায় ক্ষতিকর হবে না। 'ইসলাম মানুষকে মালিকানার সাধারণ অধিকার দান করে।[৯৩] পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না।'[৯৪]

ইসলামী রাষ্ট্রে হালাল উপায়ে অর্জিত ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকানা স্বীকৃত। তবে এক্ষেত্রে শরীয়ত নির্ধারিত সকল প্রকার অধিকার আদায় করতঃ অন্যান্য যাবতীয় কর্তব্য যেমন যাকাত, দান-খয়রাত, মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, ভাই-বোন ও অন্যান্য নিকট আত্মীয়ের লালন-পালন ও যত্নের ব্যয়ভার ও দায়িত্ব বহন করতে হবে। এ সম্পদ হারাম ও অবৈধ খাতসমূহে ব্যয় করা যাবে না। এসব শর্তাধীনে

---

[৯২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫।

[৯৩] সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী, ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী রিচার্স একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৪, পৃ. ১১৩।

[৯৪]আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত-১৮৮।

রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে সম্পদের মালিকানা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে এবং সম্পদের সংশ্লিষ্ট মালিক নিম্নোক্ত অধিকারসমূহ ভোগ করবে:

ক. ভোগ-ব্যবহারের অধিকার

খ. অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করার অধিকার;

গ. সম্পদের মালিকানা হস্তান্তরের অধিকার এবং

ঘ. সম্পদের স্বত্ত্ব রক্ষার অধিকার;[৯৫]

ব্যক্তির অর্জিত সম্পত্তিতে তার মালিকানা এতখানি স্বীকৃত যে, তার ওপর মালিকের কর্তৃত্ব সংরক্ষিত থাকবে। এ মালিকানা সংরক্ষণের জন্য সরকার সর্বোতভাবে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে। এ ব্যাপারে দায়িত্বহীনকে শরীয়ত কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। রাষ্ট্রের বিশেষ প্রয়োজন অথবা অন্য কোনো কারণে যদি সরকার কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি সামগ্রিক স্বার্থে নিজের হাতে নিয়ে নেওয়া (হুকুম দখলের) প্রয়োজন মনে করলে মালিকের সম্মতিতে উপযুক্ত মূল্য প্রদান সাপেক্ষে তা গ্রহণ করতে পারবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর সময়ে একটি ঘটনা থেকে এর উদাহরণ মেলে মদীনায় মসজিদে নববী নির্মাণের জন্য মহানবী (সা) যে স্থানটি নির্বাচন করলেন তা ছিল দু'জন ইয়াতীম বালকের মালিকাধীন। তারা তাদের মালিকাধীন ভূমিখণ্ডটি বিনামূল্যে মসজিদের জন্য দান করতে চেয়েছিল। কিন্তু মহানবী (সা) তৎকালীন বাজারমূল্য অনুযায়ী তা পরিশোধ করে ভূমিখণ্ডটি গ্রহণ করেন।[৯৬] ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি আমরা আরো সুস্পষ্টভাবে পাই নিম্নের ঘটনাটি থেকে যেখানে হুজুর (সা) যুদ্ধের প্রয়োজনে অস্ত্র ফেরত দানের শর্তে গ্রহণ করেছিলেন।

হুনায়ন যুদ্ধের প্রাক্কালে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার নিকট থেকে কয়েকটি বর্ম গ্রহণ করেন। সে যখন বলল, এটা কি বলপূর্বক নেওয়া হলো? বিনিময় মূল্য ব্যতিরেকে নেওয়ার অভিপ্রায়ে? তিনি বললেন, 'না ধার স্বরূপ গ্রহণ করলাম। এর কোনো একটি ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।'[৯৭] ব্যক্তি মালিকানার প্রতি হযরত মুহাম্মদ (সা) কতখানি নিষ্ঠাবান ছিলেন আলোচ্য হাদিস থেকে তার প্রমাণ মেলে। যেখানে জরুরি অবস্থায় সরকার নাগরিকদেরকে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করতে পারেন এটা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত হলেও রাসূলুল্লাহ (সা) একজন নাগরিকের কয়েকটি বর্মের মালিকানার প্রতি পূর্ণ স্বীকৃতি

---

[৯৫] ইসলামে মানবাধিকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬।

[৯৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬।

[৯৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬-২২৭।

প্রদান করেন। এ থেকে বুঝা যায়, ব্যক্তি মালিকানার প্রতি ইসলাম কতখানি নিষ্ঠাবান।

কাযী আবু ইউসুফ (রহ) তাঁর রচিত 'কিতাবুল খারাজ' গ্রন্থে বর্ণনা করেন- 'রাষ্ট্রনায়ক (ইমাম) না অধিকার ছাড়া কোনো ব্যক্তির মালিকানা থেকে তার কোনো বস্তু নিতে পারে।[৯৮] কিন্তু হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে রসূলে করীম (সা) প্রাণের মর্যাদার সাথে সাথে ধন-সম্পদের মর্যাদা সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন তা ইতঃপূর্বে আলোচনায় এসেছে। মালিকানা স্বত্ত্ব অধিকারের নিম্নের হাদিস থেকে অনুমান করা যেতে পারে 'যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।'[৯৯] পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে,

> 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের বাড়ী ব্যতীত অন্যের বাড়ীতে বাড়ীর মালিকের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদের সালাম না দিয়ে প্রবেশ কর না। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর ব্যবস্থা, হয়ত তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। যদি তোমরা বাড়ীতে কাউকে না পাও তাহলে তাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ তোমাদের অনুমতি না দেওয়া হয়। যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও তবে তোমরা ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।[১০০]

পবিত্র কুরআনের আলোচ্য আয়াতটি থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয় তা হলো, তার সম্পদের নিরাপত্তার মত একান্ত ব্যক্তিগত অধিকারের সংরক্ষণ। পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে,

> 'যে বাড়ীতে কেউ বাস করে না তাতে তোমাদের প্রবেশে কোনো পাপ নেই এবং যেখানে তোমাদের উপকার রয়েছে।' [১০১]

উপর্যুক্ত আয়াতে বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল ঐ সব ক্ষেত্রে যেখানে মানুষ বসবাস করে। সেখানে বসবাসকারী ব্যক্তির আরামের ব্যাঘাত ঘটতে পারে এবং তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নষ্ট হতে পারে বলে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ কিন্তু যে সব বাড়িতে কেউ বসবাস করে না অথচ মানুষের যাওয়া একান্ত প্রয়োজন সেখানে অনুমতির বাধ্যবাধকতা রাখা হয়নি।

---

[৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

[৯৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

[১০০] সূরা আন নূর, আয়াত-২৯।

[১০১] আল কুরআন, সূরা আন নূর, আয়াত ২৭-২৮।

> 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের অনুমতি না দেওয়া হলে তোমরা খাদ্যদ্রব্য তৈরীর জন্য অপেক্ষা না করে খাওয়ার জন্য নবীর ঘরে প্রবেশ করবে না। তবে তোমাদের ডাকা হলে তোমরা প্রবেশ কর এবং খাওয়া-দাওয়া শেষ করে চলে যাবে। তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড় না।[১০২]

অনুমতি ব্যতীত কারো ঘরে প্রবেশ করা ও খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা অশালীন ও দৃষ্টিকটু বটে কিন্তু কাউকে দাওয়াত করা হলে এবং খাবার গ্রহণের অনুরোধ করা হলে তা গ্রহণ না করা ও দৃষ্টিকটু এবং অভদ্রতার শামিল। হুজুর (স) বলেছেনঃ যিনি কারো দাওয়াত কবুল না করেন তিনি আবুল কাশেমের রাসুল (স) বিরোধিতা করেন। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'নবী সহধর্মিনীদের নিকট থেকে কোনো বস্তু গ্রহণ করলে পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নাও। [১০৩] এ আয়াতটি থেকে প্রথমত চেয়ে নেয়ার মাধ্যমে অন্যের অধিকার ও মালিকানার প্রতি যেমনি সম্মান দেখানো হয়েছে তেমনি পর্দার বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেন, 'এবং তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান কর না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা কর না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা একে ঘৃণাই করবে।[১০৪] এ আয়াতে আল্লাহ পাক মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত অধিকার সংরক্ষণের বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। একজন মানুষের মান-ইজ্জতের অধিকার যেখানে ইসলাম নিশ্চিত করেছে সেখানে নিন্দা করার মাধ্যমে তার ব্যক্তিগত সম্মানহানি ঘটে যা প্রকারান্তরে কুরআনের নির্দেশ অমান্য করার শামিল। ব্যক্তিগত সম্পদের নিরাপত্তা সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) বলেছিলেন,

> 'তোমরা যদি মানুষের গোপনীয় বিষয়াদি উদঘাটনে লেগে যাও তবে তোমরা তাকে বিগড়ে দেবে কিংবা অন্তত বিগড়ানোর পর্যায়ে পৌঁছে দেবে।[১০৫]

এ হাদিসটিতে দু'টি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, প্রথমত গোপন দোষত্রুটি উদ্ঘাটন না করা, দ্বিতীয়ত এর মাধ্যমে সম্পর্ক বিনষ্ট না করা। তিনি অন্যত্র বলেন- 'যে ব্যক্তি অন্যের দোষত্রুটি দেখে তা গোপন রাখলো সে যেন একজন জীবন্ত সমাহিত ব্যক্তিকে রক্ষা করল।' [১০৬]

---

[১০২] সূরা আহযাব আয়াত-৫৩।

[১০৩] সূরা আহযাব, আয়াত ৫৩।

[১০৪] আল হুজুরাত, আয়াত-১২।

[১০৫] ইসলামে মানবাধিকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৫।

[১০৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫।

এ আয়াতে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার সাথে মানুষের দোষক্রটি গোপন করাকে তুলনা করা হয়েছে। মহানবী (স) শাসকবর্গকে বিশেষভাবে গুপ্তচরবৃত্তি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

> 'শাসনকর্তা যখন নাগরিকদের সন্দেহের কারণ অনুসন্ধান করতে শুরু করে তখন সে তাদের বিরূপমনা দেখতে পাবে। [১০৭]

এ হাদিসে রাসূল (সা.) শাসকগণকে তাদের নাগরিকদের গোপন বিষয়াদি অনুসন্ধান না করা বা তাদেরকে সন্দেহের চোখে না দেখার বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। কেননা সন্দেহ সংশয় মানুষের মধ্যে কেবল সমস্যাই সৃষ্টি করে না বরং দুরত্বও বাড়ায়। একদা রাত্রিবেলা হযরত ওমর (রা) নাগরিকদের খোঁজ-খরব নেওয়ার জন্য বের হলেন। তিনি হঠাৎ এক ব্যক্তির ঘরে গানের শব্দ শুনতে পান। তাঁর সন্দেহ হলে তিনি দেওয়ালের ওপর আরোহন করে দেখলেন যে, ওখানে শুরা মজুদ আছে, তার সাথে আছে এক নারী। তিনি সজোরে বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! তুই কি মনে করছিস যে, তুই নাফরমানী করতে থাকবি; আর আল্লাহ তা ফাঁস করে দেবেন না? লোকটি উত্তর দিল, হে আমীরুল মুমিনীন! ব্যস্ত হবেন না, আমি যদি একটি অপরাধ করে থাকি তবে আপনি করেছেন তিনটি অপরাধ। আল্লাহ গোপনীয় বিষয়াদি অন্বেষণ করতে নিষেধ করেছেন। আর আপনি সেই কাজটি করে ফেলেছেন। আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন সদর দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে, আর আপনি প্রবেশ করেছেন দেওয়াল টপকে। আল্লাহ আদেশ করেছেন, নিজের বাড়ী ব্যতীত অন্যের বাড়ীতে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ না করতে, আর আপনি অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করেছেন। একথা শুনে হযরত উমার (রা) তাঁর ভুল স্বীকার করলেন এবং গৃহকর্তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। অবশ্য তার নিকট থেকে সৎপথ অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন[১০৮]

এ হাদিস থেকে পরিস্কার ধারণা পাওয়া যায় যে, রাষ্ট্র ও সমাজের শৃংখলার সাথে উপর্যুক্ত তিনটি বিষয় অনুসরণ করে মানুষের গোপনবিষয়াদি অনুসন্ধান থেকে বিরত থাকতে হবে। হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালের আরেকটি ঘটনা। এক যুবতী শরীয়তের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে সময় তার জীবন রক্ষা পেলো। পরে সে কৃত অপরাধের জন্য খাঁটিভাবে তওবা করল। অনন্তর এক ব্যক্তি তাকে বিবাহ করার জন্য পয়গাম পাঠালো। সে তার অপকর্ম সম্পর্কে জানতো না। অভিভাবক হযরত ওমর (রা)-র

---

[১০৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫।

[১০৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫-২৩৬।

কাছে আরজ করলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি কি সেই ঘটনাটি বলে দেব? তিনি বললেন,

> 'মহান আল্লাহ যে বিষয়টি গোপন রেখেছেন তুমি কি তা ফাঁস করে দিতে চাচ্ছ? আল্লাহর শপথ! তুমি কারো কাছে একথা ফাঁস করে দিলে আমি তোমাকে সমুচিত শিক্ষা দেব। একজন সতীসাধ্বী নারীর ন্যায় তার শাদীর ব্যবস্থা কর'[১০৯]

এখানে একথাই বুঝানো হলো যে, কোনো অপরাধ করে তাওবা করার পর তা প্রকাশ না করে গোপন রাখাই শ্রেয়। অর্থ্যাৎ অপরের অপরাধ গোপন রাখার তাকিদ দিয়ে তা জনসম্মুখে প্রকাশ না করার জন্য ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে।

(গ) মান-সম্মানের নিরাপত্তা

ইসলাম মানুষের মান-ইজ্জতের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখে। কোনোভাবে যেন কারো ইজ্জত-সম্মান নষ্ট না হয় সে সম্পর্কে ইসলাম অত্যন্ত সতর্ক ও সচেতন। ইসলামী রাষ্ট্র নাগরিকদের ইজ্জত সম্মানের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে। সেখানে দেখা হয় না কে আমির, কে ফকির, কে ধনী, কে নির্ধন। হাদিসের ভাবানুবাদ এর ভিত্তিতে কবি তাই বলেছেন, কারো মনে তুমি দিও না আঘাত সে আঘাত গিয়ে লাগে কাবার ঘরে। এ বিষয়ে নিম্নে কুরআন ও হাদিসের কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করা হলো। সম্ভ্রান্ত মহিলাদের সম্মান ও সতীত্ব রক্ষাকল্পে আরও অসাধারণ ব্যবস্থা অবলম্বন করে সূরা আন- নূরে ইরশাদ হচ্ছে:

> 'যারা সতী-সাধ্বী, সরলমনা ও ঈমানদার মহিলার প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের মুখ, তাদের হাত ও তাদের চরণ যুগল তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরাপুরি দেবেন এবং তারা জানতে পারবে আল্লাহই সত্য 'স্পষ্ট প্রকাশক' [১১০]

এখানে আল্লাহ পাক ঈমানদার নারীদের ওপর অপবাদ আরোপ থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। অপবাদকারীদের কৃতকর্মের জন্য মহান আল্লাহ শেষ বিচারের দিনে কঠোর শাস্তির ব্যাপারে হুশিয়ার করে দিয়েছেন। কোনো সতীসাধ্বী নারীর ওপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া কবীরাহ গুনাহ হিসেবে মহা নবী (স) উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুরআনের আরেক আয়াতে বলেন,

---

[১০৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬।

[১১০] আল কুরআন, সূরা আন-নূর, আয়াত ২৩-২৫।

> 'হে রাসূল! মুমিনদের বল, তারা যেন নিজেদের চক্ষু সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এবং (হে নবী!) মুমিন মহিলাদের বল, তারা যেন নিজেদের চক্ষু সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে (সতীত্ব রক্ষা করে)'[১১১]

আল্লাহ পাক এখানে মু'মীনদেরকে বিশেষ করে মু'মিন নারী ও পুরুষ উভয়কেই পর্দা লঙ্ঘন করার মাধ্যমে অপরের মানসম্মানে আঘাত না করার বিষয়ে আদেশ করেছেন। পারস্পরিক বাক্য বিনিময়ে অশ্লীলতা পরিহার করার ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করে আল্লাহ বলেন 'অশ্লীল ভাষী হওয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না; তবে যার ওপর জুলুম করা হয়েছে, তার কথা স্বতন্ত্র। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। [১১২]

আল্লাহ তা'য়ালা অত্র আয়াতের মাধ্যমে মানুষকে কথোপকথনে অশ্লীল কথা পরিহার করে জবানকে সংযত রাখার ব্যাপারে আদেশ করেছেন। তবে অত্যাচারিতের জন্য খানিকটা শিথিলতা দেখানো হয়েছে এই জন্য যে, কারো ওপর জুলুম করার মাধ্যমে তার সম্মানহানি ঘটে থাকে। আল কুরআনে আল্লাহ বলেন,

> 'হে ঈমানদারগণ, কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। এবং কোনো নারী যেন অপর কোন নারীকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় উপহাসকারিনী অপেক্ষা সে উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করবে না; তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডাকবে না'[১১৩]

যে কোনো মানুষ সে যে মানের ও গুণের হউক না কেন নিজের অপমান সে কোনোভাবেই সহ্য করতে পারে না। মানুষের স্বভাব হলো, সে সম্মান, শ্রদ্ধা ও সুনাম চায়। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য সহ্য করতে না পারায় পৃথিবীতে অনেক অঘটন ঘটে থাকে। মন্দ নামে ডাকা ও উপহাস করা মানুষের সম্মানহানির কারণ বলে পবিত্র কুরআনের আলোচ্য আয়াত দু'টিতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুরআনে আরো বলেন, 'তোমরা একে অপরের অনুপস্থিতিতে নিন্দা কর না।[১১৪]

---

[১১১] সূরা আন নুর, আয়াত ৩০-৩১।

[১১২] সূরা আন নিসা, আয়াত-১৪৮।

[১১৩] সূরা হুজরাত, আয়াত-১১।

[১১৪] সূরা হুজরাত, আয়াত-১২।

এটি এ আয়াতের প্রথম ভাগের বক্তব্য আর দ্বিতীয় ভাগে ভিন্ন কথা বলা হয়েছে। প্রথম ভাগে একে অপরের নিন্দা না করতে বলা হয়েছে এবং পরে অনুমান বা সন্দেহ থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। সন্দেহ একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। সন্দেহ এমন একটি খারাপ জিনিস যেখানে ফেরেশতাকে মূহুর্তের মধ্যে শয়তানে এবং বন্ধুকে শত্রুতে পরিণত করে দেয়। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন এ আয়াতে আরো বলেন- 'তোমরা বহুবিধ অনুমান থেকে দূরে থাক, কারণ অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ'[১১৫] এখানে আল্লাহ পাক অনুমান করে কারো ব্যাপারে কোনো কথা বলা বা কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন কারণ অনুমান তথ্য নির্ভর নয় বিধায় এর কারণে সামাজিক বিশৃংখলার সমূহ সম্ভবনা থাকে এবং অনুমান যখন বাড়াবাড়ির পর্যায়ে যায় তখন তা পাপে পরিণত হয়। কুরআনে আরো বলা হয়েছে-

> 'যারা এ অপবাদ রটনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল। একে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না, বরং এতো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। ওদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে ওদের কৃতকর্মের পরিণতি। ওদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। একথা কোনোার পরে মু'মিন পুরুষ ও নারীরা কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা পোষণ করেনি এবং বলেনি, এতো সুস্পষ্ট অপবাদ। তারা এ ব্যাপারে কেন চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি সে কারণে আল্লাহর বিধানে তারা মিথ্যাবাদী। দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তার ফলে কঠিন শাস্তি তোমাদের স্পর্শ করত। যখন তোমরা মুখে মুখে এই কথা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোনো জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে, যদিও আল্লাহর নিকটে তা ছিল গুরুতর বিষয় এবং তোমরা যখন তা শুনছিলে তখন কেন বললে না, এ বিষয়ের চর্চা করা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহ পবিত্র, মহান! এতো একটি গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি সত্যিই মুমিন হয়ে থাক তাহলে কখনো অনুরূপ আচরণ কর না। মহান আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে তোমাদের জন্য বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা প্রসারের সংকল্প করে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ যা জানেন তা তোমরা জান না। [১১৬]

---

[১১৫] সূরা হুজুরাত, আয়াত ১২

[১১৬] সূরা আন-নূর, আয়াত, ১১-১৯।

অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক অপবাদকারীদের জন্য কঠিন শাস্তির কথা বলেছেন। অপবাদের ব্যাপারে যথাযথ সাক্ষী উপস্থাপন করতে বলা হয়েছে। তা না হলে এর প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

> 'যারা সতী সাধ্বী, সরলমনা ও ঈমানদার মহিলার প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের মুখ, তাদের হাত ও তাদের চরণযুগল তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে-সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরাপুরি দেবেন এবং তারা জানতে পাবে আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক।"[১১৭]

পুত-পবিত্র ঈমানদার মহিলাদের প্রতি যারা অপবাদ দেন তাদের বিরুদ্ধে আখেরাতে তাদের হাত পা, মুখ সাক্ষ্য দিবে যার ফলে তারা কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হবে।

> 'এবং তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান কর না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা কর না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা একে ঘৃণাই করবে।[১১৮]

এ আয়াতটিতে আল্লাহপাক মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত অধিকার সংরক্ষণের বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। একজন মানুষের মান ইজ্জতের অধিকার যেখানে ইসলাম নিশ্চিত করেছে সেখানে নিন্দা করার মাধ্যমে তার ব্যক্তিগত সম্মানহানি ঘটে যা প্রকারান্তরে কুরআনের নির্দেশ অমান্য করার শামিল। মহানবী (স) তাঁর অসংখ্য হাদিসে মানুষকে অহেতুক মারপিট করতে এবং অবমাননা ও অপমান করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলে কারীম (স) বলেন,

> 'যে ব্যক্তি অন্য কোনো লোকের মানহানি করে অথবা অন্য কোনো প্রকার জুলুম করে তবে সেদিন আসার পূর্বেই তার ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত-যেদিন তার না থাকবে ধনসম্পদ, আর না অন্য কিছু। অবশ্য তার নেক আমলসমূহ তার থেকে কেড়ে নেওয়া হবে সেই জুলুমের পরিমাণ অনুসারে। আল্লাহ না করুন যদি তার কোনো নেক আমল না থাকে তখন মজলুম ব্যক্তির মন্দ কাজগুলো তার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে।'[১১৯]

রাসুল (স.) মানুষের মান-সম্মানের নিরাপত্তার নিশ্চিত করার জন্য বলেছেন কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ওপর জুলুম করার পর সে ক্ষমা না চাইলে আখেরাতের দিন তার ভাল কাজগুলি কেড়ে নিয়ে মজলুমের খাতায় লেখা হবে। মহানবী (সা) আরো বলেন:

---

[১১৭] সূরা নুর, আয়াত-২৩-২৫

[১১৮] সূরা হুজরাত, আয়াত-১২।

[১১৯] ইসলামে মানবাধিকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯।

> 'কোনো ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে অপমানিত, লাঞ্ছিত অথবা সম্মানহানি হতে দেখেও যদি তার সাহায্য না করে তাহলে আল্লাহ এমন জায়গায় তার সাহায্য ত্যাগ করবেন যেখানে সে নিজে আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী হবে। আর যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে অপমানিতঅথবা বেইজ্জতী হতে দেখে এবং লাঞ্ছিত ও হেয় হতে দেখে তার সাহায্যে এপিয়ে আসবে আল্লাহ তাকে এমনস্থানে সাহায্য করবেন যেখানে সে আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবে[১২০]

রাসূলুল্লাহ (সা)এ বিষয়ে বলেন,

> 'মুসলমানদের পৃষ্ঠদেশ সম্মানিত (তাকে মারধর করা যাবে না)। তবে সে যদি শাস্তি যোগ্য অপরাধ করে থাকে (তবে শাস্তি দেওয়া যাবে)। বিনা কারণে কোনো মুসলমানকেমারলে আল্লাহ তার (মারধরকারীর) ওপর ভয়ানক অসন্তুষ্ট হন। [১২১]

কারো মানহানিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট অত্যাচার হিসেবে অভিহিত করে বলেন, 'কোনো মুসলমানের ওপর অন্যায়ভাবে হামলা করা জঘন্যতম অত্যাচার।'[১২২] হযরত ওমর (রা)-র আমলে মান-সম্মানের হেফাজতের সাথে সংশ্লিষ্ট হত্যার দু'টো ঘটনা ঘটে। কিন্তু তিনি উভয় ঘটনার ক্ষেত্রেই কিসাস রহিত করেন এবং হত্যাকারীকে কোনো শাস্তি দেননি। এক ঘটনায় বনী হুযায়লের কোনো এক ব্যক্তি তার মেহমানের কন্যার ওপর হস্তক্ষেপ করলে সে তার ওপর পাথর নিক্ষেপ করে। ফলে তার কলিজা ফেটে যায়। তিনি (ওমর) রায় দিলেন যে, এটা আল্লাহর খুন। এর কোনো দিয়াত (ক্ষতিপুরণ) হতে পারে না।[১২৩] উপর্যুক্ত দু'টি খুনের রক্তমূল্য রহিত করার মাধ্যমে হযরত ওমর (রা) বুঝাতে চেয়েছেন মানুষের সম্মানের মূল্য কতখানি। হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) গণীমতের মাল বেশি দাবি করার অপরাধে এক ব্যক্তিকে বিশটি চাবুক মারিয়েছিলেন এবং তার মাথা ন্যাড়া করিয়েছিলেন। সে ব্যক্তি সরাসরি মদীনায় চলে আসে। হযরত ওমর (রা)-র দরবারে তার মানহানির অভিযোগ উত্থাপন করলে তিনি লিখিত নির্দেশ পাঠালেন: 'আপনি যদি এই কাজ জনগণের সম্মুখেই করে থাকেন তাহলে আপনাকে শপথ করে বলছি যে, অনুরূপভাবে জনতার সম্মুখে বসে তার প্রতিবিধান করুন।' লোকেরা ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য তাকে অনেক বুঝালো কিন্তু সে কর্ণপাত করল না। পরিশেষে আবু মূসা (রা)

---

[১২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯।

[১২১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯।

[১২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯।

[১২৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০।

সর্বসাধারণের সামনে প্রতিদান দেওয়ার জন্য বসে যান। তখন সে আকাশপানে মুখ তুলে বলল, হে আল্লাহ! আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। [১২৪]

হযরত ওমর ফারুক (রা) শাসকগণকে বিদায়ের প্রাক্কালে নিম্নোক্ত উপদেশ দিতেন:

> 'আমি তোমাদেরকে জালিম ও অত্যাচারী হিসেবে নয়, বরং ইমাম ও সত্য পথের দিশারী হিসেবে নিয়োগদান করে পাঠাচ্ছি। সাবধান! মুসলমানদের মারপিট করে তাদের অপমানিত করবে না।[১২৫]

মান-মর্যাদার ব্যাপারে ইসলামী নীতিমালা হচ্ছে, সমাজের প্রত্যেক সদস্য সম্মানিত-তার পদ, স্থান ও বিত্তবৈভব যা-ই হোক না কেন। অর্থাৎ ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে কারও মানহানির অভিযোগ উত্থাপন করতে হলে একথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই যে, এই ব্যক্তি সম্মানিত এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির অপমানসূচক কার্য দ্বারা সত্যিকারভাবেই তার মানহানি হয়েছে। এ সাম্যনীতির আলোকে হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁর খিলাফতের সময় মিসরের গভর্নর হযরত আমর ইবনুল আস (রা)- এর পুত্র মুহাম্মাদ ইবনে আমরকে নিম্নোক্ত অপরাধে এক মিসরীয় দ্বারা প্রহার করিয়েছেন। মুহাম্মাদ ইবনে আমর একজন মিসরীর সাথে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঘটনাক্রমে মিসরীর ঘোড়া তার ঘোড়ার চাইতে অগ্রগামী হওয়ায় সে তাকে মারপিট করে এবং সাথে সাথে এও বলে, "এই চাবুকের আঘাত সহ্য কর। ব্যাটা! বুঝতে পারছিস, আমি শরীফ ঘরের সন্তান। হযরত ওমর (রা)পিতাপুত্র উভয়কে মদীনায় তলব করেন এবং মিসরীর হাতে চাবুক দিয়ে বলেন, শরীফের পুত্র শরীফজাদাকে প্রহার কর। প্রতিশোধ গ্রহণের পর তিনি বলেন, আমার ইবনুল আসের মাথার খুলির ওপরও দোররা লাগাও। কেননা আল্লাহর শপথ! সে তার পিতার রাজত্বের অহমিকায় তোমাকে মেরেছিল।'[১২৬]

বসরার গভর্নর হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা)-র ওপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে হযরত ওমর (রা) শাস্তির রায় দান করেন এবং তদনুযায়ী তাদের বেত্রাঘাত করা হয়।[১২৭]

হযরত ওমর (রা) উপর্যুক্ত তিন জন ব্যক্তিকে কেবলমাত্র ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদের অভিযোগে এ জন্য প্রহার করেছেন যে, মিথ্যা অপবাদের মাধ্যমে

---

[১২৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১।

[১২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯।

[১২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০।

[১২৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১।

একজন ব্যক্তির মান সম্মান নষ্ট করা হয়। অপর ঘটনাটি এই যে, দুই যুবক পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়। একজন জিহাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল এবং অপরজনকে সে তার পরিবার-পরিজনের তদারকির জন্য নিযুক্ত করল। এক রাতে সে তার ভাই-এর স্ত্রীর সাথে এক ইহুদিকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পেল এবং মন্দ কাজ প্রতিহত করার জোশে তাকে হত্যা করে তার বিবস্ত্র লাশ রাস্তার ওপর রেখে দিল। পরদিন অতি প্রত্যুষে ইহুদিরা হযরত ওমরের এজলাশে অভিযোগ দায়ের করল। তিনি সেই যুবকের জবানবন্দি শুনে বললেন, আল্লাহ তোমাকে নিরাপদ রাখুন। তিনি ইহুদির রক্ত মূল্যহীন বলে রায় দিলেন।[১২৮] রাসূলে করীম (স.) একবার বলেছিলেন:

> 'তোমরা যদি মানুষের গোপনীয় বিষয়াদি উদ্ঘাটনে লেগে যাও তবে তোমরা তাকে বিগড়ে দেবে কিংবা অন্তত বিগড়ানোর পর্যায়ে পৌঁছে দেবে।[১২৯]

এ হাদিসটিতে দু'টি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, প্রথমত গোপন দোষ-ত্রুটি উদ্ঘাটন না করা, দ্বিতীয়ত এর মাধ্যমে সম্পর্ক বিনষ্ট না করা। তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেছেন: 'যে ব্যক্তি অন্যের দোষত্রুটি দেখে তা গোপন রাখলো সে যেন একজন জীবন্ত সমাহিত ব্যক্তিকে রক্ষা করল।[১৩০] এ আয়াতে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার সাথে মানুষের দোষত্রুটি গোপনকে তুলনা করা হয়েছে। মহানবী (স) শাসকবর্গকে বিশেষভাবে গুপ্তচরবৃত্তি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ 'শাসনকর্তা যখন নাগরিকদের সন্দেহের কারণ অনুসন্ধান করতে শুরু করে তখন সে তাদের বিরূপমনা দেখতে পাবে।[১৩১] এ হাদিসে রাসুল (স) শাসকগণকে তাদের নাগরিকদের গোপন বিষয়াদি অনুসন্ধান না করা বা তাদেরকে সন্দেহের চোখে না দেখার বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। কেননা সন্দেহ সংসয় মানুষের মধ্যে কেবল সমস্যাই সৃষ্টি করে না বরং দুরত্বও বাড়ায়।

একদা রাত্রিবেলা হযরত ওমর (রা) নাগরিকদের খোঁজ-খরব নেওয়ার জন্য বের হলেন। তিনি হঠাৎ এক ব্যক্তির ঘরে গানের শব্দ শুনতে পান। তাঁর সন্দেহ হলে তিনি দেওয়ালের ওপর আরোহন করে দেখলেন যে, ওখানে শুরা মজুদ আছে, তার সাথে আছে এক নারী। তিনি সজোরে বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! তুই কি মনে করছিস যে, তুই নাফরমানী করতে থাকবি; আর আল্লাহ তা ফাঁস করে দেবেন না? লোকটি উত্তর দিল, হে আমীরুল মুমিনীন! ব্যস্ত হবেন না, আমি যদি

---

[১২৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০।

[১২৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫।

[১৩০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫।

[১৩১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬।

একটি অপরাধ করে থাকি তবে আপনি করেছেন তিনটি অপরাধ। আল্লাহ গোপনীয় বিষয়াদি অন্বেষণ করতে নিষেধ করেছেন। আর আপনি সেই কাজটি করে ফেলেছেন। আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন সদর দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে, আর আপনি প্রবেশ করেছেন দেওয়াল টপকে। আল্লাহ আদেশ করেছেন, নিজের বাড়ী ব্যতীত অন্যের বাড়িতে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ না করতে, আর আপনি অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করেছেন।' একথা শুনে হযরত উমার (রা) তাঁর ভুল স্বীকার করলেন এবং গৃহকর্তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। অবশ্য তার নিকট থেকে সৎপথ অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন।[১৩২]

এ হাদিসে থেকে পরিস্কার ধারণা পাওয়া যায় যে, রাষ্ট্র ও সমাজের শৃংখলার সার্থে উপর্যুক্ত তিনটি বিষয় অনুসরণ করে মানুষের গোপনবিষয়াদি অনুসন্ধান থেকে বিরত থাকতে হবে। হযরত ওমর ফারুক (রা)-র খিলাফতকালের আরেকটি ঘটনা। এক যুবতী শরীয়তের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে সময় তার জীবন রক্ষা পেল। পরে সে কৃত অপরাধের জন্য খাঁটিভাবে তওবা করল। অনন্তর এক ব্যক্তি তাকে বিবাহ করার জন্য পয়গাম পাঠালো। সে তার অপকর্ম সম্পর্কে জানত না। অভিভাবক হযরত ওমর (রা)-র কাছে আরজ করলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি কি সেই ঘটনাটি বলে দেব? তিনি বললেন, "মহান আল্লাহ যে বিষয়টি গোপন রেখেছেন তুমি কি তা ফাঁস করে দিতে চাচ্ছ? আল্লাহর শপথ! তুমি কারো কাছে একথা ফাঁস করে দিলে আমি তোমাকে সমুচিত শিক্ষা দেব। একজন সতীসাধ্বী নারীর ন্যায় তার শাদীর ব্যবস্থা কর।'[১৩৩] এখানে একথা-ই বুঝানো হলো যে, কোনো অপরাধ করে তওবা করার পর তা প্রকাশ না করে গোপন রাখাই শ্রেয়। অর্থ্যাৎ অপরের অপরাধ গোপন রাখার তাকিদ দিয়ে তা জনসম্মুখে প্রকাশ না করার জন্য ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের উপর্যুক্ত আয়াত থেকে সে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় তা কোনো ব্যক্তি সে যেই হউক না কেন ইজ্জত সম্মানের ওপর আঘাত হানা যাবেনা। ইজ্জত সম্মানের ওপর আঘাত আসে এমন কাজ কখনো করা যাবেনা। এজন্য গালাগালি দেয়া, নিন্দাবাদ করা, সন্দেহ পোষণ করা, খারাপ উপনামে ডাকা, মারপিট করা, কারো সম্মান নষ্ট হয় এমন কাজে চুপ থাকাসহ এমন কোনো কাজ করার অনুমতি ইসলামে নেই যেখানে অন্যের মান সম্মান ক্ষুণ্ন হতে পারে। চুরি, ডাকাতি, যেনা-ব্যভিচার ও হত্যার মত গুনাহ হলো, কোনো সতীসাধবী নারীকে

---

[১৩২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬।

[১৩৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬।

মিথ্যা অপবাদ দেয়া। কোনো নারীর বিরুদ্ধে অভিযোগকারীকে অবশ্যই তা প্রমাণ করতে হবে। যদি তিনি তা প্রমাণ করতে না পারেন তবে তাকে ইসলামী দণ্ডবিধি মোতাবেক ৮০টি বেত্রাঘাত করতে হবে। এ বিধানটি একদিকে নারীর মানসম্মান ও ইজ্জত আব্রুর হেফাজত অন্যদিকে তা নারীর মর্যাদার পরিচায়ক।

(ঘ) ব্যক্তি স্বাধীনতার সংরক্ষণ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন:

> 'আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে কিতাব, হিকমত (বিচক্ষণতা) ও নবুয়ত দান করার পর সে মানুষকে বলবে : 'আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা আমার বান্দা (গোলাম) হয়ে যাও'। এরূপ বলা তার পক্ষে শোভনীয় নয়। বরং সে বলবে, 'তোমার রবের (খোদার গোলাম) হয়ে যাও -যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষাদান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর।' [১৩৪]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরেক আয়াতে বলেন:

> 'আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মীমাংসাকারী তালাস করব? অথচ তিনি বিস্তারিত বর্ণনাসহ তোমাদের নিকট কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।[১৩৫]

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন কালামে পাকে অরো বলেন:

> 'তাদের কি এমন কতক দেবতা আছে যারা তাদের বিধান দিয়েছে এমন দীনের অনুমতি আল্লাহ দেননি। [১৩৬]

কালামে পাকে আল্লাহ পাক আরো বলেন:

> 'তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে তা করবে। [১৩৭]

রাসূল (স) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংরক্ষণ সম্পর্কে বলেছেন, 'যতদূর সম্ভব মুসলমান (নাগরিক)-কে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দাও, সুযোগ থাকলে তাকে ছেড়ে দাও। অপরাধীকে ভুলবশত ক্ষমা করে দেওয়া ও ভুলবশত শাস্তি দেওয়ার চেয়ে উত্তম।'[১৩৮] মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন, 'বাঁচানোর কোনো পথ পাওয়া গেলে মানুষকে শাস্তি থেকে মুক্তি দাও।'[১৩৯]

---

[১৩৪] আল কুরআন, সূরা আল ইমরান, আয়াত-৭৯।

[১৩৫] সূরা আনআম, আয়াত-১১৪।

[১৩৬] সূরা আশ শুরা, আয়াত-২১।

[১৩৭] সূরা আন নিসা, আয়াত-৫৮।

[১৩৮] ইসলামে মানবাধিকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৮।

[১৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮।

হযরত মায়েয ইবনে মালিকের ঘটনায় মহানবী (স)-এর চিন্তাধারার উজ্জ্বল নিদর্শন আমরা দেখতে পাই। একবার সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার পর খোদ মহানবী (সা)-এর খিদমতে হাজির হলো। সে আরজ করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি যেনা করেছি, আমাকে পবিত্র করুন (যথাযোগ্য শাস্তি দিন)। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে কীভাবে রসূল (স) তাকে শাস্তি থেকে রেহাই দেওয়ার পথ অনুসন্ধান করছিলেন। প্রথমে তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন, 'যাও এখান থেকে তওবা-ইসতিগফার কর'। সে সামনে ঘুরে এসে পুনরায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করল। এবারও তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তৃতীয়বারে সে ঐ একই কথা পুনরোক্তি করল। এবারেও মহানবী (সা) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। হযরত আবু বকর (রা) তাকে ধমক দিয়ে বললেন, দেখ চতুর্থবার স্বীকার করলে মহানবী (সা) তোমাকে প্রস্তরাঘাতে শাস্তি দিবেন। কিন্তু সে তার কথায় কর্ণপাত না করে ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করল। এবারে মহানবী (সা) তার প্রতি লক্ষ্য করে বলেন, 'সম্ভবত তুমি চুম্বন করেছিলে অথবা আলিঙ্গন করেছিলে অথবা তার ওপর তোমার কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়েছিল।' সে বলল না। তিনি বললেন, তুমি কি তার ওপর উপগত হয়েছিলে? সে বলল, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তার সাথে যৌন সম্ভোগ করেছ? সে বলল, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি পুনরায় জানতে চাইলেন,

তুমি কি তার সাথে সহবাস করেছ? সে বলল, হ্যাঁ। এভাবে অতিরিক্ত তিনটি প্রশ্ন করলে সে প্রত্যেকবারেই 'হ্যাঁ' সূচক জবাব দেয়। পরিশেষে তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কি জান যেনা কাকে বলে? সে বলল, হ্যাঁ। আমি তার সাথে হারাম উপায়ে যে কাজটি করেছি যা একজন স্বামী হালাল উপায়ে তার স্ত্রীর সাথে করে থাকে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিবাহ করেছ? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি সুরা পান করনি তো? সে বলল, না। এক ব্যক্তি উঠে তার মুখের ঘ্রাণ নিল এবং মদ্যপান না করার সত্যতা প্রমাণ করল। অতঃপর তিনি তার গ্রামবাসীদের নিকট থেকে জবানবন্দি নিলেন, এ লোকটি পাগল নয়তো? তারা বলল, আমরা তার মন-মগজে কোনো বৈকল্য লক্ষ্য করিনি।

মহানবী (সা) হাযযাল ইবনে নুআইম (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি তো মায়েয ইবনে মালিকের লালন-পালন করেছিলে এবং আমার এখানে মাগফিরাতের দু'আর পরামর্শ দিতে। হায় যদি তার গোপনীয়তাকে ঢেকে দিতে পারতে তাহলে তোমার জন্য অতিশয় মঙ্গল হত।' অতঃপর মহানবী (সা) মায়েযের মৃত্যুদণ্ডের চূড়ান্ত রায় দিলেন। তাকে শহরের বাইরে নিয়ে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হলো। প্রস্তর নিক্ষেপণ শুরু হলে মায়েয পলায়ন করতে উদ্যত হয় এবং বলে, লোকজন!

তোমরা আমাকে রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট নিয়ে চল। আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে প্রতারিত করেছে। তারা আমাকে ধোঁকা দিয়েছিল এই বলে যে, রাসূলে করীম (সা) আমাকে হত্যার আদেশ দিবেন না। কিন্তু প্রস্তর নিক্ষেপকারীরা তাকে হত্যা করেই ফেললো। ব্যাপারটি মহানবী (সা)-কে অবহিত করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন? আমার নিকট নিয়ে আসলে হয়ত সে তওবা করত এবং আল্লাহ তার তওবা কবুল করতেন।'[১৪০]

এই ঘটনায় প্রতিবারই মায়েজকে প্রশ্ন করা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মহানবী (সা) তাকে যে কোনো ধরনের শাস্তি এমনকি মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দেয়ার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা চালিয়েছেন। তার জবানবন্দি ও তার গ্রামবাসীদের সাক্ষ্য দানের বেলায় তিনি এমন কোনো কারণ অনুসন্ধান করেছিলেন যার মাধ্যমে তাকে শাস্তি দেয়া থেকে বাঁচানো যায়। তিনি সুরাপানের নেশা অথবা মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণও অনুসন্ধান করেছিলেন এখানেও উদ্দেশ্য ছিল যে কোনোভাবে হউক তাকে শাস্তি হতে অব্যহতি দেয়া যায় কিনা। কিন্তু মুক্তির কোনো উপায় না পেয়ে চূড়ান্ত রায় দেন। অতঃপর তা কার্যকর হওয়াতে তিনি ব্যথিত হন।

এই ঘটনা থেকে একথাও সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বিচার মীমাংসা করার সময়, বিশেষ করে কাউকে শাস্তি দেওয়ার প্রাক্কালে বিষয়টির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য কত বেশি পরিমাণে গভীর অনুসন্ধান চালানো হয়েছে।[১৪১]

> 'একবার মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) তিনি মসজিদে নববীতে ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভাষণ চলাকালে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার এক প্রতিবেশীকে কোনো অপরাধে বন্দী করা হয়েছে? তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল। তিনি ভাষণ দিতেই থাকেন। এবারেও তিনি লোকটির প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলেন না। তৃতীয়বার লোকটি দাঁড়িয়ে তার প্রশ্নটি পুনর্ব্যক্ত করল। তিনি নির্দেশ দিলেন, তার প্রতিবেশীকে ছেড়ে দাও।'[১৪২]

রাসূলে করীম (সা)-এর দুইবার নীরব থাকার কারণ ছিল এই যে, শহরের প্রধান পুলিশ অফিসার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গ্রেপ্তারকৃত লোকটির কোনো অপরাধ থাকলে তিনি দাঁড়িয়ে তা বর্ণনা করতেন। কিন্তু তার নীরবতার দরুন মহানবী

---

[১৪০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।

[১৪১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

[১৪২] প্রাগুক্ত, ২৪০।

(সা) বুঝতে পারলেন যে, লোকটাকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাই তিনি তাকে মুক্তির আদেশ দিলেন।[১৪৩]

(ঙ) ন্যায় বিচার

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন ন্যায় বিচার সম্পর্কে কালামে পাকে বলেন আল্লাহ সুবিচার, সদাচার ও নিকটাত্মীয়দেরদান করার নির্দেশ দিচ্ছেন।'[১৪৪] কালামে পাকের অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

> 'কোনো বিশেষ লোক দলের শত্রুতা যেনো তোমাদেরকে এতোটা উত্তেজিত করে না দেয়, যার ফলে তোমরা সুবিচার ত্যাগ করে বসবে। সুবিচার করো। মূলত তাকওয়ার সাথে এর গভীর নৈকট্য ও সামঞ্জস্য রয়েছে।'[১৪৫]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কালামে পাকে আরো বলেন:

> 'হে ঈমানদারেরা। তোমরা সুবিচারের ধারক হও। আল্লাহর জন্যে সাক্ষী হও। তোমাদের এই সুবিচার ও সাক্ষ্যের আঘাত তোমাদের নিজেদের ওপর কিংবা তোমাদের পিতা মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের ওপরই পড়ুক না কেন, আর পক্ষদ্বয় ধনী কিংবা গরীব যাই হোক না কেন, তাদের সকলের অপেক্ষা আল্লাহর এই অধিকার অনেক বেশী যে, তোমরা তাঁর ইচ্ছার প্রতিই লক্ষ্য রাখবে। সুতরাং তোমাদের নফ্ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে সুবিচার থেকে বিরত হয়ো না।[১৪৬]

কুরআন মজীদে আল্লাহ তাঁর নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন একথা ঘোষণা করতে:

> 'তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি।'[১৪৭] পবিত্র কালামে পাকে আল্লাহ পাক আরো বলেন: 'বল, আমার প্রভু আমাকে ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন।[১৪৮]

পৃথিবীর বুকে মানব সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে নবী-রাসূল প্রেরণ, আসমানি কিতাবসমূহের অবতরণের মূল উদ্দেশ্য, যেমন আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন: 'আমরা আমাদের রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ।' [১৪৯]

---

[১৪৩] প্রাগুক্ত, ২৪০

[১৪৪] সূরা আন নহল, আয়াত-৬০।

[১৪৫] সূরা মায়েদা, আয়াত-৮

[১৪৬] আননিসা, আয়াত-১৩৫।

[১৪৭] আশ-শূরা, আয়াত-১৫।

[১৪৮] সূরা আল আরাফ, আয়াত-২৯।

[১৪৯] সূরা হাদীদ, আয়াত ২৫

মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী- 'তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কর্ম পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে তা করবে।[১৫০]

রাসূল (সা.)-এর বাণী

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

> 'বিচারক যখন ফায়সালা করে এবং ইজতিহাদ করে (চিন্তাভাবনা করে সত্যে পৌছার চেষ্টা করে), অতঃপর সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছে যায়, তার জন্য দু'টি পুরস্কার রয়েছে। আর সে যদি ফায়সালা করতে গিয়ে ভুল করে বসে তবুও তার জন্য একটি পুরস্কার রয়েছে।[১৫১]

আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন:

> 'কিয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠ শাসকই আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় ও নিকটে উপবেশনকারী হবে। তাদের মধ্যে যালিম শাসকই আল্লাহর সর্বাধিক ঘৃণিত এবং তাঁর নিকট থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থানকারী হবে।"[১৫২]

রাসূল (সা) বলেছেন: 'ন্যায়পরায়ণ শাসকের একদিন ষাট বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম।[১৫৩] রাসূল (সা) আরও বলেন: 'সৃষ্টিকুলের মধ্যে আল্লাহর সর্বাপেক্ষা প্রিয় হচ্ছে ন্যায়পরায়ণ শাসক, আর সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত হচ্ছে জালেম শাসক।[১৫৪]

ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন: 'কাযী যতক্ষণ পর্যন্ত যুলুম না করে ততক্ষণ আল্লাহ তার সাথে থাকেন। যখন সে যুলুম করে তখন তিনি তাকে ত্যাগ করেন এবং শয়তান তাকে আকড়ে ধরে।'[১৫৫]

আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাকে বলেছেন:

> 'যখন দুই ব্যক্তি তোমার নিকট বিচার প্রার্থনা করে তখন তুমি দ্বিতীয় ব্যক্তির বক্তব্য না শুনেই প্রথম ব্যক্তির কথার ভিত্তিতে রায় দিও না। অচিরেই তুমি জানতে পারবে, তুমি কিভাবে ফয়সালা করছ। আলী (রা) বলেন, অতঃপর আমি বিচারক হিসাবেই থেকেছি।[১৫৬]

---

[১৫০] সূরা নিসা, আয়াত-৫৮।

[১৫১] তিরমিযি শরীফ, ৩য় খণ্ড, হাদিস নং-১২৬৫, পৃ-৩।

[১৫২] তিরমিযি শরীফ, ৩য় খণ্ড, হাদিস নং-১২৬৭, পৃ-৬।

[১৫৩] ইসলামে মানবাধিকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১।

[১৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১।

[১৫৫] তিরমিযি শরীফ, ৩য় খণ্ড, হাদিস নং-১২৬৮, পৃ. ৫।

[১৫৬] তিরমিযি শরীফ, ৩য় খণ্ড, হাদিস নং-১২৬৯, পৃ. ৬।

আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু বাকরা একজন বিচারক ছিলেন। আমার পিতা তাকে লিখে পাঠালেন, তুমি ক্রোধান্বিত অবস্থায় দুই পক্ষের মধ্যে বিচারকার্য করবে না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, বিচারক যেন রাগের অবস্থায় দুই পক্ষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা না করে।[১৫৭]

আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাকরাহ তার পুত্রকে লিখে পাঠালেন তখন তিনি সিজিস্থানে অবস্থান করছিলেন, তুমি রাগান্বিত অবস্থায় দু'জন লোকের মাঝে বিচার ফায়সালা করবে না। কেননা আমি নবী (সা) কে বলতে শুনেছি। কোনো বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দু'জনের মাঝে বিচার ফায়সালা না করে।[১৫৮]

ইবনে যুফর বলেন, ওমর ইবনে আবদুল আযীয আমাদেরকে বলেছেন-

> 'বিচারকের মধ্যে পাঁচটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। যদি তার মধ্যে একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য কম হয়, তবে তার মধ্যে একটি ত্রুটি আছে বলে গণ্য করতে হবে। আর সে পাঁচটি গুণ হলো, তাকে অবশ্যই বুদ্ধিমান, সহনশীল বা ধৈর্যশীল, সৎ, কঠোর বা দৃঢ় সংকল্প এবং আলেম বা শিক্ষিত জ্ঞান অন্বেষণকারী হতে হবে।[১৫৯]

উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন:

> 'আমি তো একজন মানুষ! তোমরা বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমা নিয়ে আমার নিকট আগমন কর। আর সম্ভবতঃ তোমাদের কেউ কেউ দলিল প্রমাণ উপস্থাপনের ব্যাপারে অন্যের চাইতে পটু। সুতরাং আমি যা (ঘটনা উপস্থাপনের সময়) শ্রবণ করি সেই মোতাবেক বিচার ফায়সালা করি। কাজেই যে ব্যক্তির (ভুলবশত) বিচার করে তার ভাইয়ের হক অন্য ভাইকে প্রদান করি, সে যেন উহা গ্রহণ না করে। কেননা আমি তাকে কেবলমাত্র এক টুকরা অগ্নি কেটে প্রদান করি।[১৬০]

পবিত্র কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে ও রাসূল (সা.) এর পবিত্র হাদিসসমূহ থেকে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ পৃথিবীর সৃষ্টা হিসেবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজকে সর্বাধিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি চান এ পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হোক। সেজন্য কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে তিনি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য জোর তাগিদ

---

[১৫৭] তিরমিযি শরীফ, ৩য় খণ্ড, হাদিস নং-১২৭১, পৃ. ৭।

[১৫৮] সহীহ আল বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদিস নং-৬৬৫৯, পৃ. ৩৫২।

[১৫৯] সহীহ আল বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদিস নং-৬৬৬৩, পৃ. ৩৫৬।

[১৬০] সহীহ আল বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদিস নং-৬৬৬৮, পৃ. ৩৫৮।

দিয়েছেন। রাসুল (সা) একজন ন্যায় বিচারক শাসককে এ পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, ন্যায় বিচার ও আল্লাহর সত্তা এক। একথা বলা বাহুল যে, ইসলামের মূল দর্শন হচেছ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বারবার তাগিদ দিয়েছেন। কেননা এ পৃথিবীতে যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার ও জুলুমের মূল কারণ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত না থাকা। পবিত্র কুরআন অনুযায়ী মুসলমানদের অন্যতম কাজ হচ্ছে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ। আল্লাহর খলিফা হিসেবে মুসলমানদের একমাত্র কাজ হলো এ পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা যার মাধ্যমে সর্বত্র ন্যায় বিচার চালু হবে।

বাংলাদেশের এ সমাজে আমরা যদি মানুষ হিসেবে অথবা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে ন্যায়ের পথে চলতে পারি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হই তাহলে কোনো ভাবেই সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে না। সামাজিক বিচার ও সালিশের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ যদি এ বিষয়ে সচেষ্ট থাকেন তাহলে নারী নির্যাতনের যে ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে কোনো অবস্থায় তা হতে পারে না। ন্যায়ের প্রতি খেয়াল রাখলে ফাতওয়ার অপব্যবহারের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গও সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য।

(চ) সদাচরণ

'সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ একতাবদ্ধভাবে বসবাস করতে ভালবাসে। বিচ্ছিন্ন মানব জীবনের কল্পনা করাও অসম্ভব। সমাজ ছাড়া মানুষ কখনো চলতে পারে না। বস্তুত সমাজবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা মানুষের স্বভাবগত ও প্রকৃতিগত ব্যাপার।'[১৬১] মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব হলো, মনের আকর্ষণ, ঝোঁক, প্রবণতা, ভালবাসা, পারস্পরিক মেলামেশা। মানবজাতি জন্মগতভাবেই বড়ই অসহায়। একটি গরুর বাছুর জন্মের পর পরই উঠে দাঁড়ায়, নিজেই মায়ের দুধ পান করতে সক্ষম হয়; কিন্তু দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সম্পূর্ণঅন্যের ওপর নির্ভরশীল থাকে। এমনকি শৈশবে সে নিজের দৈনন্দিন প্রয়োজনও নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এ অবস্থায় মানুষ যেমন অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা প্রত্যাশা করে, তেমনি প্রত্যাশা করে স্নেহ, মমতা ও উত্তম আচরণ।

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, মানুষের প্রশংসা করলে সে আনন্দ অনুভব করে এবং নিজের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে। এমনকি তার পোশাক-আশাক বা সাধারণ কোনো গুণের প্রশংসাও তাকে তৃপ্তি দেয়। বিপরীতভাবে, তার

---

[১৬১] দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৪২৯।

কোনো ত্রুটি বা দুর্বলতা প্রকাশ করা হলে সে মানসিকভাবে কষ্ট অনুভব করে এবং অসন্তোষ প্রকাশ করে। এটি মানুষের স্বাভাবিক ও সহজাত বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই মানুষ স্বভাবত সমাজবদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। 'মানুষ দুটো কারণে অন্যের সাথে মিলেমিশে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে চায় প্রথমটি স্বজাতির প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ। দ্বিতীয়টি জীবন ধারণের জন্য অন্যের সহযোগিতার প্রয়োজন।[১৬২]

মানুষের নিজস্ব সীমাবদ্ধতা ও পরনির্ভরশীলতা থেকে প্রথমে পরিবার তারপর সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি। মানুষের স্বভাব হলো, সে অন্যের নিকট থেকে ভাল ব্যবহার প্রত্যাশা করার সাথে সাথে অন্যের দূর্ব্যবহার কোনোভাবেই সহ্য করতে পারে না এবং মেনে নিতেও পারে না। 'নিজের, নিজ পরিবার-পরিজনের, আত্মীয় ও প্রতিবেশীর মঙ্গল কামনা ও কল্যাণ সাধন প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য। ইসলামে হুক্কুল ইবাদ তথা অপরের প্রতি কর্তব্য পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্বস্ততার সাথে 'হুক্কুল ইবাদ, আদায় করা ইসলামী সমাজ জীবন যাপনের অপরিহার্য শর্তবিশেষ। শুধু নিজের বা নিজ পরিবারের আরাম আয়েশ করার অধিকার কোনো মুসলিমকে দেয়া হয়নি। বরং তার আনন্দ, বেদনা, সূখানুভূতি ও সম্পদে রয়েছে তার প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও গরীব দুঃখী মানুষের অংশ ও অধিকার।[১৬৩]

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সদাচরণ প্রার্থী মানুষের জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বাণী ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর বক্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হলো: 'তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।' [১৬৪]

পবিত্র কুরআনের আলোচ্য আয়াতটিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানব জাতিকে লক্ষ্য করে যে বিষয়টি বুঝাতে চেয়েছেন তা হলো মানুষের মধ্যে তিনি জন্মগত ভাবে দয়া ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যে কারণে মানুষ অন্যের প্রতি যেমন দয়া ও ভালবাসা প্রদর্শন করবে ঠিক তেমনিভাবে অপরের নিকট থেকে দয়া ও ভালবাসা প্রত্যাশা করা স্বাভাবিক। এবং আল্লাহর সৃষ্ট জীব ও সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে তার নিকট থেকে এ ধরনের আচরণই প্রত্যাশিত। 'তোমরা উত্তম জাতি, মানুষের (কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে আর মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে।[১৬৫]

---

[১৬২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯।

[১৬৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯।

[১৬৪] সূরা আর-রুম, আয়াত-২১।

[১৬৫] সূরা আল-বাকারা, আয়াত-১১০।

আলোচ্য আয়াতটির মর্মার্থ হলো মানুষের প্রতি সদাচরণ নিশ্চিত করার জন্য সমাজে অবশ্যই ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে হবে। যা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুসলমানদের ওপর ফরয করে দিয়েছেন। যদি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধের কাজ অব্যাহত না থাকে তাহলে পৃথিবীতে নেমে আসবে বিপর্যয়। সমাজ হয়ে পড়বে মনুষ্য বসবাসের অনুপযোগী ও বিশৃঙ্খল। হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসুল (সা) বলেছেন-

> 'তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। আবার পরস্পরকে ভালবাসতে না পারা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয়ের খবর দেব না যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসতে সক্ষম হবে? (তা হলো) তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করবে।[১৬৬]

আলোচ্য হাদিসটির মর্মার্থ হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পূর্বশর্ত হলো মানুষকে ভালবাসতে হবে। মানুষকে ভালবাসা সদারচণের অন্যতম প্রতিফলন। কোনো ব্যক্তি কাউকে সালাম দিলে তার সাথে যেমনি রূঢ় ব্যবহার করতে পারে না ঠিক তেমনি তার অকল্যাণ কামনারও কোনো সুযোগ থাকে না। অতএব এভাবে পরস্পরের মধ্যে উত্তম আচরণ ও সম্পর্কের ভীত রচিত হয়ে থাকে। মু'মিনগণ একে অন্যের ভাই[১৬৭]। ভাই কথাটির অর্ন্তনিহিত অর্থ হলো ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালবাসা। ভাই মানেই হচ্ছে একজন অন্য জনের সাথে সদাচরণ করবে। কোনো ভাবেই ভ্রাতৃত্ববোধের মাধ্যমে নেতিবাচক ব্যবহার কল্পনাও করা যায় না। সমগ্র পৃথিবীর মু'মিনদেরকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একটি দেহের সাথে তুলনা করেছেন। এবং তিনি এও বলেছেন মানবদেহের কোনো একটি অংশে যদি ব্যথা অনুভব হয় তা সমগ্র দেহের মধ্যেই অনুভূত হয়ে থাকে ঠিক একজন মুসলমানের সাথে যদি অসদ্বাচরণ করা হয় তাহলে তার সমগ্র মানব জাতির সাথে অসদ্বাচরণেরই সামিল। অতএব একজন মুসনমান অপর মুসলমানের ভাই হিসেবে তার উচিত তার ভাইয়ের সাথে ভাল ব্যবহার করা। রাসূল (সা) বলেছেন: 'সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন। আল্লাহর কাছে প্রিয় সৃষ্টি হলো, তার সৃষ্টির প্রতি সদয় আচরণ করা।' [১৬৮]

হাদিসটির ভাব ও ভাষা এত সুস্পষ্ট যে, এতে ব্যাখ্যা করার কোনো অবকাশ নেই। আল্লাহর কাছে প্রিয় হবার জন্য মানুষের সাথে সদাচরণকে অন্যতম শর্ত

---

[১৬৬] দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩০।

[১৬৭] সূরা হুজুরাত, আয়াত-১০।

[১৬৮] দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯।

হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অন্য হাদিসে এ কথাটি পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, সৃষ্টির প্রতি সদয় আচরণ করলে আল্লাহ তার প্রতি সদয় হবেন। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে বহু জায়গায় আল্লাহ ও তার রাসূল (সা) সকল মানুষকে ইয়াতীম, দুস্থ, অসহায় ও মজলুম মানুষের প্রতি সদয় আচরণ ও তাদের কল্যাণে কাজ করাকে ঈমানের অপরিহার্য কর্তব্য হিসেবে স্থান দিয়েছেন। কুরআনে এত উল্লেখ করা হয়েছে ইয়াতীম, দুস্থ, অসহায় মানুষের পাশে না দাঁড়ানো ও তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা না করাকে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে। এমনকি ইয়াতীম মিসকীনের হক আদায় না করার কারণে তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয় বরং এই ভাল কাজ না করার পরিণতি হলো জাহান্নাম বলে পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে একই বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে যেসব কথা বলা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

> 'তুমি কি এমন লোকদের দেখেছ যে, দ্বীনকে অস্বীকার করে? সে তো ঐ ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে দৃঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়, আর সে মিসকীনদের খাবার দানে উৎসাহিত করে ইয়াতীম ও মিসকীনদেরকে খাবার খাওয়ানো ও তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করাকে ঈমানের শর্ত বানানো হয়েছে। [১৬৯]
>
> 'কখনো এরূপ নয়; বরং তোমরা ইয়াতীমের সম্মান কর না। আর মিসকীনদের খাদ্য দানে উৎসাহিত কর না।'[১৭০]
>
> তারা দুনিয়ার জীবনে খাদ্য দ্রব্যের প্রতি নিজেদের প্রয়োজন আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীদের আহার প্রদান করে।' [১৭১]
>
> তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব।'[১৭২]
>
> যে ব্যক্তি যালিমের সাথে থেকে তাকে শক্তি যোগায়, অথচ তার জানা আছে যে, লোকটি যালিম, তবে সে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে।'[১৭৩]
>
> যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করেনা, বড়দের সম্মান করে না সে আমাদের দলভূক্ত নয়। [১৭৪]

মুসলমান মুসলমানদের ভাই। সে তার প্রতি অত্যাচার করবে না। তিনি বুকের দিকে তিনবার ইশারা করে বললেন, তাকওয়া এখানে। নিজ মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ

---

[১৬৯] সূরা মাউন, আয়াত: ১-৭।

[১৭০] সূরা আল ফজর, আয়াত: ১৭-১৮।

[১৭১] সূরা দাহার, আয়াত-৮।

[১৭২] সূরা আল-ইমরান, আয়াত-১১০

[১৭৩] দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্র-৪৩৩

[১৭৪] তিরমিযি সূত্র মিশকাত, পৃ-৪২৩

তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা করা অন্যায়। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের রক্ত সম্পদ ও সম্মান সবই হারাম। [১৭৫]

কোনো লোক মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত সে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করবে যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে। [১৭৬] কোনো মুসলিমের জন্য যায়েজ নেই যে, সে তার মু'মিন ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন অবস্থায় থাকে।[১৭৭] আপনি উত্তম ও নম্র ব্যবহার দ্বারা তাদের দূর্ব্যবহারকে প্রতিহত করতে থাকুন, আমি খুব অবগত আছি ইহারা আপনার সম্পর্কে যা কিছু বলিয়া থাকে।[১৭৮] আর তোমরা আল্লাহ তা'য়ালারই ইবাদত কর এবং তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না এবং পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয় স্বজনের সহিত এবং ইয়াতীমদের সহিত এবং দরিদ্রগণের সহিত এবং সহচরদের সহিত ও পথিকদের সহিত এবং উহাদের সহিত ও যারা তোমাদের মালিকানাধীন আছে। নিশ্চয় আল্লাহ এরূপ লোকদের ভালবাসেন না যারা নিজেদেরকে বড় মনে করে ও আত্মগর্ব করে।[১৭৯]

উপর্যুক্ত কুরআন ও হাদিসের মূল বক্তব্য হলো অসহায় মানুষের সাথে সদয় ব্যবহার করা যাকে ঈমানের অঙ্গ বা অংশ হিসেবে অভিহীত করা হয়। ইসলাম সকল মানুষের সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছে, এ ক্ষেত্রে মুসলিম অমুসলিমদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আল-কুরআন বলেছে, 'আল্লাহ সুবিচার, সদাচার ও নিকটাত্মীয়দের দান করার নির্দেশ দিচ্ছেন [১৮০]

মহানবী মুহাম্মদ (সা:) বলেছেন, 'দয়ালুদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন দয়া করেন। যমীনবাসীদের দয়া কর আসমানের মালিক তোমাদের দয়া করবেন।' [১৮১] 'যে খারাপ ব্যবহার করে তার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম।' [১৮২]

---

[১৭৫] বুখারী ও মুসলিম সূত্র মিশকাত, পৃ. ৪২২।

[১৭৬] আবু দাউদ সূত্র মিশকাত, পৃ. ৪২৮।

[১৭৭] সূরা মু'মিনুন, আয়াত-৯৬।

[১৭৮] সূরা আন-নিসা, আয়াত-৩৬।

[১৭৯] সূরা আন-নাহল, আয়াত-৬০।

[১৮০] ইসলাম আপনার কাছে কি চায়, পূর্বোক্ত, পৃ- ৫৫-৫১।

[১৮১] আল কুরআন, সূরা হামীম আস্ সাজদা, আয়াত-৩৪।

[১৮২] আল হাদিস।

রাসূল (সা) এর চলার পথে যে বুড়ি কাঁটা বিছিয়ে রেখেছিল রাসূল (সা) তার অসুস্থাবস্থায় স্বয়ং তাকে দেখতে যান। রসূল (সা) বলেছেন: 'তোমাদের মধ্য থেকে সে উত্তম যে সদারচণের দিক দিয়ে উত্তম।'[১৮৩]

রাসূল (সা) আরো বলেছেন, 'ইসলামে সদাচারণের পরিধি অনেক ব্যাপক। কারো সাথে হাসিমুখে কথা বলা, পিতা মাতার চেহারার দিকে সন্তুষ্টিচিত্তে তাকানোকে ইসলাম সদারচণের অন্তর্ভুক্ত করেছে।' [১৮৪]

একজন সাহাবী বলেছেন, 'রাসুল (সা)-এর চেয়ে বেশী মুচকি হাসতে আর কাউকে দেখিনি।' [১৮৫]

অশ্লীল ও বেফাঁস কথা থেকে বিরত রাখার জন্য ইসলাম বলেছে, 'মুখের হেফাজত করবে রাসূল (সা.) তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদারী হবেন।' [১৮৬]

অনেক সৎ আমল শুধুমাত্র অসৎ আচরণের জন্য বিফল হবে। (মিশকাত)

ইসলাম যেহেতু স্বভাবধর্ম যার স্বাভাবিক আচরণের বহিঃপ্রকাশই সদাচরণ তাই ইসলামই সদাচরণের সবচেয়ে বেশি উৎসাহী করে। এক লোক হযরত আলী (রা)-কে থুথু দিলে তিনি তাকে ছেড়ে দেন, আগুন্তুক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে পেশাব করে দিলেও রসূল (সা)তার সাথে সদাচরণ করেন।[১৮৭]

উপর্যুক্ত পবিত্র কুরআন ও হাদিস থেকে পরিস্কার হয়ে যায় যে, একজন মুসলমানের আচার-আচরণ হবে উত্তম। কোনোভাবেই কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। এমনকি কেউ যদি খারাপ ব্যবহারও করে থাকে তবে তার জবাব দিতে হবে উত্তম ব্যবহার দ্বারা। ইসলামের দৃষ্টিতে উত্তম ব্যবহার ইবাদত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন, তোমরা ঐ কাজকেও ছোট মনে করো না যদিও তা তোমার অপর ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলা হউক। আমরা লক্ষ্য করি যে, মানব জীবনের বহুমূখী কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন সমাজের মানুষের সাথে নানা ধরনের সম্পৃক্ততা ও বহুবিধ সম্পর্ক। এমতাবস্থায় যদি তাদের সকল চাহিদা পূরণের সাথে সাথে তাদের মধ্যে বিরাজ করে হাসি খুশীভাব ও মধুর সম্পর্ক তবে সমাজ হবে মানুষের সমাজ। সেখানে বিরাজ করবে শান্তির ফল্গুধারা। মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা তাই স্বাভাবিক ও ধর্মের দাবি।

---

[১৮৩] যাদুল মা'য়াদ।

[১৮৪] আল হাদিস।

[১৮৫] মিশকাত শরীফ।

[১৮৬] সূরা আল-ইমরান, আয়াত-১১০।

[১৮৭] সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত-১৯।

ইয়াতীমদের সাথে ভাল ব্যবহার না করাকে পরকালে অবিশ্বাসী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। ইসলাম যেহেতু মানুষের ধর্ম ও স্বভাবধর্ম অতএব একজন মুসলমানের নিকট ইসলামের দাবি হলো সদাচরণ। সমাজের মানুষ একে অন্যের প্রতি সদাচরণ করলে সমাজে ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা, হৃদ্যতা ও সহানুভূতির পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এর ফলে সমাজ একটি সুন্দর ও আদর্শ সমাজে পরিণত হবে। সমাজটি পাশবিকতার পরিবর্তে মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে মানুষের জন্য বাসযোগ্য হয়ে ওঠবে। অন্যথায় এ সমাজে পাশবিকতার সয়লাব সৃষ্টি হবে এবং তা মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে।

(ছ) অসহায়দের সেবা

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত মানবজাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যাতে রয়েছে মানবজাতির ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি। মুসলিম একটি মিশনারী জাতি, যাদেরকে পৃথিবীতে পাঠানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি মানুষের কল্যাণে তোমাদের আবির্ভাব। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে আর বিরত রাখবে মন্দকাজ থেকে।'[১৮৮]

পবিত্র কুরআনের আলোচ্য আয়াত থেকে একথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মুসলমান জাতি এ কারণে শ্রেষ্ঠ তারা মানুষের কল্যাণ করবে। এ কল্যাণের বহুবিধ অর্থ রয়েছে, এখানে গ্রহণযোগ্য অর্থ হলো অসহায়দের সেবা করবে। অসহায় বলতে গরীব, মিসকীন, ইয়াতীম, বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা নারী, অসহায় শিশু ও মজলুম জনতা। অভাব গ্রস্ত, দরিদ্র হতদরিদ্রদের সাহায্য সহযোগিতাকে ইসলামে ঈমানের অঙ্গ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন, 'যে মানুষের কল্যাণের চিন্তা করে না সে আমার উম্মত নয়।'[১৮৯]

মুসলমান হওয়ার জন্য মানুষের কল্যাণসাধনকে এখানে কত কঠোর ও দৃঢ় ভাষায় শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অসহায় মানুষের কল্যাণে কাজ করার বিষয়ে বিশেষ তাগিদ দিয়ে পবিত্র কুরআন-এ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, 'তুমি কি এমন লোকদের দেখনি যারা দ্বীনকে অস্বীকার করে। ইয়াতীমদের গলাধাক্কা দেয়, মিসকীনদেরকে খাবার দিতে উৎসাহিত করে না।' [১৯০]

---

[১৮৮] সূরা আল ইমরান, আয়াত, ১১০।

[১৮৯] আল হাদিস

[১৯০] সূরা মাউন, আয়াত ১-৩।

ইয়াতিমদের সম্মান করার অর্থ হলো তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় নিশ্চিত করা। পবিত্র কুরআন-এর আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরকালে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অপরাধ বর্ণনা করতে গিয়ে এ বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে ইঙ্গিত করেছেন। এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, অসহায় ও বঞ্চিত মানুষের সেবা ও সহযোগিতা থেকে বিরত থাকা মানুষের জন্য পরিণামে কঠিন শাস্তির কারণ হতে পারে। অন্যদিকে, নিজের প্রয়োজন ও অভাব থাকা সত্ত্বেও অসহায় মানুষের কল্যাণে দান-সদকা করাকে মহান আল্লাহ মুক্তি ও নাজাতের অন্যতম গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেন, 'তারা নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতিম ও বন্দীদের আহার করায়।'[১৯১]

অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশুদের সহায়তা বিষয়ে পবিত্র কুরআনে মানবিক দায়িত্ব ও সামাজিক ন্যায়ের প্রতি গভীর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নিম্নে আলোচ্য আয়াতসমূহ প্রমিত অনুবাদসহ উপস্থাপন করা হলো-প্রথমত, আল্লাহ তাআলা বলেন- 'তাদের (ধনীদের) সম্পদে প্রয়োজনশীল প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রহিয়াছে।[১৯২]

এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সম্পদ কেবল ব্যক্তিগত ভোগের জন্য নয়; বরং সমাজের দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের ন্যায্য অধিকার এতে অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়ত, নির্যাতিত ও অসহায় মানুষের মুক্তির বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন–

'তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কেন আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছ না, অথচ নির্যাতিত নারী পুরুষ এবং শিশুরা আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে বলছে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ জালিম অধ্যুষিত এলাকা থেকে উদ্ধার কর আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে সাহায্যকারী বন্ধু পাঠাও।[১৯৩]

এ বিষয়ে আউফ ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'আমি এবং বিবর্ণ চেহারার ঐ মহিলা কিয়ামতের দিন এ দুটো অংগুলির ন্যায় (পাশাপাশি) অবস্থান করবো'

ইয়াযীদ ইবনে যুরাই (রা) এ হাদিসটি বর্ণনাকালে মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুলের দিকে ইঙ্গিত করলেন। যে সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সুন্দরী যুবতীর স্বামী মারা গিয়াছে এবং

---

[১৯১] সুরা দাহার, আয়াত-৮।

[১৯২] সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত-১৯।

[১৯৩] সূরা আন-নিসা, আয়াত-৭৫।

সে স্বামীর ঔরশজাত ইয়াতীম সন্তানাদির দিকে তাকিয়ে তাদের পৃথক হওয়া কিংবা মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত দ্বিতীয় বিয়ে করা থেকে বিরত রয়েছে।[১৯৪]

সাহলা ইবনে সাদরা হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

> 'আমি এবং ইয়াতীম ও কাঙালদের প্রতিপালনকারী বেহেশতে পাশাপাশি অবস্থান করব। এ কথা বলে তিনি তার মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন এবং ইশারা করার সময় দুই আঙুলের মাঝে একটু ফাঁক রাখলেন।' [১৯৫]

হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

> 'মুসলিম পরিবারের মধ্যে ঐ পরিবারই সর্বোত্তম যে পরিবারে একজন ইয়াতীম আছে এবং তার প্রতি সদয় ব্যবহার করা হয়। অপর দিকে মুসলিম সমাজে সেই পরিবারই নিকৃষ্টতম পরিবার যে পরিবারে একজন ইয়াতীম আছে এবং তার প্রতি দূর্ব্যবহার করা হয়।'[১৯৬]

হযরত আবু হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে একজন লোক রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট অন্তরের কাঠিন্য সম্পর্কে অভিযোগ করলে রাসূল (স) বললেন, 'ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও। আর গরীব মিসকীনদের খাবার দাও।'[১৯৭]

খুয়াইলিদ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আমি দু' রকমের দুর্বল লোকের অধিকারকে পবিত্র বলে ঘোষণা করছি। তাদের একজন ইয়াতীম ও অপর জননারী।[১৯৮]

উপর্যুক্ত পবিত্র কুরআনের আয়াত ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর হাদিস থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, গরীব ও অসহায়দের সহযোগিতা করা ঈমানের অপরিহার্য দাবি। এ বিষয়ে কোনোরূপ শিথিলতা দেখানো যাবে না। অসহায়দের পাশে না দাঁড়ানোর কারণে জাহান্নামে যেতে হবে বলে আল্লাহ ও তার রাসূল (সা) স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন। এর থেকে বুঝা যায় বিষয়টি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। যিনি যতটা অসহায়, দুর্বল, দরিদ্র ও দূর্দশাগ্রস্ত তিনি ততটা দয়া, সাহায্য ও সহানুভূতির অধিকারী। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

---

[১৯৪] আবু দাউদ শরীফ, সূত্রঃ রাহে আমল, আল্লামা জলীল আহসান নদভী, অনুবাদ-আব্দুল খালেক মজুমদার, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৭।

[১৯৫] বুখারী, সূত্রঃ রাহে আমল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৭।

[১৯৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

[১৯৭] মিশকাত, সূত্রঃ রাহে আমল, পৃ. ১৪৯।

[১৯৮] প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৪৯।

'বিধবা মিসকীনদের সেবা ও সাহায্যার্থে যে ব্যক্তি দৌড় ঝাপ করবে সে ঐ ব্যক্তির মতো যে আল্লাহর পথে দৌড় ঝাপ করে, বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি একথাও বলেছেন, সে ঐ ব্যক্তির মত, যে প্রতি রাতে আল্লাহর ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাকে; কোনো বিরতি দেয় না এবং ঐ ব্যক্তির মত যে প্রতিদিন রোজা রাখে বিরতি দেয় না।'[১৯৯]

আমি এবং ইয়াতীমের পৃষ্ঠপোষণকারী, চাই সে ইয়াতীমের আত্মীয় হোক কিংবা অনাত্মীয় এরূপ নিকটবর্তী থাকবো। একথা বলে তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যাংগুল সামান্য ফাঁক রেখে কাছাকাছি করলেন।[২০০]

'যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করে, তারা মূলত আগুন দিয়ে তাদের উদর জঙঝ ভর্তি করে। অচিরেই তারা দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনে প্রবেশ করবে।[২০১]

রাসুল (সা) ছোটবেলা থেকে অসহায়দের সেবায় ব্যাপ্ত ছিলেন। আর তা বাস্তবায়নের জন্য হিলোফুল-ফুযুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যখন তিনি নবুওয়াত প্রাপ্ত হন এবং জিব্রাইল (আ)তাঁর সঙ্গে আলিঙ্গন করেন এবং তিনি ভয় পেয়ে ফিরে আসলে খাদিজা (রা) তাঁকে অভয় দিয়ে যা বলেছিলেন তা হলো- 'আপনাকে জীন, ভুত আক্রমণ করবে না। কারণ আপনি নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেন, অসহায়কে সাহায্য করেন [২০২]

রাসূল (সা) বলেছেন, 'সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন। আল্লাহর কাছে প্রিয় সৃষ্টি হলো যে তার সৃষ্টির প্রতি সদয় আচরণ করে। [২০৩]

ইসলাম নামাজের পরই যাকাতের গুরুত্ব দিয়েছে। উদ্দেশ্য এটাই যে, সমাজের মধ্যে যারা সম্পদশালী তারা যেন গরীব, দুস্থ ও অসহায়দের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। অসহায়দের সহযোগিতা না করাকে ইসলাম দ্বীনকে অস্বীকারকারীর সাথে তুলনা করেছে।

(জ) প্রতিবেশীর অধিকার

মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে একে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল। অন্য কথায়, একজন অন্যজনের সাহায্য সহযোগিতার প্রত্যাশী। সমাজে বসবাসরত মানুষ তার পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবদের নিকট থেকে

---

[১৯৯] ইসলাম আপনার কাছে কি চায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১।

[২০০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

[২০১] আল কুরআন, আন নিসাঃ আয়াত-১০।

[২০২] বুখারী, মুসলিম।

[২০৩] দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩২।

প্রতিনিয়ত সহযোগিতা গ্রহণ করে থাকে। আত্মীয়-স্বজনগণ সাধারণত সব সময় খুব কাছে থাকে না। প্রতিবেশীরা প্রথমত আত্মীয়-স্বজনদের চেয়েও খুব বেশি কাছে থাকে এবং অনেক বেশি কাজেও আসে। প্রতিবেশীরাই বিপদে আপদে, দুঃখ দূর্দশায় প্রথমে এগিয়ে আসে। বিপদের সময় প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেয় ও সেবা যত্ন করে থাকে। বিয়ে শাদী সহ সকল সামাজিক কাজে প্রতিবেশীর ভূমিকা থাকে[২০৪] উল্লেখযোগ্য। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।'[২০৫]

এ হাদিসের মর্মবাণী দাঁড়ায় এরকম যারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দিল তারা যেন আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান হারিয়ে ফেলল। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন এ বিষয়ে কুরআনে বলেছেন, 'আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরন ও আত্মীয় স্বজনদের দানের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং তিনি নিষেধ করেছেন অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘন।'[২০৬]

হাদিসে রাসূল (সা:) বলেছেন, 'প্রতিবেশীদের অধিকারে ব্যাপারে জিব্রাইল (আ:) আমাকে বার বার তাগিদ করতে থাকেন। ফলে আমার মনে হচ্ছিল, প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়া হবে।[২০৭] আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

> 'আল্লাহর শপথ, সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর কসম, সে ব্যক্তি মুমিন নয়। খোদার কসম, সে ব্যক্তি মুমিন নয়। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ হে আল্লাহর রাসূল, সে ব্যক্তি কে? তিনি বললেনঃ যার প্রতিবেশী তার অন্যায়, অনাচার ও দুষ্কৃতি থেকে নিরাপদ নয়।'[২০৮]

কুরআন মাজীদে সকল প্রকার প্রতিবেশীর সাথে সদাচারের নির্দেশ দিয়েছে। এরশাদ হচ্ছে 'নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী এবং সঙ্গী-সাথীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে।'[২০৯] এ আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে প্রতিবেশী সে নিকটের হউক অথবা দূরের হউক এবং যারা নিকটাত্মীয় তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। এ আয়াতে বিশেষভাবে প্রতিবেশীদের সম্পর্কে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) হক বা অধিকার হিসেবে প্রতিবেশীকে তিনভাগে ভাগ

---

[২০৪] প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪৩৫-৪৩৬।

[২০৫] প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪৩৬।

[২০৬] আল কুরআন, সূরা: নহল, আয়াত: ৯০।

[২০৭] ইসলাম আপনার কাছে কি চায়, পুর্বোক্ত, পৃ-৫২।

[২০৮] প্রাগুক্ত, পৃ-৫৩।

[২০৯] সূরা আন-নিসা, আয়াত-৩৬।

করেছেনঃ প্রথমত এক হক বিশিষ্ট প্রতিবেশী-যারা আত্মীয় নয় মুসলিমও নয়। দ্বিতীয়ত দুই হক বিশিষ্ট প্রতিবেশী-যারা আত্মীয় নয় কিন্তু মুসলিম। তৃতীয়ত তিন হক বিশিষ্ট প্রতিবেশী-যারা আত্মীয় ও মুসলিম।[২১০]

রাসূল (সা) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, যে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।[২১১]

প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাদের মঙ্গল কামনা করা, তাদের কোনো প্রকার, কষ্ট-যন্ত্রণা না দেয়, তাদের উপকার করা, গরীব প্রতিবেশীকে দান করা এবং অভুক্ত প্রতিবেশীকে খাবার দেয়া প্রত্যেক ঈমানদারের ঈমানী দায়িত্ব। নবী করীম (সা) বলেছেন, 'ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে তৃপ্তি সহকারে খানা খায় অথচ তার প্রতিবেশী তার পাশে অভুক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে।[২১২]

তিনি পথ বাতলিয়ে দিয়ে বলেছেন, যখন তুমি তরকারী পাকাবে তখন তাতে কিছু পানি অতিরিক্ত দিবে, আর তোমার প্রতিবেশীকে হাদিয়া দিবে।[২১৩]

(ঝ) পরিবারের অধিকার

মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে ইহকালীন জীবনে সুখে শান্তিতে বসবাস করার জন্য পরিবার গঠন করে থাকে। সামাজিক জীব হিসেবে পরিবার গঠন একটি অপরিহার্য কাজ। যা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। একজন নারী ও পুরুষের মধ্যে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে অথবা সমাজ স্বীকৃত পন্থায় পরিবার গঠিত হয়। সুখী দাম্পত্য জীবন যাপনের জন্য নারী পুরুষের সম্মিলন বা একত্রিত হওয়া খুবই জরুরি। শুধুমাত্র পারিবারিক জীবনে নারী পুরুষের একত্রিত হওয়াই যথেষ্ট নয় বরং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতা এবং একের প্রতি অন্যের মতামতের শ্রদ্ধা প্রদর্শন একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে দু' জনের সহাবস্থান কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

সমাজের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আদর্শ নাগরিক সৃষ্টির মৌলিক কারখানা হলো পরিবার। যেখানে মা-বাবা, ভাই-বোন সহ পরিবারের সকলেই শিশুর শিক্ষক হিসেবে কাজ করে। তবে মা-ই প্রধান শিক্ষিকার ভূমিকা পালন করে থাকেন। পরিবারে শিশু যে ধরনের শিক্ষা পায়

---

[২১০] দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৬।

[২১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৬।

[২১২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৬।

[২১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৭।

সমাজে তার প্রতিফলন ঘটে থাকে। সুতরাং একটি পরিবারে যদি আদর্শ পরিবার বজায় থাকে তার প্রভাব পরিবারের গণ্ডি ডিঙিয়ে সমাজের মধ্যে পড়ে থাকে।

ইসলাম এ কারণে পরিবারের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেছে। পাশ্চাত্যের দর্শন হলো যেখানে পরিবারকে ভেঙে টুকরা টুকরা করে ফেলা সেখানে ইসলাম বলেছে পরিবারকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করতে। পরিবারের একের প্রতি অন্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ইসলাম দিয়েছে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা। যেখানে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা বা ঘোর প্যাঁচের বালাই নেই। ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান হিসেবে পরিবারের একের প্রতি অন্যের দায়-দায়িত্ব নিম্নের কুরআন ও হাদিসের মধ্যে আমরা দেখতে পাই।

নারীদের সাথে উত্তম আচরণের ব্যাপারে তোমরা আমার অসীয়ত কবুল করো।[২১৪] নারী পুরুষের মধ্যে ইসলাম নারীর অধিকার ও মর্যাদাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছে। যা আলোচ্য হাদিস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়। তোমাদের মাঝে উত্তম তারা যারা নিজেদের স্ত্রীদের জন্য উত্তম।[২১৫] এখানে ঘরের লোক বলতে পরিবারের সবাইকে বুঝানো হয়েছে। তবে বিশেষভাবে উত্তম হওয়ার বিষয়টি স্ত্রীর সাথে বিশেষভাবে জড়িত। কেননা অন্য একটি হাদিসে বলা হয়েছে স্বামী ভালো-মন্দ সম্পর্কে স্ত্রীর সার্টিফিকেট হচ্ছে গ্রহণযোগ্য।

মানুষ হিসেবে স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের মধ্যে কিছু দোষ-ত্রুটি থাকতে পারে। আল্লাহ তা'আলা উভয়কে ধৈর্যধারণের মাধ্যমে সৎভাবে জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে। তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ করো তবে এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছো।'[২১৬]

এ হাদিস মোতাবেক বুঝা যায় মানুষ হিসেবে স্বামী হোক বা স্ত্রী হোক উভয়ের মধ্যে অথবা যে কোনো একজনের মধ্যে কোনো ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি, ঘাটতি ইত্যাদি থাকা স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়া উত্তম। এবং এ ধরনের কাজকে আল্লাহ প্রশংসা করেছেন। নারীদের সার্বিক অধিকার সম্পর্কে আল কুরআনে নির্দেশ হলো: 'তাদের ও তেমনই অধিকার আছে যেমন তোমাদের আছে তাদের ওপর।'[২১৭]

---

[২১৪] ইসলাম আপনার কাছে কি চায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮।

[২১৫] দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৯।

[২১৬] আল কুরআন, সূরা আন-নিসা, আয়াত-১৯।

[২১৭] আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত-২২৮।

আমাদের সমাজে একটি ভুল ধারণার প্রচলন আমরা দেখতে পাই তা হলো পুরুষরাই উত্তম আর নারীরা অধম। পুরুষরাই সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও সম্মান পাওয়ার যোগ্য আর নারীরা পুরুষের সেবা-যত্ন ও তাদের সম্মান করতে বাধ্য। আসলে এধারণাটি মোটেও ঠিক নয়। পবিত্র কুরআন এবং হাদিস ও আলোচ্য আয়াত মোতাবেক নারী ও পুরুষের অধিকার সমান। এখানে বাড়তি বা কমতির কোনো অবকাশ নেই। রাসূল (সা) বলেছেন,

> 'সন্তান ও স্ত্রীর ব্যয়ভার, খোরাক ও পোশাক সংগ্রহ ও ব্যবস্থা করা সন্তানের পিতার পক্ষে ওয়াজিব। আর তা হতে হবে সাধারণ প্রচলন অনুযায়ী যা লোকেরা সাধারণত করে থাকে। এব্যাপারে কোনো পিতাকেই তার শক্তি-সামর্থের বাইরে তার পক্ষে কঠিন ও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে এমন মান বা পরিমাণ তার ওপর চাপানো যাবে না। [২১৮]

একটি পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর দায়-দায়িত্ব সমান। স্ত্রীর পরিবারের আভ্যন্তরীণ যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালন করে থাকেন। আর পুরুষ এ কাজকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন তার যোগান দেয়ার জন্য বাইরে সার্বক্ষণিক কাজে ব্যস্ত থাকেন। পরিবারের যাবতীয় ভরণ পোষণের জন্য আয়-উপার্জনের দায়-দায়িত্ব পুরুষের। এর সফল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নারীর ওপর ন্যস্ত। রাসূল (সা) স্বামীদের লক্ষ্য করে তাই এরশাদ করেছেন, 'স্ত্রীদের খাবার ও পরার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে তোমরা অবশ্যই তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করবে।[২১৯]

(ঞ) সন্তানদের অধিকার

সন্তানের সুন্দর নাম রাখা পিতা-মাতার ওপর কর্তব্য। বুকের দুধ দিয়ে বড় করে তোলা মায়ের ওপর বিশেষ দায়িত্ব। পুত্র সন্তান এবং কন্যা সন্তানের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করতে ইসলাম কঠিনভাবে নিষেধ করেছে। অধিকন্তু কন্যা সন্তানকে জান্নাতে যাওয়ার উপকরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন স্বয়ং রাসূল (সা)। সন্তানদের আকিকা দেয়া, লালন পালন করা, শিক্ষিত করে গড়ে তোলা, ছেলেদের খৎনা করানো, চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখা পিতা-মাতার ওপর অন্যতম কর্তব্য। সন্তান-সন্ততি যেমন আল্লাহর অন্যতম নিয়ামত তদ্রূপ পরীক্ষাও বটে। কারণ পৃথিবী মানব জাতির জন্য পরীক্ষার বস্তু হিসেবে স্বীকৃত। তাই আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদ ও সন্তান পরীক্ষার বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। সন্তানের অধিকার সম্পর্কে আল্লাহর বাণীসমূহ নিম্নরূপ: পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'আর জেনে রাখো যে, তোমাদের ধন-

---

[২১৮] পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পূর্বোক্ত, পৃ-১৯০

[২১৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০।

সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এক পরীক্ষা এবং আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহা পুরষ্কার।[২২০]

সন্তান সন্ততিকে পরীক্ষা হিসেবে উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে যে বিষয়টি বুঝানো হয়েছে তা হলো তাদের দায় দায়িত্ব অভিভাবক হিসেবে যথাযথ পালন করা। 'যারা নিজেদের সন্তানদের হত্যা করেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।[২২১]

আল কুরআনে আরো বলা হয়েছে, 'তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না।[২২২]

পবিত্র কুরআনের এ দু'টি আয়াতে সন্তান সন্ততির জীবনের নিরাপত্তার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে বলা হয়েছে সন্তানদের স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তাদের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকেন। মানুষ এর পরিচালক বা ব্যবস্থাপক মাত্র। অতএব কেউ যদি আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে সন্তান হত্যা করতে উদ্যত হয় আল্লাহ তাদের জন্য কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। 'তারা যেন ভয় করে যে, অসহায় সন্তান পিছনে ছেড়ে গেলে তারাও তাদের সম্পর্কে উদ্ভিগ্ন হত।[২২৩]

আলোচ্য আয়াতটিতে সন্তান সন্ততিদের সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হওয়া বলতে তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখানে আল্লাহ বুঝাতে চেয়েছেন পিতা হিসেবে তারা যেন তাদের মৃত্যুর পর ছেলে-মেয়েদের (যাতে তারা অন্যের মুখাপেক্ষী হতে না হয়) জন্য অবশ্যই কিছু না কিছু সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করবে। সন্তানের অধিকার সম্পর্কে মহানবী (স) এর বাণীসমূহ নিম্নরূপ :

মহানবী (সা) বলেছেন,

> 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের যত্ন নিবে এবং তাদের আদব-কায়দা, শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে।'[২২৪]

মহানবী (সা) আরো বলেছেন,

> 'তোমরা শিশুদের ভালবাস এবং তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। তাদের সাথে কোনো ওয়াদা করলে তা পূর্ণ কর। কেননা তারা তোমাদেরকে তাদের রিষিক সরবরাহকারী বলে জানে।'[২২৫]

---

[২২০] আল কুরআন, সূরা আনফাল, আয়াত-২৮।

[২২১] সূরা আনআম আয়াত-১৪০।

[২২২] সূরা আনআম, আয়াত ৫১।

[২২৩] সূরা আন-নিসা, আয়াত-৯।

[২২৪] দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ-১২৫।

[২২৫] প্রাগুক্ত, পৃ-১২৫।

'যে ব্যক্তিকে কন্যা সন্তান দ্বারা পরীক্ষা করা হয় আর সে তাদের সাথে সদাচরণ করে, তাদের এই কন্যারা জাহান্নাম থেকে তার মুক্তির কারণ হবে।'[২২৬]

'কোনো পিতা তার সন্তানকে সুন্দর নৈতিক চরিত্র শিক্ষাদানের চাইতে উত্তম কিছু দান করে না।[২২৭]

'শুনো, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাগিত হবে। জনগণের নেতা তাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবার পরিজনের ওপর দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[২২৮]

'আর যখন (কিয়ামতের দিন) জীবন্ত প্রোথিত বালিকাদের জিজ্ঞাসা করা হবে যে, কোনো অপরাধে তাদের হত্যা করা হয়েছিল।[২২৯]

'তোমরা দারিদ্রের ভয়ে আপন সন্তানদের হত্যা করো না। আমিই তাদের জীবিকা দান করবো আর তোমাদেরও। তাদের হত্যা করা নিঃসন্দেহে মহা অপরাধ।[২৩০]

যে ব্যক্তি পূর্ণ বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত দুটি কন্যা সন্তান প্রতিপালিত করেছে, কিয়ামতের দিন আমার ও তার মধ্যে কোনো দুরত্ব থাকবে না। এ কথা বলে তিনি তার আঙ্গুলগুলোকে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দেখালেন। [২৩১]

'মুসলমান যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় আপন পরিবার পরিজনের জন্যে ব্যয় করে, তখন তা তার পক্ষে 'সদাকা' বলে গণ্য হয়।[২৩২]

'মানুষ যা ব্যয় করে তন্মধ্যে সর্বোত্তম দীনার হচ্ছে সেটি, যা সে আপন বাল-বাচ্চাদের জন্যে ব্যয় করে, যা সে ব্যয় করে আল্লাহর পথে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে, কোনো পশুর জন্যে এবং যা সে বায় করে তার আল্লাহর পথের সাথীদের জন্যে।[২৩৩]

---

২২৬ ইসলাম আপনার কাছে কি চায়, পূর্বোক্ত, পৃ-৬০

২২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

২২৮ প্রাগুক্ত, পৃ, ৫৯।

২২৯ আল কুরআন, সূরা বনি ইসরাঈল-৩১।

২৩০ ইসলাম আপনার কাছে কি চায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

২৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

২৩২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

২৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

> 'মিসকীনদের জন্যে ব্যয় করা একটি সদা। আর আত্মীয়দের জন্যে ব্যয় করা দুটি সদকা। কারণ এটি একদিকে দান আর অপরদিকে রক্তসম্পর্ক রক্ষা করা।[২৩৪]

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহ দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা গেলো যে, রাসূল (স) সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য পিতা মাতার ভূমিকাকে কতটা গুরুত্বারোপ করেছেন।

(ট) অমুসলিমদের অধিকার

ইসলাম একটি উদার, আন্তর্জাতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত জীবন বিধান। এখানে সংকীর্ণতার কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। মহান আল্লাহ নিজকে রাব্বুল আলামিন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যার অর্থ মহাবিশ্ব সমূহের প্রতিপালক। যেহেতু তিনি মহাবিশ্বসমূহের প্রতিপালক অতএব তার বিশ্বে কেবল মুসলমানগণই বসবাস করে না অমুসলমানগণও বসবাস করেন। একইভাবে পবিত্র কুরআন মজীদে রাসুল (সা) কে রাহমাতুল্লিল আলামিন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যার অর্থ মহাবিশ্বসমূহের জন্য রহমত। সত্যিকার অর্থে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) সকলের জন্যই রহমতস্বরূপ ছিলেন। এক্ষেত্রে অমুসলিমদের জন্য বিশেষভাবে তার উদারতা ছিল অবারিত।

ইসলামী রাষ্ট্র তার অমুসলিম নাগরিকদেরকে যিম্মী বলে আখ্যায়িত করে থাকে। আরবী ভাষায় 'যিম্মী' শব্দটি নিশ্চয়তা অর্থে ব্যবহার করা হয়। যিম্মী মানে সংরক্ষিত নাগরিক। এটি সম্মানসূচক শব্দও বটে। যিম্মী এজন্য বলা হয় যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র এসব নাগরিকদের সংরক্ষণের দায়িত্ব নিজ কাঁধে গ্রহণ করেছে। এ দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্র আল্লাহ ও তার রাসুল (সা) এর পক্ষ থেকে নিয়েছে।

> 'ইসলামী রাষ্ট্র যেভাবে মুসলমানদের বেলায় কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক নির্ধারিত অধিকারসমূহের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে বাধ্য তেমনিভাবে সে যিম্মীদের ব্যাপারে ও কুরআন সুন্নাহর সীমারেখা মানতে বাধ্য অর্থাৎ যিম্মীদের অধিকার অবিচ্ছেদা। এগুলোর সংশোধন বা বাতিল করার অধিকার মুসলমানদের নেই।[২৩৫]

এতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিম নাগরিকদের অধিকারে কোনো রকম কমবেশ করতে পারে না। অথবা এদেরকে হেয় বা নীচ জ্ঞান করতে পারে না। আবার এদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কোনোরূপ অবহেলা করতে পারে

---

২৩৪ ইসলামে মানবাধিকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৭।

২৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

না। ইসলামের নীতি ও আদর্শ মোতাবেক 'প্রতিটি মানুষ মানুষ হিসেবে সুবিচার, দয়া ও উত্তম ব্যবহার লাভের অধিকারী।' [২৩৬]

ইসলামী রাষ্ট্রে যেসব অমুসলিম নাগরিক বাস করে তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

> 'মনে রেখ যে ব্যক্তি কোনো মুয়াহিদ (চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম) নাগরিকের প্রতি অত্যাচার করে, তাকে কষ্ট দেয়, তার সম্মানহানি করে অথবা তার কোনো সম্পদ জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, তা হলে কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করবো। [২৩৭]

কোনো অবস্থায় কোনো অমুসলিমের ওপর জুলুম ও অন্যায় আচরণ করা যাবে না। এমনকি অমুসলিমদের ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর কোনো হস্তক্ষেপ করা যাবে না। তারা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে। এমনকি কোনো অমুসলিম রাষ্ট্র সেখানকার মুসলিম নাগরিকদের ওপর যতই অবিচার অত্যাচার করুক না কেন, ইসলামী রাষ্ট্র তার কোনো অমুসলিম নাগরিকের প্রতি প্রতিশোধ নিতে পারবে না।[২৩৮]

অমুসলিমদের সাথে কী ধরনের ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে ঘরবাড়ী থেকে বহিষ্কার করেনি তাদের সাথে কল্যাণময় ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। অবশ্য আল্লাহ সুবিচারকদের পছন্দ করেন। যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘর বাড়ি থেকে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করতে পরস্পরকে সহযোগিতা করেছে, আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে তোমাদের নিষেধ করেছেন। এই লোকদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারা যালিম।'[২৩৯]

পবিত্র কুরআনের আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অমুসলিমদের কর্তৃক কৃত ব্যবহারের আলোকে তাদের সাথে ব্যবহার করতে আদেশ করেছেন, তারা যদি মুসলমানদের সাথে শত্রুতামূলক ব্যবহার করে তবে তাদের সাথে সেরূপ ব্যবহার না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

---

[২৩৬] দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৪৩।

[২৩৭] দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৩।

[২৩৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৩।

[২৩৯] সুরা মামতাহিনা, আয়াত ৮-৯।

'আর যখন তাদের ওপর বাড়াবাড়ি করা হয়, তখন তারা সেটার মোকাবেলা করে। মন্দের বিনিময় সে রকমেরই মন্দ। আর যে কেউ ক্ষমা করে এবং সংশোধন করে নেবে, তার পুরষ্কার আল্লাহর যিম্মায়। আল্লাহ যালেমদের পছন্দ করেননা। আর যারা যুলুমের পর প্রতিশোধ নেবে, তাদেরকে কোনোরূপ তিরস্কার করা যাবে না। তিরস্কার পাবার যোগ্যতো সে সব লোক, যারা অন্যদের ওপর যুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করে। এই লোকদের জন্যে রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি। অবশ্য যে ব্যক্তি সবর অবলম্বন করবে এবং ক্ষমা করে দেবে, তার একাজ নিঃসন্দেহে এক উচ্চমানের সাহসিকতার কাজ।[২৪০]

'যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরও অনুমতি দেয়া হয়েছে। কারণ তাদের ওপর যুলম করা হয়েছে। অবশ্য আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম।[২৪১]

'আল্লাহর পথে সেই সব লোকদের সাথে লড়াই করো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তবে সীমালংঘন করো না। কারণ আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। [২৪২]

'কাজেই যারা তোমাদের ওপর হাত তোলে, তোমরাও তাদের ওপর হাত তোলো ততোটুকু, যতোটুকু তারা তোলে। আর আল্লাহকে ভয় করবে। মনে রেখো, আল্লাহ তাদের সাথেই আছেন যারা সীমা লংঘন থেকে বিরত থাকে।'[২৪৩]

'কোনো বিশেষ দলের শত্রুরা তোমাদেরকে যেনো এতোটা উত্তেজিত করে না দেয়, যার ফলে) তোমরা ইনসাফ ত্যাগ করে বসো। ন্যায় বিচার করো। এটাই তাকওয়ার সাথে গভীর সামঞ্জস্যশীল। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করো। তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।[২৪৪]

'ভাল আর মন্দ সমান নয়। অন্যায় ও মন্দকে দূর করো সেই ভাল দিয়ে যা অতীব উত্তম। দেখবে তোমার সাথে যার শত্রুতা ছিলো, সে তোমার প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে। [২৪৫]

---

[২৪০] সুরা আশ শূরা, আয়াত ৩৯-৪৩।

[২৪১] সুরা আল হজ্জ, আয়াত-৩৯।

[২৪২] সূরা আল বাকারা, আয়াত-১৯০।

[২৪৩] সূরা আল বাকারা, আয়াত, ১৯৪।

[২৪৪] সূরা মায়িদা, আয়াত-৮।

[২৪৫] সুরা আসসাজদা, আয়াত-৩৪।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে তার অমুসলিমদের যে অধিকার দান করেছেন তা নিম্নরূপ:

ধর্মীয় অধিকার

ক) পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা: ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকগণ তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। এটি রাষ্ট্র কর্তৃক নিশ্চিত করা হবে। কেউ এতে ব্যাঘাত করতে পারবে না। যদি কেউ কোনো ধরনের বাধা সৃষ্টি করে তবে ইসলামী রাষ্ট্র তা প্রতিহত করবে। অন্য ধর্মের দেবদেবীদেরকে গালি দিতে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিষেধ করেছেন।

২) ধর্মীয় শিক্ষার অনুমতি: ইসলামী রাষ্ট্রে সরকার তার সকল নাগরিকদেরকে তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় শিক্ষা নিশ্চিত করবে। কাউকেও তার ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণে কোনোরূপ বাধা দেয়া চলবে না। রাষ্ট্র তার নিজ দায়িত্বে প্রত্যেক নাগরিকের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করবে।

গ) ধর্মীয় বই পুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশনার অনুমতি: প্রত্যেক ধর্মের লোকেরা তাদের ধর্মের বই পুস্তক প্রকাশ ও মুদ্রণের কাজ নির্বিঘ্নে করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, নিজেদের ধর্মীয় বই পুস্তক মুদ্রণের নামে অন্যের ধর্মীয় অনুভূতিতে কোনো প্রকার আঘাত দেয়া যাবে না।

ঘ) **ধর্মীয় আলোচনার সুযোগ:** প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীগণ তাদের নিজ নিজ ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজ করতে পারবে এবং ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা সভাও করতে পারবে।

ঙ) **ধর্মীয় উপাসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে:** ইসলাম যেহেতু অন্য ধর্মের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী অতএব অন্য ধর্মাবলম্বিগণ তাদের ধর্মীয় উপাসনালয় তৈরি করতে পারবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তা রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে।

সামাজিক অধিকার

ক) পারিবারিক আইনের রক্ষণাবেক্ষণে: অন্য ধর্মের লোকজন পারিবারিক আইন মেনে চলার ক্ষেত্রে তাদের ধর্মীয় আইনের অনুসরণ করতে পারবে। পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় আইনকে মেনে চলতে কোনো বাধা থাকবে না।

খ) জান, মাল ও ইজ্জতের হেফাজত: ইসলামী রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জান, মাল ও ইজ্জতের হেফাজতের ক্ষেত্রে মুসলমান অমুসলমানের মধ্যে কোনো পার্থক্য করবে না বরং সকল নাগরিককে একচোখে ও একদৃষ্টিতে দেখবে। ইসলামী সরকার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে তার নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তার বিষয়। তবে সকল নাগরিকের মধ্যে অমুসলিমদেরকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

গ) দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনে সমান অধিকার: ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানগণ ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনের চোখে যতখানি অধিকার ভোগ করবে অমুসলিমগণও ঠিক ততখানি অধিকার ভোগ করবে। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের কম বেশি বা বৈষম্য করা হবে না।

ঘ) আয় রোজগারের অধিকার: সরকারের সাধারণ কর্মকাণ্ডে মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্যহীনতা, অর্থনৈতিক কায়কারবারের ক্ষেত্রে মুসলমানদের ন্যায় যিম্মীদেরও রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সাহায্য লাভের ক্ষেত্রে সমান অধিকার।

পরিবেশ সংরক্ষণ

ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান (balance code of life)। পরিবেশ সংরক্ষণে অপ্রয়োজনে একটি গাছের পাতাও ছিঁড়তে ইসলাম নিষেধ করেছে। আবার প্রয়োজনে মানুষকেও হত্যা করতে হবে। একটি নতুন গাছ লাগানোকে সদকা (উত্তম কাজ) হিসেবে ইসলাম ঘোষণা করেছে।[২৪৬] রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা আজকের আধুনিক বিশ্বেও বিস্ময়কর। আল্লাহ প্রদত্ত গাইডবুক আল কুরআনের মাধ্যমে তিনি যে নৈতিক বিপ্লব সাধন করেছিলেন যা পরিবেশ সংরক্ষণের নিয়ামক শক্তি তা আজকাল শুধু নয়, কেয়ামত পর্যন্ত মানব জাতিকে পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষায় পথনির্দেশ দানে সক্ষম। আহমদ সুকার যথার্থই বলেছেন-The fundamental doctrine presented in the Quran is that human felicity in this and the other world is possible only through the understanding of the will of God manifest in the laws of human nature and science and their proper application through ethical, social action and an ethical constrained technology.[247]

ইসলাম স্বাধীনতাও দিয়েছে আবার সাথে সাথে বলেও দিয়েছে, 'আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক ভক্ষণ ও পান কর, পৃথিবীতে অনর্থক বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। [২৪৮]

পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন,

> 'তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠিকানা দিয়েছেন, তোমরা নরম মাটিতে অট্টালিকা নির্মাণ কর এবং পর্বতে গর্ত খনন করে প্রকোষ্ঠ নির্মাণ কর। অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থক বিপর্যয় সৃষ্টি কর না। [২৪৯]

---

[২৪৬] আবু দাউদ।

[২৪৭] ড. মোঃ ময়নুল হক, ইসলাম: পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ১২।

[২৪৮] আল কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত-৫৯।

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'আর যে পৃথিবীতে অনর্থক বিপর্যয় সৃষ্টি করতে প্রচেষ্টা চালায় আল্লাহ বিপর্যয়কারীদের পছন্দ করেন না[২৫০]

'আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক ভক্ষণ ও পান কর, পৃথিবীতে অনর্থক বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।[২৫১]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেছেন, পবিত্র কালামে পাকে আল্লাহ আলো বলেছেন, 'আর যখন সে বিমুখ হয় তখন চেষ্টা করে যাতে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে, ধ্বংস করতে পারে শস্যক্ষেত্র আর বংশধারা। আর আল্লাহ বিপর্যয়কারীকে পছন্দ করেন না।[২৫২]

পরিবেশ বিপর্যয়কারীদের সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে, 'তিন শ্রেণির অভিশপ্ত লোকদের থেকে বেঁচে থাক। পানির উৎসমূলে, চলাচলের রাস্তায় এবং ছায়ার স্থানে পায়খানাকারী ব্যক্তি।[২৫৩]

ইসলামে পারস্পরিক অধিকার

আল কুরআনে বলা হয়েছে,

> 'তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করোনা। মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করো। নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, প্রতিবেশী আত্মীয়, পাশাপাশি বসবাসকারী, ভ্রমণসঙ্গী, পথিক এবং তোমাদের অধীনস্তদের প্রতি উত্তম আচরণ করো।'[২৫৪]
>
> 'বরঞ্চ প্রকৃত নেক ও পূণ্যের কাজ হলো, মানুষ আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনবে। আল্লাহর ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের জানমাল আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, পথিক, সাহায্যকারী ও ক্রীতদাস মুক্তির জন্যে ব্যয় করবে। নামায কায়েম করবে। যাকাত দেবে। ওয়াদা করলে পূরণ করবে, দারিদ্র্য, সংকীর্ণতা, বিপদাপদ এবং সত্য মিথ্যার সংঘাতের সময় ধৈর্য ও অটলতা অবলম্বন করবে। প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্যপন্থী আর এরাই মুত্তাকী।[২৫৫]

---

[২৪৯] সূরা আল আরাফ, আয়াত-৭৪।

[২৫০] সূরা আল মায়েদা, আয়াত-৬৪।

[২৫১] সূরা আল বাকারা, আয়াত -৫৯।

[২৫২] সূরা আল বাকারা, আয়াত- ২০৫।

[২৫৩] পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, পৃ. ১৭৮-১৭৯।

[২৫৪] আল কুরআন, সূরা- আন নিসা, আয়াত-৩৬।

[২৫৫] সূরা আল বাকারা, আয়াত-১৭৭।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

'সে বাধা ডিংগাতে সাহস করেনি। আর সে বাধাটা সম্পর্কে তুমি কি জানো? কোনো ঘাড়কে (গোলামী থেকে) মুক্ত করা। অথবা ভুখা থাকার দিন কোনো আত্মীয় ইয়াতীমকে বা কোনো ধূলোমলিন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো। অতপর ঐ লোকদের মধ্যে শামিল হওয়া, যারা ঈমান এনেছে এবং পরস্পরকে সবর অবলম্বন করারও দয়া করার উপদেশ দিয়েছে। এরাই হচ্ছে ডানদিকের লোক।[২৫৬]

'যে ব্যক্তি তার ধনসম্পদ পবিত্র হবার উদ্দেশ্যে দান করে,সেই অতীব পরহেযগার ব্যক্তিকে (সেই আগুন থেকে) রক্ষা করা হবে। তার ওপর কারো এমন কোনো অনুগ্রহ নেই যার বিনিময় তাকে দিতে হবে। সেতো কেবল তার মহান রবের সন্তুষ্টি অন্বেষণের উদ্দেশ্যে (এ নেক কাজ করে)। অতি শীঘ্র তিনি তার ওপর রাজী হয়ে যাবেন।' [২৫৭]

'তাকে পাকড়াও করো। তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে দাও। অতপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। এরপর সত্তর গজ লম্বা শিকলে তাকে বাঁধো। কারণ সে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনি। আর মিসকীনকে খাবার খাওয়ানোর ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেনি। [২৫৮]

'আমরা নামাযি ছিলাম না। মিসকীনদের খাবার খেতে দিতাম না। সত্যের বিরুদ্ধে কথা রচনাকারীদের সাথে মিলে আমরাও অনুরূপ কথাবার্তা রচনা করে বেড়াতাম। তাছাড়া প্রতিফলের দিনকে আমরা অস্বীকার করতাম। [২৫৯]

'তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছো, যে প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করে? সে ব্যক্তিই তো ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় এবং মিসকীনকে খাবার দিতে উৎসাহ দেয় না।[২৬০]

'আল্লাহর সাথে শিক করার গুনাহ তিনি মাফ করবেন না। এ ছাড়া অন্য গুনাহ যাকে ইচছা মাফ করে দিবেন।' [২৬১]

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

'বদ আমল তিন ধরনের হবে প্রথমত: এক ধরনের আমল হবে যা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। এটা হচ্ছে আল্লাহর সাথে শিরুক করার আমল। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন: আল্লাহর সাথে শিক করার গুনাহ, তিনি ক্ষমা করবেন না।

---

২৫৬ সূরা আল বালাদ, আয়াত-১১-১৮।

২৫৭সূরা আল লাইল, আয়াত-১৭-২১।

২৫৮ সূরা আল হাক্কাহ-৩০-৩৪।

২৫৯ সূরা আল মুদ্দাসির, আয়াত-৪৩-৪৬।

২৬০ আল মাউন: আয়াত-১-৩।

২৬১ সূরা নিসা, আয়াত-৪৮।

> দ্বিতীয়ত এক ধরনের বদ আমল হবে তা যে ব্যাপারে আল্লাহ ছাড় দেবেন না। এটা হচ্ছে বান্দাহর পরস্পরের প্রতি যুলুম করার গুনাহ। এ ব্যাপারে একে অপরের কাছ থেকে স্বীয় অধিকার আদায় করে নেয়ার আগ পর্যন্ত ছাড়া হবেনা। তৃতীয়ত আরেক ধরনের বদ আমল হবে তা, যে ব্যাপারে আল্লাহ অধিকতর কড়াকড়ি করবেন না। এ হচ্ছে বান্দাহ কর্তৃক আল্লাহর অধিকার নষ্ট করার গুনাহ। এ গুনাহর ব্যাপারটি আল্লাহর হাতে। এর জন্যে তিনি ইচ্ছে করলে শাস্তি দিতে পারে কিংবা ক্ষমাও করে দিতে পারেন।[২৬২]

কেউ যদি তার ভাইয়ের প্রতি সম্মান ও মর্যাদাহানির মাধ্যমে যুলুম করে থাকে কিংবা তার কিছু নিয়ে তার ওপর যুলুম করে থাকে, তবে সে দিন আসার আগেই যেন সে ক্ষমা চেয়ে তা নিজের জন্যে বৈধ করে নেয়, যেদিন কারো কোনো অর্থকড়ি থাকবে না। যালিমের যদি নেক আমল থাকে, তবে যার অধিকার সে নষ্ট করেছিল, সে পরিমান সেখান থেকে অধিকারহারাকে প্রদান করা হবে। আর যদি তার কোনো নেক আমল না থাকে, তবে অধিকারহারার বদ আমলসমূহ তার ঘাড়ে চাপানো হবে।[২৬৩]

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন:

> 'তোমরা কি জানো দরিদ্র কে? তারা বললেন, আমাদের মধ্যে সেই দরিদ্র যার কোনো অর্থকড়ি ও ধন সম্পদ নেই। অতঃপর তিনি বললেন: আমার উম্মতের মধ্যে সেই দরিদ্র, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা এবং যাকাতের মতো বিরাট নেক আমল নিয়ে উত্থিত হবে। অপরদিকে দেখা যাবে, সে কাউকেও গালি দিয়ে এসেছে। কাউকেও খুন করে এসেছে। কাউকেও আঘাত করে এসেছে। ফলে তার নেক আমল থেকে অমুককে কিছু দেয়া হবে। কিন্তু তাদের দাবী পুরনোর আগেই যদি তার নেক আমল ফুরিয়ে যায় তবে তাদের বদ আমল তার ঘাড়ে চাপানো হবে। অতঃপর তাকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে। [২৬৪]

ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

বিশ্বব্যাপী মানবজাতির নির্যাতনের যদি শ্রেণি বিভাগ করা হয় তবে নারীদের অবস্থান হবে সর্বোচ্চ। এটি কোনো দেশ, সমাজ, কাল, ধর্ম বা ভূখণ্ডের সাথে জড়িত নয়। অনেকে বলে থাকে অর্থনৈতিক দুরাবস্থা, অশিক্ষা ও শিক্ষাহীনতাই এর জন্য দায়ী। কথাটি কতখানি যুক্তিযুক্ত তা বিচারের দাবি রাখে। কেননা প্রশ্ন

---

[২৬২] আল হাদিস

[২৬৩] আল হাদিস

[২৬৪] আল হাদিস

ওঠে যদি একথা ঠিক হয় এবং তর্কের খাতিরে আমরা মেনে নেই বাংলাদেশ শিক্ষা ও অর্থনৈতিক দু'দিক থেকেই অনগ্রসর হওয়ার কারণে এখানে নারী নির্যাতন করে। কথাটি সঠিক হলে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ এর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যখন স্ত্রীদের পিটিয়ে রক্তাক্ত করেন, মেয়ে অথবা ছাত্রীদের প্রেমে পড়ে নিজেদের ছেলে মেয়েদের পরিত্যাগ করেন ও স্ত্রীদের তালাক দেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের মত শিক্ষা, অর্থনৈতিক, সামাজিক রাজনৈতিকভাবে উন্নত হিসেবে পরিচিত দেশের নারীদের রক্তাক্ত ছবি যখন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তখন তাকে কীভাবে আখ্যায়িত করা যাবে বা এর জবাব কী হবে? আসলে নারী নির্যাতনের এ কাজটি সব যুগে নিজেদের হীনস্বার্থে এক শ্রেণির লোক করে থাকে। যার সাথে শিক্ষা ও অর্থনীতির সম্পর্ক খুবই কম। বরং অনৈতিকতা ও মানুষের স্বভাব প্রকৃতি এজন্য অনেকাংশে দায়ী।

বিভিন্ন দেশ, সমাজ ও ধর্মের নারী নিগ্রহের খানিকটা চিত্র তুলে ধরে আমরা ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা তুলে ধরার চেষ্টা করব। "প্রাচীন আরব দেশে নারীদের মতামতের কোনো মূল্য ছিল না। গৃহপালিত জন্তু জানোয়ারের মত তাদেরকে বেচাকেনা কিংবা জীবন্ত কবর দেয়াকে কৌলিণ্যের কাজ মনে করা হত। মেয়ে হওয়াকে আরবের পিতারা লজ্জাষ্কর বলে মনে করত।'[২৬৫]

'প্রাচীন সমাজে নারী জাতি ছিল অমঙ্গলের প্রতীক। প্রাক ইসলামী যুগে নারীদের বলা হতো শয়তানের যষ্টি, অমঙ্গলের অগ্রদূতী। কেউ ইচ্ছা করলে তার স্ত্রীকে অন্যের নিকট ঋণ দিতে পারতো। বিশ্বাস করা হতো নারীদের মানবীয় প্রতিভা নেই।'[২৬৬] কোনো কোনো সমাজে নারীদেরকে মোহের বাস্তবরূপ এবং মানবাত্মার নির্বাণ লাভের অন্তরায় মনে করা হতো। কোনো কোনো সভ্যতায় তাদেরকে 'সকল পাপের মূল উৎস, নারী নরকের দ্বার, মানুষের দুঃখের কারণ, শয়তানের মূখপাত্র, তীব্র বিষধর বিচ্ছু, পক্ষধর ভূজঙ্গের বিদ্বেষ ইত্যাদি হীনতম বিদ্বেষ হিসেবে ভূষিত করেছে।[২৬৭]

নারীজাতি সম্পর্কে এরকম আরো বহু কথা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে নারীকে মানবতার জন্য একটা দূর্বহ বোঝা মনে করতো। সেবিকা হিসেবে পরিবারের মানুষের সেবা করা ছাড়া তাদের ধারণা মতে নারী জাতির জীবনের আর অন্য কোনো লক্ষ্য ছিল না। যুক্তিবাদী গ্রীকদের ভাষায় 'অগ্নিদগ্ধ' হওয়ার

---

[২৬৫] আবদুল হাই, শেখ মুহাম্মদ: নারীর অধিকার, মাহবুব প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১২২।

[২৬৬] সরকার, সাহাব উদ্দিন: নারী নির্যাতনের রকমফের, ঢাকা, কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১১।

[২৬৭] প্রাগুক্ত।

এবং সর্প দংশনের প্রতিকার সম্ভব কিন্তু নারীর কুপ্রভাব ও অকল্যাণের প্রতিকার সম্ভব নয়।'[২৬৮] সভ্যতা, জ্ঞান, শিক্ষা ও যুক্তির শীর্ষস্থানে অবস্থানকারীগণের দৃষ্টিতে নারীদের অবস্থান কি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। একজন গ্রীক সাহিত্যিক বলেন, দু'টি ক্ষেত্রে নারী পুরুষের জন্য আনন্দের কারণ হয় এক হচ্ছে তার বিয়ের দিন এবং দুই তার মৃত্যুর দিন।[২৬৯]

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে খৃষ্টানদের এক ধর্মীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সাব্যস্ত হয়, নারীর আত্মা নেই এবং দোযখ হইলো তার বাসস্থান। মরিয়ম ইহার ব্যতিক্রম। নারী মানুষ কিনা এ বিষয় আলোচনার জন্য পরবর্তী শতাব্দীতে তাদের অপর একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সিদ্ধান্ত হয়, নারী মানুষ বটে, তবে পুরুষের কল্যাণ ও দাসত্বের জন্যই তাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে।[২৭০]

প্রখ্যাত গ্রীক চিন্তাবিদ ভেবেচিন্তে বলেন, আমরা যৌন তৃপ্তির জন্য বেশ্যালয়ে যাই এবং সন্তান উৎপাদনের জন্য স্ত্রী গ্রহণ করি। গ্রীক সভ্যতায় সর্বপ্রকার অত্যাচারের পাশাপাশি তারা তাদের দেবতার কাছে অনুশোচনা করতো এই বলে যে, একই সূর্যের নীচে পুরুষের সাথে নারীকে কেন দেয়া হলো, নারীর চেয়ে দুনিয়ায় আর কোনো নিকৃষ্ট বস্তু নেই। এই ছিল খ্যাতনামা সক্রিটিসের বক্তব্য।"[২৭১]

কিশ্বকোষ ব্রিটানীকায় উল্লেখ আছে, 'সপ্তদশ শতাব্দীতে রোমের পাদরীবর্গ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, নারীজাতির আত্মা নেই। সুতরাং তারা স্বর্গে প্রবেশ করবে না।[২৭২] এ থেকে বুঝা যায় খৃষ্ট ধর্মে নারী কোন্ চোখে দেখা হত।

বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর। সত্যিই তাই। পৃথিবী নামক মহাবিশ্বে নরনারী একসাথে বসবাস করছে। উভয়েই একই বৃন্তের দু'টি ফুল। আর ইসলামে তো নারী-পুরুষে কোনো প্রকার বৈষম্য নেই। ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এতে নরের জন্য যেমন বিধি-নিষেধ রয়েছে, দিক নির্দেশনা রয়েছে তেমনি নারীর জন্যও রয়েছে সুস্পষ্ট জীবন নীতিমালা। কারো কাছে কাউকে ছোট করা হয়নি ইসলামে। বরং যার যার অবস্থানে সে মর্যাদাবান। পৃথিবীর অপরাপর ধর্মের সাথে তুলনা করলে দেখা যায়

---

[২৬৮] জালালুদ্দিন উমরী, সাইয়েদ: ইসলামী সমাজে নারী, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃ. ২৩।

[২৬৯] প্রাগুক্ত, পৃ-২৩।

[২৭০] আব্দুল খালেক: নারী নারী নির্যাতনের রকমফের, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ১৪।

[২৭১] নারী নির্যাতনের রকমফের, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩।

[২৭২] নারী অধিকার, পূর্বোক্ত।

ইসলামই নারীকে সর্বোৎকৃষ্ট মর্যাদার আসনে আসীন করেছে। মুসলমান নারী-পুরুষ উভয়ই সমান অধিকারের দাবীদার।

মানবতার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ঘোষণা করেছেন নারী পুরুষ সম অধিকার।' বিদায় হজ্জের ভাষণে নবী (সা) দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন: 'হে আমার উম্মতেরা কোনো, নারী জাতির কথা ভুলো না। নারীর ওপর পুরুষের যেরূপ অধিকার আছে, পুরুষের ওপর নারীরও সেরূপ অধিকার আছে।'

বর্ণিত হাদিসের আলোকে বলা যায় ইসলামে সংকীর্ণতার স্থান নেই আবার বল্গাহীনতারও ছাড় নেই। পবিত্র কুরআনে ইসলাম, ইসলামী জীবন বিধান ও শরীয়তকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব ধরনের সংকীর্ণতামুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন, 'তোমাদের জন্য ইসলামে কোনো জটিলতা ও সংকীর্ণতা রাখা হয়নি।' অতএব মুসলিম নারীর জীবন, কর্মতৎপরতা, তার সম্মান-মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষণে কোনো ধরনের বাঁধার অবকাশ নেই।

নারীর স্বাধীন ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন, সমাজ জীবনে তার অংশগ্রহণ এবং পুরুষের সাথে তার অপরিহার্য সাক্ষাতের বিষয়টি শরীয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং রাসূল (সা) তা বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। ইসলামী জীবন বিধানের অনুসারী একজন নারী নির্ধারিত বিধি-নিষেধ অথচ কল্যাণকর নির্দেশিকা মান্য করে পুরুষের পাশাপাশি বৈধ সকল প্রকারের কর্মতৎপরতায় অংশ নিতে পারে। এ অধিকার ইসলাম তাকে দিয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সা)স্বীকৃত মর্যাদায় মুসলিম নারীরাই ভ্রান্ত পথে পরিচালিত (miss guide) হচ্ছে। এর ফলে মুসলমানরা আজ ষড়যন্ত্রের শিকার।

ইসলাম নারীকে ভারসাম্যপূর্ণ কল্যাণময় জীবন ব্যবস্থার প্রতি উৎসাহিত করেছে। নারীকে দিয়েছে সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা-দীক্ষা, আইনগত অধিকার। এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে অন্যান্য ধর্ম ও ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করা ব্যঞ্জনীয়।

রোমান সমাজে নারীর অবস্থান

প্রাচীন রোমান সমাজে নারীর দণ্ডমুণ্ডের অধিকারী ছিলেন পরিবার প্রধান। সন্তান মেয়ে হলে তাকে আজীবন পিতার অনুগত থাকতে হতো। সন্তানের ন্যায় নিজের স্ত্রীর ওপর, নিজের পুত্রদের স্ত্রীদের ওপর এবং পৌত্রদের স্ত্রীদের ওপরও পরিবার প্রধানের কর্তৃত্ব বজায় থাকত। এই কর্তৃত্ব বলতে বুঝাতো বিক্রি করার অধিকার, বহিষ্কার করার অধিকার, শাস্তি দেয়ার অধিকার, এমনকি হত্যা করার অধিকারও। পরিবার প্রধানই এককভাবে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতো এবং এ ব্যাপারে তাদের

মতামতের আদৌ কোনো অধিকার থাকতো না। পরিবার প্রধান মারা গেলে বয়োঃপ্রাপ্ত পুত্র সন্তান স্বাধীন হয়ে যেত। কিন্তু যুবতী কন্যা স্বাধীন হতো না। বিয়ে হয়ে গেলে নারীর নিরংকুশ কর্তৃত্ব অর্পিত হত একটি সার্বভৌমত্ব চুক্তি, অপচুক্তির মাধ্যমে। এ সমাজে নারীর আইনগত অধিকার ছিল শর্ত সাপেক্ষে। দাসদাসী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুরা, বালক-বালিকা, বুদ্ধিতে অপরিপক্ক ঋণগ্রস্ত, ঋণগ্রস্ত প্রাপ্ত বয়স্কা কন্যা ও স্ত্রীগণ। অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে ঋণগ্রস্ত ও অভিভাবকের আশ্রিত স্বাধীন প্রাপ্তবয়স্কা নারীগণ। [২৭৩]

হিন্দু ধর্মে নারী

হিন্দু ধর্মে নারীর স্বাধীনতা বলতে কিছুই ছিল না। এ ধর্মে এখনো নারীর উত্তরাধিকারের কোনো স্বীকৃতি নেই। সতীদাহ প্রথা, গঙ্গায় কন্যা নিক্ষেপের বিবরণ আজো ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যায়নি। পবিত্র ধর্মের নামে আজো বিধবা ও নারী নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। এ ধর্মে বিধবাকে চিরকালের জন্যে তার জৈবিক ক্ষুধা মেটানোর মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। হিন্দু ধর্মে বৈদিক যুগে নারীর অধিকার তুলে ধরে বিশ্বকোষ ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে in India subjection was a cardinal principle. Day and night must women be held by their protection in a state of dependence, says Manu. The rule of inheritance was agnatic, that is descenttraced through males to the exclusion of Females.[274]

অনুবাদ: হিন্দুস্থানে পরাধীনতা ছিল নারী ধর্মের মৌলিকতত্ত্ব। নারী জাতির মূল বৈশিষ্ট্য। মনু বলেছেনঃ নারী জাতিকে অভিভাবক কর্তৃক সদাসর্বদা পরনির্ভরশীল করে রাখা হবে। উত্তরাধিকার আইন ছিল পৈত্রিক অর্থাৎ পুরুষই পৈত্রিক চিহ্নিত সম্পদের উত্তরাধিকার হতো, বংশানুক্রমে নারী কর্তৃক নয় বরং পুরুষ চিহ্নিত হতো। কোনো কোনো হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বলা আছে: বিষ, সাপ, আগুন, মৃত্যু, নরক, ঝড় ও বন্যা এসব কোনো কিছুই নারীর চেয়ে খারাপ নয়। কোথাও কোথাও নারীকে দেবতার তুষ্টি সাধন অথবা কৃষি ও ভালো ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হতো। ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে একটি বিশেষ গাছের গোড়ায় প্রতি বছর একটি করে যুবতী মেয়েকে বলি দেয়ার রেওয়াজ চালু আছে।

চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেদবানীতে নিম্নোক্তভাবে নারীর বর্ণনা করেছেন।

---

[২৭৩] রোমান আইনের ইতিহাস, দাওয়ালিবী মারুফ, গ্রীসের নারী ও রোমান সমাজে নারী, মাহমুদ সালাম জান্নাতী দ্রষ্টব্য

[274] The Encyclopedia Britannica, 11th ed., 1911, Vol.28, p.782

'বৈদিক যুগে বহু যুবতীর বিবাহ হতো না। তারা কুমারী অবস্থাতেই পিতৃগৃহে থাকতো। বিকলাঙ্গ কন্যাদের বিবাহ হতো না। বিয়ে হয়ে গেলে কন্যার পৈত্রিক সম্পত্তিতে তার অধিকার থাকত না। এ জন্যে কন্যার ভ্রাতারা ভগ্নির বিবাহ দিতে বেষ্টিত থাকতো বিধায় প্রায়ই স্বামীর ভ্রাতাকে বিয়ে করতো। এজন্যে স্বামীর ভ্রাতার নাম হয়েছিল দেবর (দ্বিতীয় বর)। পুরুষেরা বহু বিবাহ করতো। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ব্যভিচারই নিন্দনীয় ছিল। কন্যাহরণ করেও বীরগণ বিয়ে করত। বিধবা হলে পত্নী পতীর চিতায় শয়ন করে দেবরের আহ্বানে উঠে আসতো ও পতির শবদাহ করতো।"[২৭৫] তবে হিন্দু ধর্মে যে নারীর অধিকার নেই তা নয়। অবশ্য ইসলাম ধর্মের তুলনায় নূন্যতম।

খৃষ্ট সমাজে নারী

খৃষ্ট সমাজে নারীকে যাবতীয় অসৎকর্মের মৃণাল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। নারীই হচ্ছে যাবতীয় অধঃপতনের জন্য দায়ী। তারতোলিয়ান নামক জনৈক যাজক বলেছেন: নারী হচ্ছে মানুষের হৃদয়ে শয়তান প্রবেশেরসিংহদ্বার। নারী হচ্ছে আল্লাহর বিধান ভঙ্গকারী এবং আল্লাহর চেহারা বিস্তৃতকারী।"

মোষ্কাক নামক আরেক যাজক বলেন: 'নারী এক অনিবার্য আপদ' এক লোভনীয় আপদ। পরিবার ও সংসারের জন্য হুমকি। মোহনীয় মোড়কে আবৃত বিভীষিকা।'[২৭৬]

খৃষ্ট ধর্মে নারীকে যাবতীয় পাপের আদিকাররূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বাইবেলে পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত আছে, 'নারীর পাপের দরুণই তার ওপর পুরুষকে কর্তৃত্ব করবার অধিকার দেয়া হয়েছে। অন্য জায়গায় বাইবেলে নারীকে পুরুষ লোভী বর্ণনা করা হয়েছে। I will greatly multiply your pair in child searing, in pair you shall bring forth childrens yet your desire shall be for your husband and he shall role over your:[277]

গর্ভধারণে তোমাদের ব্যথা অত্যন্ত বৃদ্ধি করে দিব। এই ব্যথায়ই তোমরা সন্তান প্রসব করবে। তথাপি তোমরা তোমাদের স্বামীর সংসর্গ কামনা করবে এবং তোমাদের ওপর শাসন করবে। তেমনিভাবে খৃষ্ট ধর্মে নারীকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। খৃষ্ট ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ড্যাভিড ও ভ্যারা ম্যাক তাদের লিখিত

---

[২৭৫] দেববাণী, পৃ. ৩২৪-৩২৭।

[276] The Bible: Genesis B: 16, New York, 1973.

[277] Libra: Womanhood and the Bible, New York, p.18.

পুস্তক Marriage East and West এ লিখেছেন তার চুষ্টকায় অংশগুলি ব্যাখ্যা করলে পাওয়া যায়।

Woman was represented as the door of hell.
নারীজাতি নরকের দরজায় প্রতীকস্বরূপ।

The Mother of the human ills.
সে মানবীয় সকল অনিষ্টের কারণ।

She should be ashamed that she is a woman.
নারী জন্মের পর তাকে সদাসর্বদা লজ্জিত থাকা উচিত।

She should live Ibn continul penance on account of the coures brought upon the world.
যে অভিশাপ নারী দুনিয়াতে বয়ে এনেছে তার জন্য তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে থাকতে হবে।

She shall be ashamed of her dress. for it is the memorial of her fall.
তার পোশাকই তার অধঃপতনের স্বতিচিহ্ন তার পোষাকের জন্য তাকে সদাসর্বদা লজ্জিত থাকা উচিত।

You are the deuils gate cuay.
ও নারী জাতি! তুমিই শয়তানের প্রবেশদ্বার।

You are the unsealer of that forbidden tree.
তুমিই সর্বপ্রথম সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলে। সে গাছ সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতিনী।

You are the first deserters of the divine low.
তুমিই স্বর্গীয় বিধানের সর্বপ্রথম অমান্যকারিণী।

বৌদ্ধ ধর্মে নারী

বৌদ্ধ ধর্ম মতে নারী নির্বাণ লাভের অন্তরায়। নারী হলো সকল অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ। এ বর্ণনা দিতে যেয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক Westermark বলেনঃ Woman are of the all the snares which the tempter has apread from men. The most dangerous in women are embodied all the powers of information which blind the mind of the world.[278]
মানুষের জন্য প্রলোভন যতগুলি ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপদজনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গিভূত হয়ে আছে যা সমগ্র বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়। বৌদ্ধ পণ্ডিত Bettary তাঁর Words

[278] Nazhat Afza and kharshid Ahmad: Ibid, p.12-13

Religious গ্রন্থে নারী সম্পর্কে বলেনঃ Ubfathomably deep like a fish's course in the water is the character of woman, robed with many artifices, with whom truth and the truth is like a lie [২৭৯]
পানিতে মাছের গতিপথের গভীরতা যেমন বর্ণনা করা সম্ভব নহে, নারীর চরিত্র হলো তেমনি নিবিড় যা বহুবিধ ছলনায় আচ্ছাদিত। তার মধ্যে সত্য পাওয়া দুষ্কর। তার নিকট সত্য সদৃশ এবং সত্য মিথ্যাসম। এমনিভাবে নারীদের বৌদ্ধ ধর্মেশুধুই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হতো।

ইহুদি ধর্মে নারী

ইহুদি জাতির কোনো কোনো গোষ্ঠিতে মেয়েকে দাসির পর্যায় রাখা হয়। তার পিতা তাকে বিক্রি করে দিলেও দিতে পারে। কেবল পুত্র সন্তান না থাকলেই মেয়ে সন্তান পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায়। আর জীবদ্দশায় পিতা কর্তৃক কোনো সম্পত্তি প্রদত্ত হয়ে থাকলে তাকে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ইহুদি সমাজে নারীই সকল দুর্নীতির উৎস। পুরুষ হতে নারী অতি নিকৃষ্ট। এমনকি মর্যাদায় নারী চাকরদের অপেক্ষাও নিম্নস্তরের বলে গণ্য হত। অপ্রাপ্ত বয়স্কা অবস্থায় কন্যাকে বিক্রয় করার পূর্ণ অধিকার পিতার ছিল। বিবাহিত স্ত্রীর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হত স্বামী। ইহুদি সমাজে বৈবাহিক কোনো বন্ধন ছিল না। যা ছিল তা হলো অনেকটা যৌতুকের ব্যবসা। বিবাহের জন্য রাষ্ট্রনীতি বা সামাজিক বাধ্যবাধকতা ছিল অনুপস্থিত। শুধু সন্তান উৎপাদনই ছিল বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য। বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এছাড়াও স্বামী যত ইচ্ছা উপ-পত্নী রাখতে পারতো। তদুপরি অবিবাহিতা দাসী এমনকি চুক্তিতে আবদ্ধ বিবাহিতা নারীদের সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অধিকারও তার ছিল। এসব কাজ করেও সে ব্যাভিচারী বলে গণ্য হতো না।

ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

জগতের অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতা নারীদের সাথে কি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে এবং কি নির্দয়ভাবে তাঁদের অধিকার খর্ব করেছে এবং সামান্য অপরাধে কীভাবে খারাপ বিশেষণে বিশেষায়িত করেছে তা সংক্ষিপ্তভাবে উপরে উল্লিখিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামে নারী অধিকার কত সমুন্নত তা আলোচ্য লেখায় বিস্তারিত বর্ণনার আগে সংক্ষিপ্তরূপে নিম্নে কুরআন ও হাদিসের আলোকে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ- দুনিয়ার বিভিন্ন ধর্মে ও বস্তুবাদী সভ্যতা নারীজাতির ওপর পাপ ও

[279] The Encyclopedia Britanica, vol. 5, p. 732

অপবিত্রতার যে কলঙ্ক লেপন করেছে ইসলাম এক ফুৎকারে তা লেপেমুছে দিয়েছে। ইসলাম ঘোষণা করছে নারী ও পুরুষ একই উৎস থেকে উদ্ভুত। অতএব নারী পাপী বলে পরিগণিত হলে পুরুষও পাপী বলে গণ্য হওয়া উচিত। আর পুরুষের ঘরে মহত্বের কোনো স্ফুলিঙ্গ থেকে থাকলে নারীর মধ্যেও তা বিদ্যমান। খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীরা বলেন, নারী হৃদয়হীন জন্তু এবং তাকে যৌন অনুভূতিহীন ভাবেই সারা জীবন অতিবাহিত করতে হবে। ইসলাম তাদের এই দাবিও খণ্ডন করেছে। পবিত্র কুরআন দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে-

> 'নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী, বিনীত পুরুষ ও অনুগত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী তাদের সকলের জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা ও মহা প্রতিদান রেখেছেন।'[২৮০]

নারীই সর্বপ্রথম প্রতারিত হয়েছে। সুতরাং নারীই হযরত আদম (আ.) এর পতনের জন্য দায়ী। বাইবেলের এই উক্তির অসারতা প্রমাণ করেছে ইসলাম। ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে- হযরত আদম (আ) এবং হযরত হাওয়া (আ) উভয়ই যুগপৎভাবে প্রতারিত হয়েছেন। সুতরাং তাঁরা উভয়ই পতনের জন্য সমানভাবে দায়ী। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন-

> 'আর আমি বললাম হে আদম (আ) তুমি ও তোমার সহধর্মীনী বেহেশতে বসবাস কর এবং যা ইচ্ছা আহার কর। তবে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না। হলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু শয়তান ইহা হতে তাদের পদস্খলন ঘটাইল এবং তারা যেখানে ছিল, সেখান হতে তাহাদের বহিকার করল। [২৮১]

না পুরুষ না নারীর জন্য এবং নারী পুরুষের জন্য সৃষ্টি হয়েছে, খৃষ্ট ধর্মের এই ঘোষণার বিপরীতে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা হয়: তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের পোষাক এবং তোমরা স্বামীগণ তাদের পোষাক।[২৮২] অর্থাৎ পোষাক ও দেহের মধ্যে যেন কোনো আবরণ থাকে না বরং উভয়ের পরস্পরের সম্পর্ক ও মিলন একেবারে অবিচ্ছেদ্য। তদ্রুপ সম্পর্কই তোমাদের ও তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্যে বিরাজমান রয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক আরও বলেন–

---

[২৮০] আল কুরআন, সূরা আল বাকারা, আয়াত-৩৩-৩৫।

[২৮১] সুরা বাকারা, আয়াত: ৩৩-৩৬।

[২৮২] বাকারা, আয়াত: ১৮৭।

> 'হে মানব। তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর তোমাদেরকে এক ব্যক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে, তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাঁদের দুজন হতে বহু নর নারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করেছেন। [২৮৩]

পবিত্র কুরআন নারী পুরুষের সমঅধিকারে বিশ্বাসী। আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন–

> 'নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের ওপর পুরুষের কিছুটা মর্যাদা আছে, আর আল্লাহ তা'য়ালা মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[২৮৪]

কোনো কোনো ধর্মে নারীকে (শয়তানের অঙ্গ) বলে অভিহীত করেছে। কিন্তু ইসলামে নারী শয়তানের অঙ্গ নহে, বরং ইসলাম নারীকে মুহসানাহ যা সুরক্ষিত দুর্গ বলে আখ্যায়িত করেছে। রাসূল (সা) বলেন: 'মাতার পদতলে সন্তানের বেহেশত।' [২৮৪]

এতে নারীজাতিকে অতীব উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন। তিনি আরও বলেনঃ 'যে ব্যক্তিবিবাহ করল সে ধর্মের অর্ধেক সম্পন্ন করল।[২৮৫]

তিনি নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে আরো বলেন–

> 'আল্লাহ তা'য়ালা নারীদের প্রতি সম্মানের সহিত আচরণ করতে আমাদের আদেশ করেছেন। কারণ তারা সমাজের মাতা, কন্যা, ফুফু, খালা, মামী, চাচী ইত্যাদি, দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুর মূল্য আছে। কিন্তু জগতে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হলো ধার্মিক নারী। [২৮৬]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন-

> 'আর তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে অপর একটি নিদর্শন এই, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। চিন্তাশীল সমপ্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।' [২৮৭]

---

[২৮৩] সূরা আন নিসা, আয়াত-১।

[২৮৪] বাকারা, আয়াত-২২৮।

[২৮৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

[২৮৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

[২৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

নারীদের প্রতি উত্তম ব্যবহারের গুরুত্ব

১. প্রেম প্রীতির সহিত তাদের সঙ্গী হয়ে থাক। তোমরা তাদেরকে ঘৃণা করলে হতে পারে যে, তোমরা যে বস্তুকে ঘৃণা কর, তাতেই আল্লাহ তা'য়ালা অনেক কল্যাণ রেখেছেন।

২. তোমাদের মধ্যে তাঁরাই উত্তম, যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে।

৩. মুসলমান অবশ্যই তার স্ত্রীকে ঘৃণা করবেনা। সে যদি তার কোনো মন্দ স্বভাবের জন্য অসন্তুষ্ট

হয়ে থাকে, তবে সে যেন তার মধ্যে যে সৎ স্বভাব রয়েছে, তাতে সন্তুষ্ট থাকে।

রাসূল (স) এ বিষয়ে বলেন, তিনি আরও বলেনঃ 'যে মুসলমান তার স্ত্রীর প্রতি যত ভদ্র ও সদাশয়, তার ঈমান ততই পূর্ণতা লাভ করেছে।' [২৮৮]

তিনি আরও বলেন, 'নারীদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর।'

'তাকওয়ার পর মু'মিনের সর্বোত্তম সম্পদ হলো ধার্মিক স্ত্রী, যে স্বামীর আদেশ মেনে চলে।'

মেয়েকে তার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দেয়ার অধিকার ইসলাম অনুসারে মাতাপিতা এবং আত্মীয়- স্বজন কারো নেই। আর ইসলামই স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে স্ত্রীকে সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার প্রদান করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন:

'মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে। তা অল্প হউক আর বেশী হউক। (স্ত্রীদের জন্য) তা নির্ধারিত অংশ রয়েছে। [২৮৯]

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কঠোর নির্দেশ রয়েছে। কুরআনে ঘোষণা হচ্ছে-

'আমি মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের সঙ্গে গর্ভে ধারণ করে এবং বেদনার সঙ্গে প্রসব করে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং তার স্তন্য পান ছাড়াতে সময় লাগে ত্রিশ মাস।[২৯০]

---

[২৮৮] সূরা আর রূম, আয়াত-২১।

[২৮৯] নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪।

[২৯০] সূরা আন-নিসা, আয়াত-৭।

'আমি মানুষকে তো তার মাতাপিতার সহিত সদাচারণের নির্দেশ দিয়েছি।[২৯১] মাতা সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার স্তন্য পান ছাড়াতে ২ বৎসর অতিবাহিত হয়। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করবে।[২৯২]

'তোমাদের প্রতিপালক তিনি ব্যতিত অন্য কারও উপাসনা না করতে এবং মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন। তাদের একজন বা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলেও তাদের প্রতি বিরক্তিসূচক কিছু বলিও না এবং তাঁদেরকে ভর্ৎসনাও করিও না। তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক নম্র কথা বলবে। আর তাঁদের প্রতি বিনয় ও নত থাকিও এবং বলিও, হে আমার প্রতিপালক, তাঁদের প্রতি দয়া কর, যেভাবে শৈশবে তারা আমাদের প্রতিপালন করেছেন।'[২৯৩]

'এবং যখনই তোমরা স্ত্রীদিগকে তালাক দাও ও তারা ইদ্দত পূর্তির নিকটবর্তী হয়, তখন তাদিগকে বিধিমতে বহাল কর অথবা তাহাদেরকে ভালভাবে বিদায় দাও। তাদের ওপর নির্যাতনবা বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটক করে রেখো না। যে ব্যক্তি এমন করে সে নিজেরই ক্ষতি করে। [২৯৪]

'হে ঈমানদারগণ! জোরজবর-দস্তির সহিত নারীদেরকে তোমাদের উত্তরাধিকার গণ্য করা বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে যাহা দিয়েছ তা হতে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদের ওপর জবরদস্তি করোনা। যদি না তারা প্রকাশ্যে ব্যভিচার করে। তাদের সহিত সৎভাবে জীবন যাপন কর। তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর, তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন অথচ তোমরা তা ঘৃণা করছো।[২৯৫]

নারী পুরুষে সাম্য

নারী-পুরুষে সাম্য ঘোষণা করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন:

'ঈমানদার অবস্থায় যে কেউ সৎকর্ম করবে। পুরুষ হোক বা নারী হোক তাকে আমি অবশ্যই পবিত্রজীবন দান করব এবং তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাদেরকে দিব।[২৯৬]

---

[২৯১] সূরা আল-আহকাফ, আয়াত- ১৫।

[২৯২] সূরা লোকমান, আয়াত-১৪।

[২৯৩] সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত-২৩-২৪

[২৯৪] সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত-২২

[২৯৫] সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত-১৯

[২৯৬] সূরা আন-নাহল, আয়াত-৯৭

'অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের কর্মনিষ্ঠ বানারীর কর্ম বিফল করিনা। তোমরা পরস্পর সমান।' [২৯৭]

'পুরুষ যা উপার্জন করে তা তাহার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা উপার্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ।[২৯৮]

'ঈমানদার নর-নারী পরস্পর বন্ধু তারা সৎকর্মের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্য প্রতিরোধ করে। যথাযথভাবে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের (সা) প্রতি আনুগত্য করে, তাদেরকে আল্লাহ কৃপা করেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[২৯৯]

নারীর পারিবারিক অধিকার

একজন নারীর পারিবারিক জীবনাবস্থা ভেদে পরিবর্তনশীল। একজন নারী পারিবারিক জীবনে কখনো কন্যারূপে, কখনো বোন রূপে, কখনো স্ত্রী রূপে আবার কখনো মা রূপে অবস্থান করে। এই রূপভেদে নারী প্রত্যেক সময় এক এক অধিকার লাভ করে থাকে।

কন্যা রূপে নারী

আইয়ামে জাহিলিয়ার যুগে কন্যা সন্তানকে পাপিষ্ঠ বলে জ্যান্ত কবর দেয়া হতো যখন ইসলাম আরবের প্রান্তরে বিজয়ী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হলো, তখন রাসূল (সা) কন্যা সন্তান জ্যান্ত কবর দেয়ার জোর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করেন। পবিত্র কুরআনে কন্যা সন্তানকে হত্যা করার জঘন্য প্রথাকে শাস্তিযোগ্য ঘোষণা করে, যে কোনো প্রকার নর হত্যার মত অপরাধ বলে গণ্য করে এবং এ প্রথাকে নিষেধ করে দেয়। আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন: আল্লাহ আরও বলেন: আর যখন জীবন্ত প্রোথিত (শিশু) কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হলো? [৩০০]

দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ।[৩০১]

কন্যা শিশু, পুরুষ শিশু সবই আল্লাহর দান। আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাদের সতর্ক করছেন এ বলে যে, তোমার কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হলে অনীহা প্রকাশ করোনা। আল্লাহ পাক বলেন:

---

[২৯৭] সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৯৫

[২৯৮] সূরা আন-নিসা, আয়াত-৩২

[২৯৯] সূরা আত-তওবা, আয়াত-৭১

[৩০০] সূরা আত-তাকবীর, আয়াত-৮-৯

[৩০১] সূরা বনী-ইসরাঈল, আয়াত-৩১

'আকাশমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই। তিনি যাহা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা তিনি কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দিয়ে থাকেন। অথবা দান করেন পুত্র কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশক্তিমান।[৩০২]

তাহাদের কাহাকেও যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কাল হয়ে পড়ে এবং সে অসহনীয় যন্ত্রণাতে ক্লিষ্ট হয়। তাকে সে সংবাদ দেয়া হয়, ইহার গ্লানিতে সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে (সে চিন্তা করে) হীনতা সত্ত্বেও তাকে রেখে দিতে, না মাটিতে পুঁতে দিবে। সাবধান তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কত নিকৃষ্ট। হযরত মুহাম্মদ (সা) বলছেন: 'যখন তোমরা বাইরে যাও, বাসায় ফেরার সময় কিন্তু না কিছু উপহার নিয়ে এসো, বাসায় এসে উপহার আগে কন্যাকে দিবে।' [৩০৩]প্রিয় নবী (সা) আরও বলেছেন-'তোমরা মেয়েকে গালি দিওনা, কারণ আমি মুহাম্মদ মেয়েদের পিতা।[৩০৪]

নবী (সা) আরো বলেছেনঃ 'তাকে উত্তমরূপে শিক্ষা দান করে, লালন-পালন করে এবং তার ওপর আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত সম্পূর্ণ করে, সেই কন্যা তার জন্যে ডানে-বামে দোষখের আড়াল হয়ে তাকে বেহেশতে পৌছাবে'। [৩০৫]

স্ত্রীরূপে নারীর অধিকার

ইসলাম নারীকে যত অধিকার ও স্বাধীনতা দিয়েছে অন্য কোনো ধর্ম বা জাতি তার অংশবিশেষ দিতে পারেনি। নারীজাতি তার যথাযোগ্য অধিকার একমাত্র ইসলামেই পেতে পারে, অন্য কোথাও নয়। যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ:

ক) ইসলাম নারীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শয্যা সুখ ভোগের অধিকার দিয়েছে। বিয়ে করতে উৎসাহ দিয়েছে।

খ) নারীকে স্বামী বেছে নেয়ার, বিয়েতে অনুমতি দেয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সমান অধিকার দেয়া হয়েছে।

গ) স্বামীর সাথে বনিবনা না হলে ইসলাম নারীকে তালাক দেয়ার অনুমতি দিয়েছে, আরো কত কিছু। স্ত্রীর ওপর স্বামীর যে রকম অধিকার রয়েছে, স্বামীর ওপরও তেমনি অধিকার রয়েছে স্ত্রীর।

---

[৩০২] সূরা আশ-শুরা, আয়াত-৪৯-৫০।

[৩০৩] আল হাদিস

[৩০৪] আল হাদিস

[৩০৫] আল হাদিস

> 'নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষের। কিন্তু নারীদের ওপর পুরুষের কিছুটা মর্যাদা আছে। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৩০৬]

যে যুগে নারীর কোনোই অধিকার ছিল না, সে যুগে ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সা) এসে পুরুষ জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলে দিলেন:

> 'হে আমার উম্মাতরা। নারী জাতির কথা ভুলোনা। নারীর ওপর পুরুষের যেরূপ অধিকার আছে, পুরুষের ওপর নারীও সেরূপ অধিকার আছে। তাদের প্রতি অত্যাচার করো না। মনে রেখো, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদিগকে গ্রহণ করেছ।'[৩০৭]

বর্বর যুগে মানুষ নারীকে ঘরের আসবাবপত্র ও গৃহপালিত জন্তু-জানোয়ারের মত মনে করে। আবার বর্তমান পশ্চিমা জগতের মানুষগুলো নারীকে পুরুষের সাধারণ কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়ার অনবরত চেষ্টা চালাচ্ছে। ইসলাম উভয় পন্থাকেই নিন্দা করে। ইসলাম মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। কুরআন অত্যন্ত পরিস্কার করে দেখিয়ে দিয়েছে যে, নারী জাতি কমপক্ষে পারিবারিক, সামাজিক ও মানবীয় জীবনে পুরুষের ভোগের বস্তুও নয়। আবার বল্গাহীন করে ছেড়ে দেয়ার মতও নয়।

নারীর স্বভাব প্রকৃতি পুরুষের স্বভাব প্রকৃতি থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের। যেমন নারী জাতিকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন অপেক্ষাকৃত দুর্বল করে, নমনীয়, কমনীয় ও কোমল হৃদয় করে। অধিক ধৈর্য ও সহনশীলতা দিয়ে। পুরুষকে বানালেন আল্লাহ বাইরের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাসম্পন্ন করে, আর নারীকে বানালেন গৃহের অভ্যন্তরে গৃহস্থালী কাজে পারদর্শিনী করে। মহানবী (সা) স্নেহের কন্যা ফাতেমাকে হযরত আলী (রা) এর সাথে বিয়ে দিলেন। অতঃপর উভয়ের কাজের ক্ষেত্র ও দায়িত্ব ভাগ করে দিলেন। এভাবে উভয়ের অবস্থান পদমর্যাদা ও অধিকারের সীমান্ত নির্ধারিত হয়ে গেল। আদরের দুলালী কন্যাকে উদ্দেশ্য করে প্রিয় নবী (সা) বললেনঃ

> 'মা তোমাকে রান্না করা, কাপড় ধোঁয়া, আটা পিষা, পানি তোলা, বাড়ী পাহারা দেয়া ইত্যাদি ঘরের কাজ করতে হবে। আর আলী (রা) কে বলে দিলেন বাড়ীর বাইরের কাজ তোমাকে করতে হবে। উপার্জন করা থেকে শুরু করে যুদ্ধ পরিচালনা, রাষ্ট্র পরিচালনা প্রভৃতি বাইরের কাজ করা সবই।[৩০৮]

---

[৩০৬] আল কুরআন, বাকারা, আয়াত-২২৮।

[৩০৭] আল হাদিস

[৩০৮] আল হাদিস

এ ব্যাপক হাদিসের মধ্যে বলে দেয়া হয়েছে। তবে উপরে হাদিসের অর্থ এই নয় যে, আলী (রা)কোনদিন কখনো ভিতরের কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করতেন না, আর ফাতেমা (রা) বোরখা পরিধান করে কোনোদিন বাড়ীর বাইরে যেতেন না। যা হোক নারী-পুরুষের স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনের মধ্যেই দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের স্বার্থকতা, সুখ ও শান্তি। দায়িত্ব ভাগ করে দেয়ার পর সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। যার যার দায়িত্ব ঠিক ঠিক মত পালন না করলে বা দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করলে আল্লাহর কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে প্রিয় নবী (সা) বলেছেন: 'প্রত্যেক মানুষ তার পরিবারের রাখাল এবং পরিবার পরিজন তার প্রজা। সুতরাং প্রত্যেক মানুষকে তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" [৩০৯]

প্রত্যেক স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের রাখাল এবং স্বামীর গৃহ তার প্রজা। সুতরাং প্রত্যেক দুঃখে, সুদিনে, দুর্দিনে নারী যে পুরুষের চিরসঙ্গিনী এ আদর্শই পাওয়া যায় হযরত হাওয়া (রা) মধ্যে, আদর্শ স্বামী-স্ত্রীর মতই তাঁরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে হাত ধরাধরি করে বেহেশত থেকে নেমে এসেছিলেন। এখানে ইসলাম নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনের যে এক স্মরণাতীত চিত্র এঁকেছেন তার তুলনা নেই। দাম্পত্য জীবনের কী পবিত্র ও উজ্জ্বল আদর্শ যেমন আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন:

> 'আল্লাহ তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদেরজন্যে নির্দেশনাবলী রয়েছে [৩১০]

ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার

ইসলাম নারীকে অর্থনৈতিক অধিকার দিয়েছে। পশ্চিমা জগতের তেরশ বছর পূর্বেই ইসলাম নারীকে অর্থনৈতিক অধিকার দিয়েছে। ইসলাম নারী জাতিকে ধন-সম্পদের, ধন-সম্পদ উপার্জনের স্বত্ত্বাধিকার ও ক্ষমতা দিয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা দিচ্ছেন: 'পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে। অল্প হোক কিংবা বেশ, এ অংশ নির্ধারিত ।'[৩১১] আবার

---

[৩০৯] আল হাদিস

[৩১০] আল হাদিস।

[৩১১] সূরা আন-নিসা, আয়াত-৭।

অর্জিত সম্পদ সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণাঃ "পুরুষদের জন্যও তাদের উপার্জনের নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে এবং নারীদের জন্য তাদের উপার্জনের নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে।'

৩১২

নারীর উত্তরাধিকার সম্পর্কে ইসলামে সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে, আর এতে সে কুমারী হোক, বিবাহিত বা বিধবা যাই হোক না কেন, কোনোই পরিবর্তন হয় না। ইসলাম পিতা-মাতার সম্পত্তিতে ছেলের সাথে মেয়ের উত্তরাধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। আর তা শরীয়ত সম্মত নিয়মে মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ স্ত্রীকে দিয়ে অবশিষ্টাংশ মৃত ব্যক্তির পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়। নারী জাতি পাঁচ জায়গায় ওয়ারিস পায়। অর্থাৎ মা-বাপ, ভাই, স্বামী ও ছেলের নিকট থেকে, নারী জাতি তার নিকট আত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তেমনি অংশীদার হয় যেমন হয় পুরুষেরা। কোনো পুরুষই নারীর অনুমতি ব্যতীত তার সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। নারী নিজেও তার ব্যবসা চালাতে পারে। স্বামী তার ন্যায্য অধিকার না দিলে সে আইনের আশ্রয় নিয়ে তা আদায় করে নিতে পারে। স্ত্রী তার স্বামীর নিকট থেকে যে মহর পায়, ইসলাম তা ভোগ বা ব্যয় করার পূর্ণ অধিকার তাকে দিয়েছে।

পিতা, ভাই বা স্বামীর কারো মহরের টাকা দিয়ে ব্যবসায় করার কোনোই অধিকার নেই। স্ত্রী যা কামাই করে তা সম্পূর্ণ তার নিজস্ব সম্পদ। সে নিজে তা ভোগ করবে। একটা পয়সাও যদি সে স্বামীর সংসারে খরচ না করে তবে কারো কিছু বলার নেই। যদি ইচ্ছা করে খরচ করে তবে তা তার অনুগ্রহ। তালাক প্রাপ্তা হলে স্ত্রী তার পূর্ব স্বামীর নিকট ইদ্দত পর্যন্ত খোর-পোশ পায়। সন্তান থাকলে তার লালন পালনের খরচ পায়। যে কোনো প্রাপ্ত বয়স্কা নারী, তা সে কুমারী, বিবাহিত বা বিধবা যাই হোক না কেন, কারো সাথে পরামর্শ না করেই তার সম্পত্তির অংশ বিশেষ বা পুরোটাই শরীয়তের বিধান অনুসারে দান, ক্রয়, বিক্রয় বা হস্তাক্ষর করতে পারে। ইসলাম তাকে এ অধিকার দিয়েছে।

পুরুষের তরফ থেকে নারীকে যে মহর দেয়া হয়, তা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে প্রদান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মহর মায়া-মমতা ও ভালবাসার প্রতীক। পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ।[৩১৩] শুধু শর্ত হলো, নারীর শালীনতা ও পবিত্রতা (Modesty) রক্ষার্থে নারীকে শরীয়তী পোষাক পরে, শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে থেকে পর্দার সাথে কাজ

---

৩১২ সূরা আন নিসা, আয়াত-৩২।

৩১৩ সূরা আন-নিসা, আয়াত-৩২।

করতে হবে। আর শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ করা চলবে না। শালীনতা (Modesty) রক্ষা করে চলতে হলে স্বভাবতই নারী এমন কোনো পেশা গ্রহণ করতে পারে না, যে পেশায় তার সৌন্দর্য এবং শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ প্রকাশ হয়ে পড়ে। যেমন মডেলিং করা, নৃত্য করা, সিনেমায় অভিনয় করা এবং এইধরনের অন্যান্য কাজ। যে সকল পেশা নারী প্রকৃতির জন্য উপযোগী একই সাথে সমাজ গ্রহণ করে অর্থ উপার্জন করতে ইসলামে নিষেধ নেই। যেমন যাদের শিক্ষকতা করার যোগ্যতা আছে, যারা ডাক্তার বা নার্স হিসেবে কাজ করতে পারে, সমাজে তাদের খেদমতের প্রয়োজন আছে। নারীর প্রকৃতি হলো শিশুর প্রতি কোমলতা, ছোটদের প্রতি ভালবাসা ও তাদের যত্ন নেয়া, দুর্বল ও রুগীদের সেবা করা ইত্যাদি। মুসলমান সমাজে এসকল পেশায় নারীদের কাজ করার চাহিদা অনেক অপরিহার্য।

নারীর সামাজিক অধিকার

মানুষ সামাজিক জীব। আর সমাজে বাস করতে হলে মানুষকে অবশ্যই সামাজিক রীতি-নীতি মেনে চলতে হবে। সামাজিক বাধ্যবাধকতা মানুষের জীবনে কল্যাণ আনে অনিষ্ট নয়। বিশেষত মুসলিম সমাজে নারীর সামাজিক অধিকার সুনির্দিষ্ট হলেও সুউচ্চে অবস্থিত। মুসলিম নারীর সামাজিক জীবনাচার কেমন হবে তা ইসলামে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নারী-পুরুষের মধ্যকার মেলামেশায় নিয়মনীতি, মুসলিম রমণীর পোষাক-আশাক, পর্দা-বেপর্দার কুফল, বিবাহ-বিচ্ছেদ, তালাক ইত্যাদির নিয়ম নীতি, স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব-কলহের মীমাংসার দৃষ্টান্ত। বহুবিবাহ, যিনা-ব্যভিচার ও যৌনাচারের বিষফল, এক্ষেত্রে নারীর করণীয় বর্জনীয় ইত্যাদি বিষয়ে ইসলাম সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে।

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর নারী-পুরুষের মধ্যে জন্মগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে তাদেরকে সমাজে বাস করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যেমন কুরআনে বলা হয়েছেঃ

> 'তিনি পানি (শুক্র) থেকে মানবকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে রক্তগত, বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন।[৩১৪]

জন্ম গ্রহণ করার কারণে পিতা-মাতার সঙ্গে বংশগত সম্পর্ক এবং বিবাহ করার কারণে বিবাহগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। নর-নারীর সুখ ও সমৃদ্ধি, জীবন-যাপনের জন্যে এরকম রক্তগত ও বিবাহগত সম্পর্কের প্রয়োজন আছে। ইসলাম নারীকে সামাজিক অনেক অধিকার দিয়েছে। নারী জাতির অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা

---

[৩১৪] সূরা আল ফোরকান, আয়াত-৫৪।

ছিল মহানবী (সা.) এর অন্যতম প্রধান সংস্কার এবং মানব কল্যাণমুলক কাজগুলোর অন্যতম। ইসলামে নারীর অধিকার ও তার দায়িত্ব বস্তুতঃ পুরুষের অধিকার ও দায়িত্বের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় বরং সমান। Islam believes in equality but not identicality ইসলাম নারী-পুরুষের সমান অধিকারে বিশ্বাস করে এবং উভয়ের কর্মক্ষেত্র একই হওয়ায় বিশ্বাস করে না। সমতা equality আর একত্ব identicality দুটি এক নয়, ভিন্ন জিনিস।

মুসলিম নারী অবাধে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে পারে, ঈদ উৎসবে যোগ দিতে পারে, হজ্বে যেতে পারে, যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সেবা শুশ্রুষা করতে পারে, যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে, নিজেও যুদ্ধ করতে পারে, রাজকর্ম পরিচালনা করতে পারে, সে ভোট দিতে পারে, জ্ঞান চর্চা করতে পারে। অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রেও সে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। শুধু শর্ত হলো, নারীকে তার এ সকল অধিকার আদায় করে নিতে হলে তাকে তার সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ মত চলতে হবে। যেমন:

১. তার সৃষ্টিকর্তা তাকে বেগানা পুরুষের সাথে অবাধে মিলামেশা করতে নিষেধ করে দিয়েছে।

২. বাইরের পরিবেশে গেলে তাকে মার্জিত পোশাক পরিচ্ছেদ ও বোরখা পরিধান করার নির্দেশ দিয়েছেন।

কিন্তু অন্য ধর্মের লোকেরা সৃষ্টিকর্তার এ নিয়মকে নারীর অধিকার খর্ব করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করে। তারা বোরখা পরাকে চাদরে আবদ্ধ বলে ব্যঙ্গ করে। প্রকৃতপক্ষে বোরখা পরার বিধান নারীর অধিকার খর্ব করে না বরং তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়। আল্লাহ এসকল বিধান নারী জাতির অধিকার ও মর্যাদাকে যে কতদূর দেয় তা লিখে বুঝাবার অপেক্ষা রাখেনা। আল্লাহর বিধান নারীদেরকে পুত-পবিত্র রাখে। তিনি তাদেরকে কত সুন্দরভাবে বুঝাচ্ছেন:

> "আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্র দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী। তিনি সর্ব বিষয়ে খবর রাখেন। [৩১৫]

ইসলাম নারীকে সামাজিক জীবনে সম্মানিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। তবে তার এ মান-সম্মান ও যথাযোগ্য অধিকার সে তখনই পেতে পারে যখন সে তার সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ ও তাঁর হাবীব (সা) এর আদর্শ অনুসারে জীবন চালায়, ওহী ভিত্তিক শিক্ষা অনুশীলন করা ব্যতীত নারী কোনো দিন তার অধিকার পেতে পারে না। ওহী

[৩১৫] সূরা আল আহযাব, আয়াত ৩৩-৩৪।

ভিত্তিক জীবনাদর্শ ইসলাম অনুশীলন করা ব্যতীত অধিকার আদায় করতে গেলে যথাযোগ্য অধিকার তো পায়ই না বরং পদে পদে তাকে হোঁচট খেতে হয়।

নারীর রাজনৈতিক অধিকার

ইসলাম নারীকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার অধিকার দিয়েছে। সে রাজ্য পরিচালনায় অংশ নিতে পারে, ভোট দেয়ার অধিকার রাখে, আইন প্রণয়নে মতামত দেওয়ার অধিকার রাখে, নারী ভোট পেয়ে প্রতিনিধিও নির্বাচিত হতে পারে। ইসলামী সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে যে কোনো নিরপেক্ষ গবেষণা প্রমাণ করে যে, নারী রাজনৈতিক ব্যাপারে পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করে।

১. খৃষ্টধর্মের মত ইসলাম নারীকে বলেনি যে, স্ত্রী লোকেরা মসজিদে চুপ করে থাকুক কারণ কথা বলার অনুমতি তাদের দেয়া হয়নি। বাইবেলে বলা হয়েছেঃ 'স্ত্রীলোকেরা মণ্ডলীতে চুপ করিয়া থাকুক কারণ কথা বলিবার অনুমতি তাদের দেয়া হয়নি।[৩১৬]

২. খৃষ্টধর্ম অনুসারে বিশ্বকোষ ব্রিটানিকায় বলা হয়েছেঃ "Women were excluded from all public affairs. [317]

অথচ ইসলাম নারীকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:

> 'আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন-যাপন করে।[৩১৮]

অর্থাৎ নারী-পুরুষ একে অপরের সহায়ক, সমর্থক ও সাহায্যকারী। সহায়ক শুধু সামাজিক ভাবেই নয়, রাজনৈতিক ভাবেও। রাজনৈতিক ভাবেও তারা একে অপরের সহায়ক। আসলে তাদের অধিকার আছে পুরুষের পাশাপাশি রাজনৈতিক সুবিধাভোগ করার।

ইসলাম ১৪০০ বছর পূর্বে নারী জাতিকে ভোটাধিকার দিয়েছে। নারী ভোট দিতে পারে, ভোট পেয়ে নির্বাচিত হতে পারে, তারা আইন প্রণয়নে অংশ নিতে পারে। জনসাধারণের জন্য কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করার অধিকারও তার আছে। ইসলামের ইতিহাসে ও কুরআনে তার নজির আমরা দেখতে পাই। আরো দেখতে পাই খাওলা বিলতে সালবী নামে জনৈক নারীকে স্বামীর প্রতি অভিযোগ নিয়ে রসূলের

---

৩১৬ ইঞ্জিল শরীফ, ১ করিন্দীয়, ১৪:৩৪।

৩১৭ ইঞ্জিল শরীফ ভলিউম-১৯, পৃ-৯০৯, ১৯৭৫ সংস্করণ।

৩১৮ সূরা- আত তাওবা আয়াত-৭১।

(সা) দরবারে উপস্থিত হতে এবং রাসূলের (সা) সাথে বাদানুবাদ করতে যার প্রেক্ষাপটে আল কুরআনের ৫৮:১-৪ আয়াত নাযিল হয়েছে। শুধু তাই নয় নারীর অধিকার ও মর্যাদা আদায় করার জন্য আরো দেখা যায় একজন নারীকে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর মত অগ্নিপুরুষের সাথে মসজিদে বিতর্ক করতে। আল্লাহ বলেছেন,

> 'হে নবী! ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরষ থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবেনা এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্য করবেনা। এখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল অত্যন্ত দয়ালু।'[৩১৯]

নারী ভোট পেয়ে প্রতিনিধি হওয়ার অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। আসমা বিনতে ইয়াজিদ নামি একজন নারী (সাহাবী) হযরত মুহাম্মদ (সা) এর দরবারে এসে বললেনঃ 'হে আল্লাহর নবী আমি মুসলমান নারীদের পক্ষ হতে প্রতিনিধি হিসেবে আপনার নিকট এসেছি। আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই আপনাকে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য নবী করে পাঠিয়েছেন। তাই আমরা নারী মহলো আপনার ওপর এবং আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি। কিন্তু আমরা ঘরের কোণে পর্দার আড়ালে থেকে শুধু পুরুষের মনোবাসনা পুর্ণ করে থাকি। তাদের সন্তানদেরকে গর্ভে ধারণ করে থাকি। অথচ এসব সত্ত্বেও পুরুষরা অনেক সওয়াবের কাজে আমাদের চাইতে অগ্রগামী থাকে। তারা জুমার নামাযে শরীক হয়, জামায়াতে নামাজ আদায় করে, রোগীদের দেখাশুনা করে, জানাযায় শরীক হয়, হজ্বের সময় হজ্ব করে সর্বোপরি তারা জিহাদ করে থাকে। আর তারা যখন হজ্ব-ওমরা ও জিহাদ করে তখন আমরা তাদের মালের রক্ষণাবেক্ষণ করি। তাদের জন্য কাপড় বুনি। তাদের সন্তান-সন্ততিদের লালন-পালন করি। আমরা কি সওয়াবের বেলায় পুরুষদের সমঅংশিদার হতে পারি না? মহানবী (সা) সাহাবাদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমরা কি ধর্মের ব্যাপারে এই মহিলার চাইতে উত্তম প্রশ্নকারী আর কাউকে দেখেছ? সাহাবারা বললেন, একজন নারী যে এরকম প্রশ্ন করতে পারে তা আমরা কখন কল্পনাও করতে পারিনি। অতঃপর প্রিয় নবী হযরত (সা) আসমার দিকে লক্ষ্য করে বললেন, মনোযোগ দিয়ে শুনো, ভাল করে বুঝো এবং যাদের প্রতিনিধি হয়ে তুমি এসেছ তাদের গিয়ে বলো: স্বামীর খেদমত করা, তার সন্তুষ্টি

---

[৩১৯] সূরা আল মুমতাহিনা, আয়াত-১২।

তালাশ করা উল্লিখিত সমস্ত সওয়াবেরই সমতুল্য। এমনি করে নারী আইন প্রণয়নে ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ নিতে পারে। যা ইসলাম অনুমোদন করেছে।

নারীর আইনগত অধিকার

ইসলামে আইনগত অধিকার নারী-পুরুষের উভয়েরই সমান। হত্যা (খুন), চুরি, ডাকাতি, যেনা-ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অথবা মদ পানের শাস্তি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যেই সমান। এ ছাড়া শরীয়তের বিধান নারী-পুরুষ উভয়েরই জানমাল রক্ষা করে। নারী বা পুরুষ যেই হত্যার অপরাধে অপরাধী হবে তাকে কেসাস (জানের বদলে জান বা খুনের বদলে খুন) এর শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ ঘোষণা করছেন: 'হে ঈমানদাররা! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।' [৩২০]

কোনো পুরুষ হত্যার অপরাধে অপরাধী হলে তাকে যেমন মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, স্ত্রীলোক হত্যার অপরাধে অপরাধী হলে তাকেও তেমনি মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। পুরুষের বেলায় যেমন চোখের প্রতিশোধে চোখ, দাঁতের প্রতিশোধে দাঁত, কানের প্রতিশোধে কান, হাতের প্রতিশোধে হাতের কেসাস নেয়া হয় নিহত ব্যক্তির অভিভাবক পুরুষ হলে তার মাফ করার যা দিয়্যাত আদায় করার মতামত গ্রহণ করতে হবে, অগ্রাহ্য করা কোনোই উপায় নেই। আল্লাহ বলেছেন: 'হে বুদ্ধিমানরা! কেসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন (রক্ষার ব্যবস্থা) রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পারো [৩২১]

চুরি ও সামাজিক অপরাধ সংক্রান্ত বিধানে ইসলামী শরীয়তে নারী ও পুরুষের জন্য সমান নীতিমালা অনুসৃত হয়েছে। ইসলামী আইনশাস্ত্রে অপরাধ নির্ধারণে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের কোনো অবকাশ নেই। বিশেষত বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্ককে ইসলামে গুরুতর সামাজিক ও নৈতিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে-

> 'ব্যভিচারীর শাস্তি নারী-পুরুষ তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়। যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।[৩২২]

---

[৩২০] সূরা-বাকারা, আয়াত-১৭৯।

[৩২১] সূরা-বাকারা, আয়াত-১৭৯

[৩২২] সূরা আন-নূর, আয়াত-২।

বিবাহ ও তালাকের ক্ষেত্রে খৃষ্ট ধমের বিধান অনুসারে তালাকের অনুমতি নেই। That the wife should not separate from her husband and that the husband should not divorce his wife [৩২৩] কিন্তু ইসলামী বিধানে সামাজিক বাস্তবতা ও পারিবারিক প্রয়োজন বিবেচনায় তালাক দেয়ার বিধান রয়েছে।

মদ্যপান সম্পর্কেও ইসলামী শরীয়তে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। কুরআনে মদ্যপানকে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এবং ইসলামী ফিকহে সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এর শাস্তির বিধান নির্ধারিত হয়েছে (যার পরিমাণ ও প্রয়োগ বিষয়ে মাজহাবভেদে কিছু ব্যাখ্যাগত পার্থক্য বিদ্যমান)।

[৩২৩] Bible Erinthiaus VII-38.

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামের কতিপয় প্রায়োগিক বিধান

বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলী মূলত একে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়ে থাকে। মানব বংশের স্থায়িত্ব ও সভ্যতা এর ওপর নির্ভরশীল। বিবাহ প্রথা চালু করে বলা হয়েছে, যৌন চাহিদা পূরণ কর; কিন্তু বিচ্ছিন্ন ও অনিয়মতান্ত্রিক সম্পর্কের দ্বারা নহে। লুকোচুরি করেও নহে, প্রকাশ্য অশ্লীলতার পথও নহে; বরং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রকাশ্য ঘোষণার দ্বারা যেন তোমার সমাজে তা সকলের নিকট পরিজ্ঞাত ও প্রকাশিত হয়ে পড়ে, অমুক পুরুষ ও অমুক নারী পরস্পর এক হয়ে গিয়েছে। 'বিবাহ হলো সংযোগকরণসহ ইজাব ও কবুলের নাম।'[৩২৪]

বিয়ে শখটি আরবী নিকাহ্[৩২৫] শব্দ থেকে নির্ণিত হয়েছে। মানব সমাজে পরিবার গঠনের এটি প্রাথমিক স্তর। একজন পুরুষ ও এক যা একাধিক স্ত্রী বিবি সম্মতভাবে স্বামী স্ত্রী হিসেবে একত্রে বসবাসস্থানে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যয়ে বিয়ে সংঘটিত হয় তবে তা অবশ্যই ধর্মীয় আইন সম্মত ও সামাজিক নীতির মাধ্যমে হতে হবে। এক কথায় তা হবে সমাজ স্বীকৃত পন্থায়। 'বিবাহ এমন একটি বন্ধন যা স্বাদ উপভোগের অধিকার লাভের জন্য নির্ধারিত।[৩২৬]

আরবিতে নিকাহ্ শব্দটির প্রতিশব্দ আকদ অর্থাৎ বন্ধন। বন্ধন হলো স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের ব্যবহারের সংযোগ। 'বিবাহ সম্পন্ন হয় ইয়াব (প্রস্তাব দান) ও কবুল প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে। [৩২৭]

ইসলামে বিবাহ

ইসলামে পরিবার গঠনের একমাত্র বৈধ উপায় হচ্ছে বিয়ে। এর ব্যাতিরেকে নারী পুরুষের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। বিয়ে হচ্ছে নারী পুরুষের মধ্যে যৌন সম্পক সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। বিয়ে হচ্ছে নারী পুরুষের মাঝে সামাজিক

---

[৩২৪] ওবায়দুল্লাহ শাদরুশ শরীয়াতুল আসগার, 'শরহে বেকায়াহ', অনুবাদ ও সম্পাদনায় মোহাম্মদ হাদিসুর রহমান, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৭৩।

[৩২৫] আরবি শব্দ। অর্থ চুক্তি বা ইচ্ছা প্রকাশ করা। নারী ও পুরুষের যৌন প্রবৃত্তিকে বৈধ উপায়ে ব্যবহার ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে একে অপরের সাথে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তাকেই নিকাহ ও বিবাহ বলা হয়।

[৩২৬] ওবায়দুল্লাহ শাদরুশ শরীয়াতুল আসগার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

[৩২৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

পরিবেশে ও শরীয়র সমর্থিত পন্থায় বৈধ সম্পর্ক স্থাপনের একটি প্রক্রিয়া। যার মাধ্যমে একজন নারী ও পুরুষ পরস্পর একত্রে বসবাস ও যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার লাভ করে। পরস্পরের ওপর অধিকার দায়িত্ব ও কর্তৃব্য আরোপিত হয়।[৩২৮] পবিত্র কুরআনের আলোচ্য আয়াতে মহান রাব্বুল আলামীন বিয়েকে একটি বিশেষ দান বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যত্র এটিকে সুন্নত হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে:-

> 'এবং বিয়ে দাও তোমাদের এমন ছেলে মেয়েদের যাদের স্বামী বা স্ত্রী নেই। বিয়ে দাও তোমাকে দাস[৩২৯]দাসীদের যারা বিয়ের যোগ্য হয়েছে।"

পবিত্র কুরআনে বিয়ে সম্পর্কে বলা হয়েছে-

> 'হে নবী তোমার পূর্বে আমি অনেক নবী রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের জন্য স্ত্রী ও সন্তানের ব্যবস্থা করে দিয়েছি।[৩৩০]

উপর্যুক্ত আয়াতে প্রাপ্ত বয়স্ক নারী পুরুষের মধ্যে বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:

> 'আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনসমূহের মধ্যে ইহাও একটি নিদর্শন যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের কাছে তোমরা শান্তি লাভ করিতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা, প্রেম প্রীতি এবং স্নেহ। নিশ্চয় চিন্তাশীল লোকদের জন্য ইহাতে বহু নিদর্শন রহিয়াছে।[৩৩১]

আলোচ্য আয়াতটিতে আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টি আশরাফুল মাখলুকাত মানব জাতিকে নর ও নারীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নারীকে পুরুষের স্ত্রীরূপে, মাতৃরূপে, কন্যা ও ভগ্নিরূপে স্থান দিয়ে নারী জাতিকে মাদক সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা, স্নেহ-দয়া, মায়া-মমতা ইত্যাদি দান করেছেন এবং একের ওপর অন্যের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত

---

[৩২৮] আল-কুরআন, সূরা আর রায়াদ, আয়াত-৩৮।

[৩২৯] দাস ঃ মানুষ কর্তৃক মানুষ ক্রয় করে সে মানুষটিকে মানুষের গোলামে পরিণত করার নাম দাস। দাস প্রথা পূর্বে ব্যাপকহারে প্রচলিত ছিল। এখন ইসলামসহ সকল ধর্মই দাস প্রথা নিন্দা করায় তা দূরীভূত হয়ে গেছে।

[৩৩০] সূরা আন-নুর, আয়াত-৩২।

[৩৩১] সূরা আর রুম আয়াত-২১।

করেছেন যাতে মানব জাতি আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় করত তার প্রদত্ত সুশৃঙ্খল নিয়ম কানুন যথা পরস্পরের হক সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে পালন করে দুনিয়া ও আখেয়াতের প্রকৃত সুখ-শান্তি কল্যাণ লাভ করিতে পারে।[৩৩২]

বিয়ে সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ

১। 'তিনি আল্লাহ যিনি তোমাদিগকে একটি মানব জাতি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সে আদি মানব হইতে তাহার স্ত্রীকে সৃষ্টি করিয়াছেন এই জন্য যে, তিনি তাহার স্ত্রী হইতে সুখ-শান্তি লাভ করিবেন।[৩৩৩]

আয়াতের এ অংশে বিশেষ করে আমাদের আদি পিতা মাতার উল্লেখ থাকিলেও ইহা দ্বারা সমস্ত আদম সন্তানকে বুঝানো হয়েছে। স্ত্রীকে পুরুষের সুখ-শান্তি লাফের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে।

২। 'নারীগণ তোমাদের পরিচ্ছেদ এবং তোমরা নারীগণের পরিচ্ছেদ।[৩৩৪]

অর্থাৎ নর-নারী একে অপরের মুখাপেক্ষী এবং একে অপরের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

৩। তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র স্বরূপ।[৩৩৫]

অর্থাৎ বিবাহের জন্য উদ্দেশ্য সুসন্তান লাভ।

বিয়ে সম্পর্কে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাঃ বলেছেন-

১. বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করা সুন্নত। যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে বর্জন করে সে আমার দলভূক্ত নয়। [৩৩৬]

২। "দুনিয়ার যাবতীয় ধন দৌলত এবং যাবতীয় সম্পদের মধ্যে উৎকৃষ্ট সম্পদ হইল সৎ স্ত্রী। [৩৩৭]

৩। 'যে স্ত্রী লোক পাঁচ ওয়াক্ত যথাযথভাবে নামাজ আদায় করে, রমজান মাসে রোজা রাখে, নিজের সতীত্ব সম্পূণভাবে রক্ষা করে, স্বামীর হক যথাযথভাবে

---

[৩৩২] আবুল বাশার, মোহাম্মদ: মুসলিম পারিবারিক আইন কানুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৫৭।

[৩৩৩] সূরা রুম, আয়াত-২১।

[৩৩৪] সূরা আল বারাকা, আয়াত ১৮৭।

[৩৩৫] সুরা বাকারা, আয়াত-২২৩।

[৩৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

[৩৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

আদায় করত স্বামীর আনুগত্য করিয়া চলে সে ইচ্ছামত বেহেস্তের যে কোনো দরজা দিয়ে অবাধে প্রবেশ করিবার অধিকার রাখে। ৩৩৮

৪. নবী করিম (সা) বলেছেন, 'তোমরা স্ত্রীগণের সঙ্গে সুন্দরভাবে আনন্দময় জীবন যাপন কর। যদি তোমরা তাহাদিগকে অপছন্দ কর তবে ইহাও হইতে পারে যে, তোমরা যাহা অপছন্দ কর তাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রাখিয়াছেন। ৩৩৯

৫। বাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন, 'হে যুব সমাজ তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ের সামর্থ রাখে, তাদের বিয়ে করা কর্তব্য। কেননা বিয়ে দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণকারী ও যৌনাঙ্গের পবিত্রতা রক্ষাকারী। আর যার সামর্থ নেই সে নে রোজা রাখে, যেহেতু রোজা হইল ঢাল স্বরূপ।৩৪০

পাত্রী দেখে নিলে বিবাহের পর হতাশা ও অনুশোচনা থাকে না এবং পছন্দসই পাত্রী নির্বাচন করা হলে তাহার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। আর এতে বিবাহের পূর্বেই পাত্র-পাত্রীর অন্তরে স্নেহ মমতার উদ্রেক হওয়ার প্রবল সম্ভবনা থাকে-যা দাম্পত্য জীবনের জন্য অপরিহার্য। পছন্দসই কনে বিবাহের নির্দেশ পবিত্র কুরআনেও দেওয়া হয়েছে। কোনো নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তাকে দেখে লওয়ার নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন-

৬। 'তোমাদের কেউ যখন কোনো নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিবে, তখন সম্ভব হইলে তাহার এমন কিছু দেখা যদি তার পক্ষে সম্ভব হয় যা তাকে বিয়ে করতে উদ্বুদ্ধ করবে, তবে তা তার অবশ্যই দেখে নেয়া কর্তব্য।৩৪১

তিনি আরো বলেন–

৭। 'কারণ, ইহা (পাত্রী দেখিয়া লওয়া) তোমাদের মধ্যে স্থায়ী সম্প্রীতি সৃষ্টির সহায়ক হইবে।'৩৪২

এই হাদিসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত শাহ্ গুলীউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলোভী (র) বলেন, প্রস্তাবিত কনেকে দেখিয়ে লওয়াই পছন্দনীয়। কারণ, না দেখিয়ে হঠাৎ বিবাহ করিলে যদি মিলমিশ না হয় এবং বিবাহ রহিতও করিতে না পার, তবে যে অনুশোচনা হইবে, দেখিয়া-শুনিয়া বিবাহ করিলে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবে। কনে দেখিয়া না পছন্দ হওয়ার কারণে যদি বিবাহ না কর, তবে অন্য পাত্রী তালাশ করিয়া লওয়া কঠিন হইবে না। আর পছন্দ হইলে তাহার সহিত বিবাহ

---

৩৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

৩৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

৩৪০ আবদুর রহিম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৯৩।

৩৪১ প্রাগুক্ত, পৃ ১২২।

৩৪২ প্রাগুক্ত, পৃ ১২২।

অত্যন্ত সম্প্রীতি ও আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইবে। ভাল-মন্দ বিচার করিয়া কর্ম সম্পাদন করাই জ্ঞানী লোকের কাজ।[৩৪৩]

পাত্র পাত্রী নির্বাচন

পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি সমৃদ্ধি প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি রক্ষাকল্পে বিয়ের পূর্বে পাত্র-পাত্রী একে অপরকে দেখা, পরস্পর সম্পর্কে জানা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিয়ের আগে দেখা সাক্ষাৎ করা ইসলামে বৈধ। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

'তোমরা বিয়ে কর সেই মেয়ে লোক যে তোমার পক্ষে ভাল হবে।'[৩৪৪]

আলোচ্য আয়াতে বরের পক্ষ থেকে কনেকে দেখেশুনে পছন্দ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এ বিষয়টি বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিগ্রাহ্য বলা যায়। কেননা না দেখে পাত্র-পাত্রী বাছাইয়ের পর পরিণতি দাঁড়াতে পারে আজীবন পারিবারিক কলহ অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ। অতএব দেখে শুনে পছন্দ করলে এ সমস্যা থাকার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ

> 'তোমাদের কেউ যখন কোনো মেয়ে বিয়ে করার প্রস্তাব দিবে তখন তাকে নিজ চোখে দেখে তার গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা করে নিতে অবশ্যই চেষ্টা করবে, যেন তাকে ঠিক কোনো আকর্ষণে বিয়ে করবে তা সে স্পষ্ট বুঝে নিতে পারে।[৩৪৫]

অন্য একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন

> 'নবী করিম (সা) বিদ্যার ইচ্ছুক এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি মেয়েটিকে দেখেছ? সে বলল- না, দেখিনি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন যাও তাকে দেখে নাও।'[৩৪৬]

ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই। ইসলাম হলো মানবতার ধর্ম, মানুষের ধর্ম এবং মানব স্বভাব ধর্ম। সমস্ত বৈরাগ্যবাদী ধর্ম স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে তাকওয়ার পরিপন্থি বলে ঘোষণা করেছে।[৩৪৭] অথচ ইসলাম বৈরাগ্যবাদ পরিহার করে মানবিক মূল্যবোধের আলোকে সমাজ বিনির্মাণ ও পরিচালনা করার ওপর গুরুত্বারোপ অব্যাহত না রাখা

---

[৩৪৩] হজ্জাতুল্লাহিলো বালিগাহ, ২য় খণ্ড, পৃ ৩০৬

[৩৪৪] আবদুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

[৩৪৫] প্রাগুক্ত, পৃ ১২১

[৩৪৬] প্রাগুক্ত, পৃ ১২২

[৩৪৭] জালাল উদ্দীন আসার উমরী সাইয়েদ: ইসলামী সমাজে নারী (অনুবাদ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক) আধুনিক প্রাকশনী, ঢাকা, ১৯৯১. পৃ ২৯১।

যায় তবে তো এ ধারা বন্ধ হয়ে যাবে। আবার যারা বৈরাগ্যবাদের কথা বলেন, তারা বৈধভাবে বিয়ে না করে বরং হাজার নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক অব্যাহত রাখে বলে কেবলমাত্র অভিযোগই কোনো যায় তা নয় বরং আদালত পর্যন্ত মামলা গড়াচ্ছে অহরহ। মহানবী হযরত মুাম্মদ (সা) বলেছেন, স্ত্রীর সহিত সহবাস করাও নেক কাজ। ৩৪৮

দাম্পত্য জীবনের ওপর ইসলামের গুরুত্বারোপের বিষয়টিকে তুলে ধরতে গিয়ে আল্লামা ইবনে হালাকী (র.) বলেছেন, দাম্পত্য জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকার চেয়ে দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে মশগুল থাকা অধিক উত্তম।'৩৪৯

বিয়ে একটি সামাজিক বন্ধন। পুরো জীবনের জন্য এ বন্ধন স্থাপিত হয়। অতএব এ সম্পর্ক যেন স্থায়ী থাকে এবং এতে যেন কোনোরূপ ভাঙন সৃষ্টি না হয় সেজন্য দেখে শুনে বিয়ে সম্পন্ন করার জন্য ইসলাম তাকিদ দিয়েছে। সুতরাং বিয়ে সম্পন্ন হবে প্রস্তাব দান ও প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে বিবাহ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ফিকাহ গ্রন্থ শরহে বেকায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে 'কাজেই শরিয়তের পরিভাষায় আকান (বন্ধন) হইল স্বামী স্ত্রীর পরস্পর ব্যবহারের সংযোগ, অর্থাৎ ইজাব ও কবুল (প্রস্তাব ও প্রস্তাব গ্রহণ)।'৩৫০ পারস্পরিক প্রস্তাব দান ও প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে বিবাহ সম্পাদনকে ইসলাম সর্বোত্তম হিসেবে আখ্যায়িত করছে। নিম্নের হাদিস থেকে এ বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়।

নবী করীম (সা) জুলাইব নামক এক সাহাবীর জন্য এক আনসারী কন্যার বিয়ের প্রস্তাব তার পিতার নিকট পেশ করলেন। কন্যার বাবা তার স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে পরে তাদের মতামত জানাবেন বলে ওয়াদা করেন। লোকটি তার স্ত্রীর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করলে তিনি এ বিষয়টিতে তার স্পষ্ট অমতের কথা প্রকাশ করেন। মেয়েটি আড়ালে থেকে তাদের কথাবার্তা শুনতে পায়। লোকটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কে তাদের মতামত জানাকে রওয়ানা দিলে মেয়েটি তার পিতাকে লক্ষ্য করে বলল,

> 'তোমরা কি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করতে চাও? তিনি যদি বরকে তোমাদের জন্য পছন্দ করে থাকেন তবে তোমরা এ বিয়ে সম্পন্ন কর।' ৩৫১

---

৩৪৮ জালাল উদ্দীন আসার উমরী সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯১

৩৪৯ জালাল উদ্দীন আসার উমরী সাইয়েদ, প্রাগুক্ত,. পৃ ২৯১।

৩৫০ শরহে বেকায়াহ, পৃ. ৭৩।

৩৫১ আবদুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

দাম্পত্য জীবনে মিল-মিশ, প্রেম-ভালবাসা ও সতীত্ব পবিত্রতার পরিশুদ্ধ পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং পারিবারিক জীবনের মানুষ ও সুখ সমৃদ্ধির জন্য বিয়ের পূর্বে কনেকে দেখে নেয়া উচিত বলে ইসলামে সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয়েছে।[৩৫২]

এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

> 'যে সব স্ত্রী লোককে তোমাদের পছন্দ হয় তাদেরকে তোমরা বিয়ে কর।'[৩৫৩]

একই প্রসঙ্গে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেন,

> 'তোমাদের কেউ যখন কোনো মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেবে তখন তাকে নিজ চোখে দেখে তার গুণ ও বৈশিষ্টী সম্পর্কে বায়না করে নিতে অবশ্যই এটা করবে, যেন তাকে ঠিক কোনো আকষণে বিয়ে করবে তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারে।[৩৫৪]

যখন কোনো পুরুষের মনে কোনো বিশেষ মেয়েকে বিয়ে করার বাসনা জাগবে, তখন তাকে নিজ চোখে দেখে নেয়ার কোনো দোষ নেই।[৩৫৫]

উপর্যুক্ত কোরআন ও হাদিস থেকে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, বিয়ে করার জন্য পাত্রপাত্রী নির্বাচনের জন্য দেখা ও তার সম্পর্কে জানার বিধান ইসলাম স্বীকৃত। বরং বিবাহ করার জন্য মেয়েকে দেখে নিতে স্বয়ং নবী করিম (সা) উৎসাহিত করছেন। নিম্নের হাদিস থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

> 'মহানবী (সা) বিবাহ ইচ্ছুক এক ব্যাক্তিকে নিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি মেয়েটিকে দেখেছ? সে বলল না দেখিনি। তখন রাসূলে করীম (সা) বললেন। যাও ডাকে দেখে নাও।[৩৫৬]

বিবাহ করার জন্য পাত্রী দেখে নিতে যেমন উৎসাহিত করা হয়েছে ঠিক তখনি আবার না দেখে বিবাহ করাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এমনিভাবে বালক বা প্রাপ্ত বয়স্কা কোনো মেয়েকে তার মতামত উপেক্ষা করে বিয়ে দিতে নিষেধ করা হয়েছে। নিম্নের হাদিস থেকে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে।

> 'খানছা কিনতে খিদাম (রা) আল আনসারী হতে বর্ণিত আছে, তিনি বিবাহিতা ছিলেন। পরবর্তী বিবাহ কালে তার পিতা তাকে বিবাহ দিলেন অথচ তিনি সেই বিয়েতে রাজী ছিলেন না। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে উপস্থিত হয়ে

---

[৩৫২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

[৩৫৩] সূরা আন নিসা, আয়াত-৩।

[৩৫৪] আবদুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

[৩৫৫] আবদুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

[৩৫৬] আবদুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

ঘটন জ্ঞাত করলেন। নবী করিম (সা) আর এ বিবাহকে বাতিল সাব্যস্ত করলেন।'[৩৫৭]

বিয়েতে উভয়েরই সম্মতি একান্ত দরকার। কিন্তু প্রশ্ন হলো এ সম্মতির ক্ষেত্রে কার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী? এ প্রশ্নের জবাব হলো: 'আমাদের ধর্মের বিধান অনুযায়ী বিয়ে পড়ানোর সময় আগে নারীর অনুমতি নিতে হয়। উকিল ও সাক্ষী নিযুক্ত করে এই বলে কন্যার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয় যে, তোমরা মেয়ের কাছে যাও, মেয়েটাকে জিজ্ঞাস্য কর, সে এ বিয়েতে রাজী আছে কিনা? কনে তার সম্মতি প্রকাশ করলে তারপর জিজ্ঞাসা করা হয় হোলকে এ বিয়েতে সে রাজী আছে কিনা।[৩৫৮] এতে বুঝা যায় মতামতের ক্ষেত্রে কনেকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

উপর্যুক্ত তত্ত্ব, তথ্য ও আলোচনার মাধ্যমে একথা পরিস্কারভাবে বুঝা যায় যে, ইসলাম নারী পুরুষের বৈধ সম্পর্ককে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকে এবং বৈধ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একে অন্যকে জানা ও দেখার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। কিন্তু ইসলামে, বিবাহ একে অন্যের সাথে বিবাহের নাম করে আড্ডা দেয়া, অবৈধভাবে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। বাংলাদেশে ফাতওয়ার অপব্যবহার সম্পর্কিত বিষয়টি পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে, বিবাহপূর্ব ও পরবর্তী সময়ে বিয়ে করার নাম করে অবৈধভাবে মেলামেশা করে মহিলাটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে পুরুষটিকে বিবাহ করার জন্য অথবা সন্তানের পিতৃত্ব দাবি করলে এটা সমাজ পর্যন্ত গড়ায় এবং সামাজিকভাবে বিচার করতে গিয়ে বিপত্তি ঘটে। এভাবে সমাপ্তি ঘটে এক বা একাধিক জীবনের। অতএব এ বিষয়টি পরিস্কার যে, ইসলাম প্রদর্শিত পন্থা হলো সর্বোত্তম।

তালাক

তালাক[৩৫৯] শব্দের আভিধানিক অর্থ বন্ধন খুলে দেয়া।[৩৬০] আভিধানিকভাবে আরবি শব্দ 'তালাক' এর মূল অর্থ খুলে দেয়া'। আরবগণ 'নাকাতুল তালেকুন' শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে যুক্ত উটকে বুঝাত অর্থ্যাৎ যে উট মুক্ত, কোনো প্রকার বাঁধা নয় সেক্ষেত্রে এ শব্দদ্বয় উচ্চারিও হত।[৩৬১] শরীয়তের পরিভাষায় তালাকের অর্থ হচ্ছে

---

[৩৫৭] সহীহ আল বোখারী, কিতাবুল নেকাহ অধ্যায় নং ৪৩

[৩৫৮] আবদুল হাই, মুহাম্মদ: নারী অধিকার, মাহবুব প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, পৃ-৭৬।

[৩৫৯] তালাক। আরবি শব্দ। অর্থ বিবাহ বিচ্ছেদ। স্বামী-স্ত্রীর ইসলামে সকল হালাল কাজের মধ্যে এ কাজটি সবচেয়ে নিকৃষ্ট হালাল কাজ। বন্ধনমুক্ত করা।

[৩৬০] আবদুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪

[৩৬১] তালাক ও হিলা শরীয়াহ ও প্রচলিত আইনের তুলনামূলক আলোচনা: বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৫।

বিবাহ বিচ্ছেদ।[৩৬২] এ সম্পর্কে ইমামুল হারামাইন বলেছেন, শব্দটি ইসলাম পূর্ব জাহেলোী যুগের পরিভাষা। [৩৬৩] ইসলামও শব্দটিকে একই অর্থে ব্যবহার করেছে। শরিয়তের পরিভাষায় তালাক শব্দের অর্থ বিবাহ বিচ্ছেদ।[৩৬৪] শরিয়ত মোতাবেক স্বামী-স্ত্রী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরে যে কোনো সঙ্গত কারণে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোকে তালাক বলা হয়। তালাক সম্পর্কে মিশরীয় পণ্ডিত আল খাওলী বলেছেন, 'স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া অথবা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী একত্রিত স্বামী স্ত্রীর মধ্যের সম্পর্কের রশি ছিন্ন করা।'[৩৬৫]

ফিকাহ[৩৬৬] শাস্ত্র মতে, তালাক হলো বিয়ের বাঁধনকে তুলে ফেলা আর এ বাঁধন তুলে ফেলার মানে বিয়ের বাধ্যবাধকতা খতম করে দেয়া।[৩৬৭]

শরীয়ত[৩৬৮] মোতাবেক তালাকের নিম্নের সমার্থক অর্থ পাওয়া যায়।

ক. বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া

খ. তালাক শব্দের দ্বারা বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া

গ. বিবাহ বন্ধনকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাহার করা যেমন তালাকে বায়েন[৩৬৯]

ঘ. এবং বিশেষ শব্দ দ্বারা ভবিষ্যতে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করা যেমন তালাকে রাজেঈ[৩৭০]।

---

৩৬২ মওদুদী, সাইয়েদ আবুল আলা: স্বামী স্ত্রীর অধিকার, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ. ৪৫।

৩৬৩ পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৭৪

৩৬৪ তালাক ও হিলা শরীয়াহ ও প্রচলিত আইনের তুলনামূলক আলোচনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

৩৬৫ পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৭৪

৩৬৬ ফিকহ্ আরবি শব্দ। অর্থ বুঝ দেয়া, আইনশাস্ত্র, জ্ঞান দেয়া। ইসলামের পরিচালনায় যে শাস্ত্রে বিভিন্ন আইন বা মাসয়ালা বা এ সংক্রান্ত নিয়ম পদ্ধতি বিশেষভাবে উল্লেখ করে থাকে ফিকাহ্ শাস্ত্র বলা হয়।

৩৬৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫।

৩৬৮ জীবন পরিচালনা পদ্ধতি। আববি শব্দ। যুগে যুগে মানব ইতিহাসে জীবন অতিবাহিত করার যে কৌশল বা নিয়ম প্রচলিত ছিল তাই এই যুগের শরীয়ত। সময়ের পরিবর্তনে বিভিন্ন জাতির মধ্যে শরীয়ত তথা জীবন পরিচালনা পদ্ধতি বিভিন্ন রকম ছিল।

৩৬৯ **তালাকে বায়েন:** স্বামী-স্ত্রীর যে বিবাহ বিচ্ছেদ। এ পদ্ধতিতে স্ত্রীকে আর ফিরে পাওয়া যায় না।

৩৭০ **তালাকে রেজয়ী:** স্বামী-স্ত্রীর যে বিবাহ বিচ্ছেদ নির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে আবার ফিরে পাওয়া যায়।

তালাকঃ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

তালাক হলো এমন একটি পর্যায় যখন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক খারাপ হওয়ার কারণে কোনোভাবেই আর টিকিয়ে রাখা যাবে না এমন পর্যায়ে পৌঁছে। অর্থ্যাৎ দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক এতখানি খারাপ পর্যায়ে পৌঁছে যে, সংশোধন কিংবা পরিবর্তনের শেষ আশাটুকু বিলীন হয়ে যায়। কোনো মীমাংসা বা মধ্যস্থতাকারীকে দিয়েও তা আর ঠিক করা যাবে না। এমতাবস্থায় যখন বিয়ের উদ্দেশ্য আর ঠিক থাকছেনা তখন তাদের ভবিষ্যত জীবনকে ধবংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য এমনকি ভবিষ্যত দ্বন্দ-সংঘর্ষ, তিক্ততা, বিরক্তি, মারামারি ও জীবনহানির মত ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেতে এবং দু' জনের তিক্ততা থেকে সংঘঠিত চরম কোনো পরিণতির হাত থেকে বাঁচার জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো হয়।

১. ইসলামে তালাক কোনো ধরনের উৎসাহব্যঞ্জক কাজ নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে কাজটি জায়েজ[৩৭১] হলেও সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এ জায়েজ কাজটি হলো নিরাশ্রয়ের শেষ আশ্রয়স্থল, নিরুপায়ের উপায়। যখন উভয়ের মধ্যে পরস্পর মিলমিশে মাধ্যমে দাম্পত্য জীবন চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় তখন এ ব্যবস্থার মাধ্যমে পরস্পর পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যে যার নিজের মত করে চলতে পারে তালাকের অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে ইসলাম বলেছে, এটি আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ। হাদিসে বলা হয়েছে

> 'আল্লাহর কাছে সব হালাল কাজের মধ্যে সর্বাধিক ঘৃণার্হ ও ক্রোধ উদ্রেককারী কাজ হলো তালাক।[৩৭২]

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা খাত্তাবী বলেন, তালাক ঘৃণ্য হওয়ার অর্থ আসলে সেই মূল কারণটি ঘৃণ্য হওয়া, যার দরুণ একজন তালাক দিতে বাধ্য হয়। আর তা হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক খারাপ হওয়া মিলমিশের অভাব হওয়া[৩৭৩] মূল তালাক কাজটি ঘৃণ্য নয়। দু'জনের বিচ্ছেদ ঘৃণ্য। কেননা তালাককে আল্লাহ তায়ালা মুবাহ করে দিয়েছেন। আর নবী করিম (সা) তাঁর কোনো কোনো স্ত্রীকে রাজয়ী তালাক দিয়ে পুনরায় গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণিত।[৩৭৪]

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ছানআনী এ হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন- এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হালালের মধ্যের কতক কাজ এমন রয়েছে যে, যা

---

[৩৭১] জায়েজ: আরবি শব্দ। হারাম বা মাকরূণ এর বিপরীত শব্দ। অর্থ যা বৈধ। শরীয়তে দূষণীয় নয়।

[৩৭২] পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৫।

[৩৭৩] পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৫।

[৩৭৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫।

জায়েজ তবে আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত। আর এসব হালাল কাজের মধ্যে তালাক হচ্ছে সবচেয়ে বেশী ঘৃণ্য।[৩৭৫]

ফিকাহর ভাষায় 'তালাকের সৌন্দর্য হলো কষ্টকর অশান্তি হতে অব্যাহতি লাভ করা।'[৩৭৬] ফিকাহবিদদের হরে ছালাম আসলে নিষিদ্ধ জিনিস। যদি কোনো অবস্থায় তালাক না দিয়ে বাঁচা যায় তবে এটা জায়েজ। অবস্থা এমন হয় যে, তাদের পক্ষে আর কোনো মতেই একত্রে বসবাস সম্ভব নয়। এমনকি আল্লাহর বিধান মোতাবেক চলাও সম্ভব নয় তখন অবশ্য অগত্যা তালাকের আশ্রয় নিতে হবে।

প্রয়োজন দেখা দিতে পারে বলে আল্লাহ তায়ালা এটিকে জায়েজ রেখেছেন। সাধারণ কোনো কারণে হাসতে হাসতে অথবা গুরুতর কোনো অপরাধ ব্যতিরেকে অথবা মারাত্মক কোনো দোষত্রুটি ছাড়া স্ত্রীকে তালাক দেয়া জঘন্যতম অপরাধ। হাদিসে মহানবী (সা) বলেছেন, বিয়ে করো কিন্তু তালাক দিও না। কেননা আল্লাহ তায়ালা স্বাদ অন্বেষণকারী ও স্বাদ অন্বেষণকারিণীদের পছন্দ করেন না।[৩৭৭] কখনো কোথাও সৃষ্টি হতে পারে যে, কোনো অবস্থায় আর দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। তখন শেষ হাতিয়ার হিসেবে অস্ত্রটি ব্যবহার করতে হবে বলে এ বিধানটি রাখা হয়েছে। সচরাচর যখন যখন ব্যবস্থার করার জন্য নয়। যদিও তালাক শরিয়তসম্মত তথাপি স্ত্রীর মধ্যে মারাত্মক কোনো ধরনের দোষত্রুটি বাতিরেকে তালাক নান গুরুতর অপরাধ। এ বিষয়টি সম্পর্কে ইসলামিক স্কলারগণ সম্পূর্ণরূপে একমত। ইমাম আবু হানিফা (রহ) ফিকাহর আলোচনায় এ বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে ইসালামের সুস্পষ্ট নীতি হলো, 'না নিজে ক্ষতি স্বীকার করবে, না অনাকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে।[৩৭৮]

অকারণে তালাক দেয়া হলে স্ত্রী অপূরণীয় ক্ষতি, অপমান, লাঞ্ছনার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। জানের ছেলে মেয়েরা অসহায় হায় পড়ে। তালাক নামক কাজটির মাধ্যমে কতিপয় মানুষের জীবনে নেমে আসে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, অস্ত্রের স্নেহ-মমতা ও ভালবাসার সংকট এবং নেমে আসে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা। এ কারণে নবী করিম (সা) বলিয়াছেন, না নিজে ক্ষতিগ্রস্থ হবে না অন্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে[৩৭৯]। প্রখ্যাত ফিকাহবিদ ইবনে আবেদীন বলেছেন, তালাক মূলত নিষিদ্ধ মানে হারাম।

---

[৩৭৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫।

[৩৭৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫।

[৩৭৭] স্বামী স্ত্রীর অধিকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

[৩৭৮] পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৬।

[৩৭৯] প্রাগুক্ত

কেবলমাত্র উপায়ান্তর না থাকলে তা যায়েজ। তবে বিনা কারণে স্ত্রীর পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা ভাই বোনদেরকে কঠিন কষ্ট দানের জন্য তালাক দেয়া হলে তা হবে নাজায়েজ। যদি পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, কোনো মতেই আল্লাহর বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করা সম্ভব হবে না এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হলে তালাক তার মূল অবস্থায় থাকবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন-স্ত্রীরা যদি স্বামীদের কথামত কাজ করতে শুরু করে তাহলে তখন আর তাদের ওপর কোনো জুলুমের বাহানা তালাশ করো না, তালাক দিও না।[৩৮০] প্রকৃত কারণ ছাড়া যারা স্ত্রীদের তালাক দেয় তারা যে বড় ধরনের অপরাধী তাতে কোনো ধরনের সন্দেহ নেই। কুরআন হাদিস থেকে তারই নির্দেশ পাওয়া যায়। এদের সম্পর্কে নিম্নের হাদিসসমূহে তারই। সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

> তোমাদের একজনের অবস্থা কি হয়েছে? তারা কি আল্লাহর বিধান নিয়ে তামাশা খেলছে? একবার বলে তালাক দিয়েছি, আবার বলে পুনরায় গ্রহণ করেছি। [৩৮১]
>
> যখন তখন তালাক দান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তারা কি আল্লাহর কিতাব নিয়ে তামাশা খেলছে অথচ আমি তাদের সামনেই রয়েছি। এখানে যৌক্তিক ও যথাযথ কারণ ছাড়া তালাক দানকে বুঝানো হয়েছে। [৩৮২]
>
> তোমরা বিয়ে কর। কিন্তু তালাক দিও না। কেননা আল্লাহ তায়ালা সেসব স্ত্রী-পুরুষকে পছন্দ করেন না, যারা নিত্য নূতন বিয়ে করে স্বাদ গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। [৩৮৩]

এ হাদিসেও বিয়ে করে আবার তালাক দানের কথা বলা হয়েছে এবং একে নিন্দা করা হয়েছে। তালাক কি পরিমাণ নিন্দনীয় ও গর্হিত কাজ তা এ হাদিস থেকে জানা যাবে। 'তোমরা বিয়ে কর কিন্তু তালাক নিও না কেননা তালাক দিলে তার দরুন আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠে। [৩৮৪]

তালাক দানকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে তার প্রমাণ আমরা পাই এ হাদিস থেকে হুজুর (সা) হযরত হাফসা (রাঃ)-কে তালাক দিলে আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সা)-কে আদেশ করলেন যে, আপনি হাফল্যকে রেজায়াত করুন (ফিরিয়ে আনুন)। কেননা সে নামাজ পড়ে রোজা রাখে। অন্য বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ তায়ালা

---

[৩৮০] আল কুরআন, সূরা নেছা, আয়াত, ৩৪।

[৩৮১] পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৬।

[৩৮২] পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৬।

[৩৮৩] পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৭।

[৩৮৪] পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৭।

প্রত্যেক তালাকনামাকে অভিসম্পাত করেন। ইহার অর্থ বিনা প্রয়োজনে তালাক দেয়া।[৩৮৫]

> হুজুর (সা) হতে বর্ণিত আছে যে, 'যে স্ত্রী নিজের সহিত অন্যায় বিহীন খোলা করাল স্নায় ওপর আল্লাহর ফেরেশতা ও সমস্ত লোকের অভিসম্পাত্র।'[৩৮৬]

তালাক দানের পদ্ধতি

আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, যাবতীয় জায়েজ কাজের মধ্যে তালাক হচ্ছে একটি নিকৃষ্ট জায়েজ কাজ। আল্লাহ ও তার রাসুল্লাহ (সাঃ) তালাককে অপছন্দ ও নিরুৎসাহিত করেছেন। তালাকের ব্যাপারে ইসলামের নীতিমালা হলো এমন যে, তালাকের বিধান আল্লাহ চালু রাখলেও তালাক যেন না হয় তা অথবা নীতিমালা হলো এমন যাতে বিয়ে ভেঙে না যায়। কোনো রকমভাবে হলেও বিয়ে যেন টিকে থাকে। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২২৯ ও ২০০ নং আয়াত মোতাবেক তালাক তিনবারে সম্পন্ন করতে হবে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

> 'তালাক দু'বার দেয়। অতপর হয় সোজাসুজি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিবে, অন্যথায় সঠিক পন্থায় তাকে বিদায় করে দেবে।'[৩৮৭]
>
> 'অতঃপর (দু' বার তালাক দেওয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে) তৃতীয়বার যদি তালাক দেয় তবে সে স্ত্রী তার পক্ষে (বিবাহ যোগ্য) হালাল হইবে না।'[৩৮৮]

পবিত্র কুরমানের আলোচ্য আয়াতদ্বয় মোতাবেক ৩ বারেই ৩টি তালাক দিতে হবে। অর্থ্যাৎ যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বনিবনার সম্ভাবনা না থাকে তবে প্রথম তুহুরে[৩৮৯] (হায়েজ[৩৯০] থেকে পবিত্রাবস্থায়) এক তালাক দেবে। এতে যদি উভয়ের মধ্যে মিলমিশ বা সংশোধন হয়ে যায় হবে তা উত্তম, না হলে দ্বিতীয় তহুরে দ্বিতীয় আরেকটি তালাক দিয়ে দেবে। এমতাবস্থায় যদি তাদের মধ্যে আপোষ হয়ে যায় তবে তারা একত্রে বসবাস করতে পারবে। আর যদি কোনোভাবে মিটমাট করা না যায় তবে তৃতীয় তহুরে আরেকটি তালাক দানের মাধ্যামে

---

[৩৮৫] শরহে বেকায়া, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৮।

[৩৮৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

[৩৮৭] আল কুরআন সূরা বাকারা-২২৯।

[৩৮৮] আল-কুরআন, আয়াত-২৩০।

[৩৮৯] **তহুর:** মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাবের বাইরে যে সময়টুকু তাকে তাকে তুহুর সময় বলা হয়।

[৩৯০] **হায়েজ:** প্রতি মাসে নারীদের জরায়ু থেকে নিদিষ্ট দিনসমূহে যে রক্তস্রাব বের তাকে হায়েজ নামে অভিহিত করা হয়।

স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হায় যাবে। তৃতীয় তালাক দানের পর তারা পুনরায় বিয়ে করতে পারবে না। পবিত্র কুরআনে তালাক সম্পর্কিত বক্তব্য-

> 'যে সব স্ত্রীলোককে তালাক দেয়া হইয়াছে। তাহারা যেন তিন বার মাসিক ঋতু আসা পর্যন্ত নিজেদিগকে বিরত রাখে। আল্লাহ তাহাদের গর্ভে যা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা গোপন রাখা তাহাদের পক্ষে জায়েজ নয়। এরূপ করা তাহাদের কিছুতেই উচিত নয়। যদি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি তাদের ঈমান থেকে থাকে। তাদের স্বামী যদি পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনে রাজী হয় তবে তাহারা এ অবকাশের মধ্যে তাহাদিগকে নিজেদের স্ত্রীরূপে ফিরাইয়া লওয়ার অধিকারী হইবে। নারীদের জন্য সেইরূপ অধিকারই নির্দিষ্ট রহিয়াছে যেমন তাহাদের ওপর। পুরুষদের অধিকার রহিয়াছে। অবশ্য পুরুষদের জন্য তাহাদের ওপর একটি বিশেষ মর্যাদা রহিয়াছে। আর সকলের ওপর আল্লার হইতেছেন ক্ষমতাশালী এবং তিনিই হইতেছেন বিজ্ঞ সুবিবেচক।[৩৯১]

আল্লাহ তাআলা বৈবাহিক সম্পর্ক রক্ষা ও পারিবারিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে তালাককে একটি নিয়ন্ত্রিত ও বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়া হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। কুরআনে বলা হয়েছে–

> তালাক দুই বার দেয়। অতপর হয় সোজাসুজি স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইবে অন্যথায় সঠিক পন্থায় তাহাকে বিদায় করিয়া দিবে। বিদায় দেয়ার সময় এরূপ করা তোমাদের জন্য জায়েজ নয় যে, তোমরা যা কিছু তাহাদিগকে দিয়াছ তাহা হইতে কোনো কিছু ফিরাইয়া লইবে। অবশ্য এ অবস্থা স্বতন্ত্র যখন স্বামী-স্ত্রী খোদার নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করিতে পারিবে না বলিয়া আশংকা হইবে। এরূপ অবস্থায় যদি তোমাদের ভয় হয় যে, ইহারা পরস্পরের মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেয়া যে, স্ত্রী স্বামীকে কিছু বিনিময় দান করিয়া বিচ্ছেদ ঘটাইয়া লইবে-কিছু মাত্র দোষণীয় নহে। বস্তুত ইহা খোদার নির্দিষ্ট সীমা বিশেষ, ইহা অতিক্রম করিও না। আর যাহারাই খোদার নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করে তাহারাই জালেম।'[৩৯২]
>
> "অতঃপর (দুইবার তালাক দেয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে তৃতীয় বার) যদি তালাক দেয় তবে সে স্ত্রী তার পক্ষে (বিবাহ যোগ্য) হালাল হইবে না। অবশ্য তখন সে পুনরায় তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে, যদি অপর কোনো ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহ হইয়া যায় এবং সে তালাক দেয়। তখন যদি প্রথম স্বামী ও স্ত্রী লোকটি মনে করে যে তাহারা খোদার বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করিতে পারিবে। তবে তাহাদের পুর্নমিলনে কোনো দোষ নেই। ইহাই খোদায় নির্দিষ্ট

---

[৩৯১] সূরা বাকারা, আয়াত ২২৮।

[৩৯২] সূরা বাকারা, আয়াত-২২৯।

সীমা, আল্লাহ সেই লোকের হেদায়তের জন্য ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন। যাহারা আহার সীমা লঙ্গন করার পরিণতি সম্পর্কে অবহিত।[৩৯৩]

'আর যখন তোমরা স্ত্রী লোকদের তালাক দাও এবং তাহাদের ইদ্দত[৩৯৪] পূর্ণ হইয়া আসে তখন হয় তাদের ভালভাবে ফিরাইয়া লও অথবা ভালভাবে বিদায় করিয়া দাও। শুধু কষ্ট দেয়ার জন্য তাহাদেরকে আটকাইয়া রাখিও না। কেননা তাহাতে বাড়াবাড়ি করা হইবে। আর যে এরূপ করিবে সে প্রকৃতপক্ষে নিজের ওপর জুলুম করিবে। খোদার আয়াতকে খেল-তামাশার বস্তু বানাইও না। ভুলিয়া যাইও না যে আল্লাহ তোমাদিগকে কত বড় নেয়ামাত দানে ধন্য করিয়াছেন। তিনিই তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যে, যে কিতাব ও যুক্তির বাণী তোমাদের জন্য নাযিল করিয়াছেন তাহার মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিও। খোদাকে ভয় কর। ভাল করিয়া জানিয়া লও যে তিনি তোমাদের প্রত্যেকের কথা ও কাজ সম্পর্কে পূর্ণ খবর রাখেন।[৩৯৫]

'তোমরা তখন নিজেদের স্ত্রীদের তালাক দেয়ার কাজ সম্পন্ন কর এবং তাহাবাও তাহাদের নির্দিষ্ট ইদ্দত পূর্ণ করিয়া লও, যখন তাহাদের প্রস্তাবিত স্বামীর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তোমরা বাধা হইয়া দাঁড়াইও না। যখন জাহারা সঠিক ও প্রচলিত পন্থায় পারস্পরিক বিবাহিত হইতে রাজী হইয়াছে। তোমাদিগকে এই উপদেশ দেয়া যাইতেছে যে, তোমরা কখানা এইরূপ কাজ করিবে না। যদি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক, তবে তোমাদের পক্ষে সুষ্ঠু ও পবিত্র কর্মনীতি এই হইতে পারে যে, তোমরা এই ধরনের কাজ হইতে বিরত থাকিবে। বস্তুত আল্লাহই জানেন, যা তোমরা জান না।[৩৯৬]

'হে ইমানদারগণ, তোমরা যখন ঈমানদার মহিলাদিগকে বিবাহ এবং তাহাদিগকে স্পর্শ করার পূর্বেই তাহাদিগকে তালাক দিবে তখন তোমাদের দিক হইতে তাহাদের কোনো ইদ্দত পালন করিবার আবশ্যকতা হইবে না। যাহ্য পূর্ণ করার জন্য তোমরা দাবি করিতে পার। কাজেই তাহাদিগকে কিছু সম্পদ দাও এবং অলজাবে ডাহাদিগকে বিদায় কর।[৩৯৭]

---

৩৯৩ সূরা বাকারা, আয়াত-২৩০

৩৯৪ **ইদ্দত:** ইদ্দত অর্থ সময়। এটা নারীদের সাথে সম্পৃক্ত। হায়েজের অবস্থাকে এ ইদ্দুতের মাধ্যমে হিসেবে গণনা করা যায়। স্ত্রীকে তালাক, হায়েজ, নেফাসের সময় ইদ্দত শব্দটি নারীর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

৩৯৫ সূরা বাকারা, আয়াত-২৩৯।

৩৯৬ সূরা বাকারা, আয়াত-২৩২।

৩৯৭ সূরা বাকারা, আয়াত-৪৯।

'হে নবী। তোমরা যখন স্ত্রী লোকদিগকে তালাক দিবে তখন তাহাদিগকে তাহাদের ইদ্দতের জন্য তালাক দাও। আর ইদ্দতের সমরকাল ঠিকভাবে গণনা করা। আয় আল্লাহকে ভয় কর যিনি তোমাদের রব। ইদ্দতকালে না ডোময়া ডাহাদিগকে তাহাদের বসবাসের ঘর হইতে বহিষ্কৃত কর। আর না তাহারা নিজেরা বাহির হইয়া যাইবে। তবে যদি তাহারা কোনো সুস্পষ্ট অন্যায় কাজ করিয়া বসে তবে অন্য কথা। ইহা আল্লাহর নির্দিষ্ট করা সীমা। আর যে কেহ আল্লাহ নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করিবে সে নিজের ওপর জুলুম করিবে। তোমরা জান সম্ভবত আল্লাহ উহার পর (মিলমিশের) কোনো অবস্থা সৃষ্টি করিয়া দিবেন।[৩৯৮]

'পরে যখন তাহারা নিজেদের (ইদ্দতের) সময়কালের শেষে পৌছিবে তখন হয় তাহাদিগকে ভালো ভাবে (নিজেদের স্ত্রীত্বে) বাঁধিয়া রাখিবে, না হয় ভালভাবে তাহাদের হইতে বিছিন্ন হইয়া যাইবে। আর এমন দুইজন লোককে সাক্ষী বানাইবে যাহারা তোমাদের মধ্যে সুবিচারবাদী হইবে। আর হে সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য ঠিক ঠিকভাবে আল্লাহর জন্য আদায় কর। এইসব তোমাদিগকে নসিহত স্বরূপ বলা হইতেছে-এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এই নসিহত যে, আল্লাহ ও পরকালের দিনের প্রতি যে বিশ্বাসী লোক আল্লাহকে ভয় করিয়া কাজ করিবে, আল্লাহ তাহার জন্য অসুবিধাজনক অবস্থা হইতে নিস্কৃতি পাওয়ার কোনো না কোনো পথ করিয়া দিবেন।[৩৯৯]

তালাক সম্পর্কিত কুরআনের বক্তব্যের নির্যাস

১. কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে বেশীর পক্ষে তিন সময়ে তিনবার তালাক দিয়ে পারে।

২. প্রথম তালাক দিলে ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে স্বামী ইচ্ছে করলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে পারে। কিন্তু ইদর পার হয়ে গেলে স্বামী ও স্ত্রী যদি চায় তাহলে আবার বিয়ে হতে পারে।

৩. স্বামী যদি তার স্ত্রীকে ৩ বার তালাক দিয়ে ফেলে তাহলে তাদের মধ্যে আর বিয়ে হতে পারবে না। অবশ্য এ মহিলার যদি অন্যের সাথে বিয়ে হয় এবং সে যদি বিধবা হয়ে যায় অথবা তার স্বামী যদি নিজের ইচ্ছায় কোনো ধরনের উস্কানি ছাড়া তাকে তালাক দেয় তাহলে ইদ্দতের পর আগের স্বামীর সাথে পুনরায় বিয়ে হতে পারে।

---

[৩৯৮] সূরা বাকারা, আয়াত-১

[৩৯৯] সূরা তালাক, আয়াত-২।

৪. যে মহিলার হায়েজ (মাসিক) হয় সে যদি একবারও স্বামীর সাথে মিলিত হয়ে থাকে তাহলে আর ইদ্দত হলো তিন হায়েজ (মাসিক) অর্থ্যাৎ ডালাকের পর তিনটি হায়েজ (মাসিক) শেষ হতে হবে।

৫. এক বা দু'তালাকের বেলায় তিনটি হায়েজ (মাসিক) পার হওয়ার আগ পর্যন্ত সে স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকে বলেই স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু তিন তালাকের পর যে ইদ্ধত শুরু হয় যাতে এ স্বামীর কোনো অধিকার থাকে না। এ ইদ্দরের উদ্দেশ্য হলো যে, অন্য পুরুষ তাকে বিয়ে করতে হলে ইদ্দত শেষ হতে হবে। ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে বিয়ে করতে পারবে না।

৬. যে মহিলা বিয়ের পর একবারও স্বামীর সাথে মিলিত হয়নি তাকে তালাক দিলে ইদ্দত পালন করতে হবে না। ইদ্দত পার হওয়ার আগে তার আবার বিয়ে হতে পারবে।

৭. যে মহিলার স্বামী মারা যায় তার ইদ্দত হলো ৪ মাস ১০ দিন।[৪০০]

পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারা, আহযাব ও তালাকের মধ্যে উপর্যুক্ত মূলনীতিসমূহ বিধৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তালাক দানের এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে তালাক দিতে হবে। তালাকের ক্ষেত্রে কুরআনে মহান আল্লাহ রাসূল আলামিন প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী তালাকের নীতিমালা অনুসরণ করা হয় তবে সামাজিক সমস্যা হবে না। অথচ আজকে আমাদের সমাজে মনগড়া নীতিমালা তৈরি করে তালাক ও হিলার সে পন্থা চালু করা হয়েছে এর প্রতিনিয়ত মারাত্মক সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। মহান আল্লাহ সকল মানুষের দ্রষ্টা হিসেবে তার দেয়া বিধানই একমাত্র সমাধানের পথ এতে কোনো সন্দেহ নেই। তালাকের এ মৌলিক নীতিমালা ছাড়া পবিত্র কুরআন থেকে নিম্নের আরো কতিপয় বিধান আমরা দেখতে পাই।

১. তালাক দিলে ইদ্দতের হিসাব মনে রাখবে। তাহলে ইদ্দত পার হওয়ার আগে ফিরিয়ে নিতে চাইলে হিসেবের গোলমাল হবে না। ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিতে চাইলে আবার বিয়ে পড়াতে হবে না। কিন্তু ইদ্দত পার হয়ে গেলে ফিরিয়ে নেবার জন্য আবার নতুন করে বিয়ে হতে হবে। তাই ইদ্দতের হিসেব রাখা খুবই জরুরি।

---

[৪০০] আদালতের কাঠগড়ায় ফতোয়া বিবাহ তালাক দেশ বরেণ্য আলেমদের অভিমত, তোহিদুর রহমান সম্পাদিত, পৃ, ৮৯।

২. 'ইদ্দতের উদ্দেশ্যে তালাক দাও' আল্লাহপাকের এ কথাটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। এর অর্থ হলো, এমন নিয়মে তালাক দাও যাতে ইদ্দতের হিসাব রাখতে অসুবিধা না হয়। এ হুকুমের দাবি পূরণ করতে হলে।

(ক) হায়েজ (মাসিক) অবস্থায় তালাক দেয়া যাবে না। তালাকের পর ইদ্দত হলো ৩ হায়েজ (মাসিক)। হায়েজ অবস্থায় তালাক দিলে ঐ হায়েজ ইদ্দতের মধ্যে গোনা যাবে না কারণ হায়েযের একাংশ পার হয়ে গেছে। অতএব তালাকের পর যে হায়েজ শুরু হবে তা থেকে ইদ্দত গণনা শুরু করতে হবে।

(খ) যে তুহুরে (হায়েজের পর পবিত্রাবস্থা) স্ত্রীর সাথে রাত যাপন করা হয় সে তুহরেও তালাক দেয়া যাবে না। কারণ এ সময় গর্ভবর্তী হলে হায়েজ বন্ধ হয়ে যায়। এতে ইদ্দতের হিসাব রাখা সমস্যা হবে। ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিতে চাইলে সঠিক হিসাব রাখার ব্যাপারে সমস্যা সৃষ্টি করা উচিত নয়।

(গ) স্ত্রীর গর্ভে সন্তান আছে বলে নিশ্চিত হলে গর্ভাবস্থায়ও তালাক দিতে পারে। এতেও ইদ্দত গণনায় সমস্যা হয় না।

(ঘ) এক সাথে তিন তালাক দেয়া যাবে না। কারণ তিন তালাক দিয়ে ফেললে তালাক দাতার জন্য ইদ্দত গণনার দরকার থাকে না। তিন তালাক হয়ে গেলে ইদ্দতের মধ্যে বা পরে। স্ত্রীকে নেয়ার কোনো সুযোগই আর বাকী থাকে না। তাই 'ইদ্দতের উদ্দেশ্যে তালাক দাও' বলে আল্লাহ যে হুকুম দিলেন তা একসাথে তিন তালাক দাতার ব্যাপারে খাটেনা। 'ইদ্দতের উদ্দেশ্যে তালাক দাও' কথাটি দ্বারা এক সাথে তিন তালাক না দেয়ার হুকুমই বুঝা যায়।

৩. এক বা দুই তালাকের বেলায় যেহেতু আবার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবার সুযোগ আছে, সেহেতু তালাকের পর স্বামী-স্ত্রী একঘরে থাকা উচিৎ। এতে অপরের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণের কারণে একঘরে থাকলে মিলমিশ হয়ে যেতে পারে।

৪. অবশ্য যদি একঘরে থাকার কারণে ঝগড়া ফ্যাসাদ হয় ও পারিবারিক অশান্তি বেড়ে যায় বা দু'জনের কেউ বাড়াবাড়ি করে তাহলে একত্রে না থাকা উচিত।

৫. এক বা দুই তালাকের বেলায় ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে হয় সুন্দর পরিবেশে আবার বিয়ে বহাল করে নাও। আর না হয় ভদ্রভাবেই বিয়ে ভেঙে দাও। কোনো ঝগড়া বিবাদ করো না। বিয়ে বহাল রাখা বা ভেঙে দেয়ার ক্ষেত্রেই দুই জন নিরপেক্ষ সাক্ষী রাখ যাতে স্বামী ও স্ত্রী যে সিদ্ধান্ত নেয় তা পালন না করলে সাক্ষীদের সাহায্যে বিচার করা সহজ হয়।[৪০১]

---

[৪০১] প্রাগুক্ত, পৃ ৯১।

তালাকের শ্রেণি বিভাগ

তালাককে নিম্নলিখিত শ্রেণি বিভাগে ভাগ করা যায়:

১. তালাকের জন্য ব্যবহৃত শব্দের স্পষ্টতা ও অস্পটতার ভিত্তিতে তালাককে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) স্পষ্ট ও পরিস্কার শব্দ দ্বারা তালাক প্রদান

(খ) অস্পষ্ট বা ইঙ্গিতবাহী শব্দ দ্বারা তালাক প্রদান

২. তালাক কার্যকরী অথবা অকার্যকর করার ভিত্তিতে।

(ক) তালাকে রাজঈ বা ফেরৎ যোগ্য তালাক

(খ) গায়রে রাজঈ বা অফেরৎযোগ্য তালাক

৩. শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি বা অবস্থান অনুযায়ী

(ক) তালাকে সুন্নাত[৪০২]

(খ) তালাকে বিদায়ত[৪০৩]

৪. শর্ত সাপেক্ষতার ভিত্তিতে

(ক) শর্তযুক্ত তালাক

(খ) শর্তবিহীন তালাক[৪০৪] ইসলামী শরিয়ত ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা এখানে তালাকের গুরুত্বপূর্ণ দুই প্রকার বা ধরনের আলোচনা করব। এই প্রকার সর্বাধিক আলোচিত ও প্রযোজ্য এবং অধিকাংশ আলেমগণ এ বিষয়ে একমত।

তালাকে সুন্নাত

তালাকের সুন্নাত হলো এমন তালাক যা পরিয়র কর্তৃক অনুমোদিত। কুরআন ও হাদিসে যে প্রকার তালাকের বর্ণনা করা আছে এবং যাকে কুরআন ও হাদিস সমর্থন করেছে। সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে আজ অবধি যাকে উত্তমপন্থা হিসেবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াতটি ভালাকের আলোচ্য শ্রেণি বিভাগের প্রমাণ বহন করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন, 'হে নবী। যখন তোমার স্ত্রীদিগকে তালাক দাও তখন তাদের ইদ্দতকালীন সময় নিয়ে তালাক দাও।'[৪০৫]

---

৪০২ **তালাকে সুন্নাত:** তিন তহুরের মধ্যে একবার একবার করে তালাক দেয়া। উদ্দেশ্য যেন উভয়ে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে শুধরিয়ে আবার ফিরে আসে।

৪০৩ **তালাকে বেদায়াত** একসাথে তিন তালাক দেয়া অথবা হায়েজ, নেফাজ অবস্থায় তালাক দেয়া।

৪০৪ প্রাগুক্ত, পৃ ৯১।

৪০৫ আল কুরআন, সুরা তালাক আয়াত ১।

তালাকে সুন্নাতের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উল্ল্যেখ পাওয়া যায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর নিম্নোক্ত হাদিস থেকে। ইবনে মাসুদ এবং ইবনে আববাস (রা) এর দ্বারা বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত ওমর (রা) এর পুত্র তার স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। একথা হযরত মুহাম্মদ (সা) কে হযরত ওমর (রা) জানালে তিনি বললেন, ডাকে তালাক ফেরৎ নিতে বলো এবং নিজের কাছে রাখতে বল তহুর পর্যন্ত। তারপরে হায়েজ তারপরে আধার তহুর তারপরে হায়েজ আবার তহুর পর্যন্ত। এরপরে তালাক দিতে চাইলে ৩াকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিবে।[৪০৬]

তালাকে সুন্নাহর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ রহিয়াছে

(ক) তিন তালাক আলাদা আলাদাভাবে দিতে হবে।

(খ) ইদ্দত পালদের সুযোগ দিতে হবে।

(গ) হায়েজ অবস্থায় তালাক নেয়া যাবেনা

(খ) যে তুহরে স্পর্শ করা হয়েছে, সে তত্ত্বর তালাক দেয়া সুন্নাত অনুযায়ী ঠিক নয়।[৪০৭]

তালাকে বিদায়াত

তালাকের যে পন্থা বা প্রক্রিয়া কুরআন ও হাদিস দ্বারা সমর্থিত নয় এবং বলা যায় যাহা নূতনভাবে চালু করা হয়েছে যেই পন্থা বা প্রক্রিয়ার সাথে সাহাবায়ে কেরাম পরিচিত ছিলেন না অথবা তাঁরা সাধারভভাবে যার চর্চা করেননি তাকে তালাকে বিদায়াত বলে। এই প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি হলো সম্পূর্ণরূপে সুন্নাতপন্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমন এর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ।

(ক) আলাদা আলাদাভাবে তিন তালাক দানের পরিবর্তে এক শব্দে বা একত্রে তিন তালাক প্রদান করা।

(খ) যে তুহুরে স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন ঘটিয়াছে সে তুহুরে স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করা।

(গ) হায়েজ বা নিফাস অবস্থায় তালাক দেয়া।

(ঘ) যে ক্ষেত্রে ইদ্দতের সুযোগ দেয়া প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে তার সুযোগ না দেয়া।[৪০৮]

---

[৪০৬] তালাক ও হিলাহ: শরীয়াহ ও প্রচলিত আইদের তুলনামূলক আলোচনা, পৃ. ২৮।

[৪০৭] প্রাগুক্ত, পৃ ৪১।

[৪০৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

মূলকথা হলো সুন্নাত তরিকার পরিপন্থী হিসেবে তালাক দিলে তাকে তালাকে বেদায়াত বলে। এরূপ পন্থায় তালাক দিলে তালাক হয়ে যাবে তবে সুন্নাত তরিকা বা কুরআন হাদিসের নিয়ম মাফিক না হওয়ায় তালাক দানকারী অবশ্যই গুনাহগার হবে। কেউ কেউ আবার এরূপ তালাক দেয়াকে হারাম[৪০৯] কাজ, মাকরূহ'[৪১০] এ তাহরীম'[৪১১] বলে অভিহিত করেছেন।

তালাক প্রয়োগের শর্ত ও ইসলামী দর্শন

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। মানব জাতির দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত, প্রেসিডেন্ট থেকে চৌকিদার পর্যন্ত মানব জীবনের এমন কোনো দিক ও বিভাগ বাদ নেই যে সম্পর্কে ইসলাম দিক নির্দেশনা দেয়নি। বিশ্ব প্রকৃতির স্রষ্টা ও লালনকারী হিসেবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের জন্য সর্বোত্তম ও কল্যাণময় বিধান দান করেছেন। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের মধ্যে রয়েছে মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি। মহান আল্লাহই একমাত্র ভাল জানেন কিসে মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি, সে হিসেবে তার দেয়া বিধান যে সর্বোত্তম হবে তাতে আর সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। অনুরূপভাবে বিবাহ তালাক ও দাম্পত্য জীবনের কল্যাণমূলক আইন কেবল তারই দেয়া বিধানই হতে পারে।বিশেষ কোনো পরিস্থিতি যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তালাক দেয়া ছাড়া একজন মানুষের পক্ষে আর কোনো গত্যন্তর থাকে না। এমতাবস্থায় এটি অনুমোদিত হলেও ইসলামী শরিয়তে এটাকে ঘৃণা ও নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। তালাক দানের জন্য ইসলাম এমন কতিপয় শর্ত জুড়ে নিয়েছে যে, যাতে কয়ে মানুষ তালাক দানের দিকে চূড়ান্তভাবে না আগায় অথবা তালাক দিলেও দশ বার এর ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবে নেয়। বিয়ে ও সাম্পত্য জীবনের মত অপরিহার্য ও পবিত্র সম্পর্কে যেন রাগ, খামখেয়ালীপনা ও আপরিণামদর্শিতার জন্য ভেসে না ফেলে। সে কারণে তালাক কার্যকরী করতে ইসলাম এমন কতিপয় শর্ত দিয়েছে যাতে করে অতি সহজে তালাক কার্যকরী করা না যায়। এভাবে একে কষ্টসাধ্য করা হয়েছে। তালাকের অবশ্যম্ভাবী ক্ষতিকর ফল স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ছাড়াও আত্মীয়-স্বজন এমন কি

---

[৪০৯] তালালের বিপরীত শব্দ। কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে যা স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে তাই হারাম হিসেবে অভিহিত হবে।

[৪১০] **মাকরূহ:** কুরআন ও হাদিস যা স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়নি আবার স্পষ্টভাবে হালালও করা হয়নি। মাকরূহ শব্দের অর্থ অপছন্দনীয়, যা জনসাধারণ ভালোভাবে গ্রহণ করে না বা বিবেকে অশুচি বলে মনে হয়।

[৪১১] **তাহরীমী:** যা নিষেধ করা হয়েছে। যা থেকে বেঁচে থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সমাজের সকলকে ভোগ করতে হয়। যার ভয়াবহতা বর্ণনাতীত ও অপরিমেয়। কেবলমাত্র ভুক্তভোগীরাই তা অনুধাবন করতে পারে।

তালাকের ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সাথে তার সন্তানেরাও। স্ত্রীর ক্ষেত্রে আর স্বামীর ভালবাসা তার অভিভাবকত্ব ভরণ-পোষণ বাসস্থানসহ এক অনিশ্চিত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সন্তান সন্ততি বাবা মায়ের বিচ্ছেদের দরুন মানসিক যন্ত্রণা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান শিক্ষা দীক্ষা ও স্নেহ ভালবাসা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়ে অমানিশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। তালাক যৌক্তিক ও অপরিহার্য হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত রয়েছে তা বহাল থাকলে তালাক শরিয়ত সম্মত ও বৈধ হবে। না হলে সে তালাকের জন্য আল্লাহর অভিশাপের মধ্যে নিপতিত হতে হবে।

তালাক শরিয়ত সম্মত হওয়ার জন্য নিম্নের শর্তাবলী অপরিহার্য

১. তালাকের অপরিহার্যতা থাকতে হবে এবং তালাক হবে যৌক্তিক কারণে

২. তিন তালাক তিন বার অর্থ্যাৎ আলাদা আলাদাভাবে দিতে হবে।

৩. তালাক এমন তহুরে দিতে হবে যে তহুরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দৈহিক মিলন হয়নি। [৪১২]

(ক) ইসলাম চায় যে কোনোভাবে তালাক ঠেকাতে

তালাক দ্রুত কার্যকর করার ব্যাপারে ইসলামের অনীহার কারণ ইসলাম সকল যায়েজ কাজের মধ্যে তালাককে নিকৃষ্ট হিসেবে গণ্য করেছে। ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো যাতে করে ডালাক না হয়ে বিয়ে যে কোনোভাবে হউক টিকে থাকে। বিয়ে টিকিয়ে রাখার জন্য নিম্নোক্ত কারণসমূহকে বিশেষভাবে গণ্য করা যায়।

(খ) তালাক দানের সময় ঘর থেকে বের না করা

১. ইসলাম চায় যদিও কোনো কারণে তালাক দানের মত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় অথবা তালাক দিয়ে দেন তবুও যেন স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দেয়া না হয়। এতে করে হয়ত একজনের প্রতি অন্যজনের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে তারা আবার মিলমিশ করে ফেলতে পারে। নিম্নের কুরআন হাদিস থেকে তারই প্রমাণ পাওয়া যাবে।

> ‘তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও তাদেরকে তাদের ইদ্দতের মধ্যে পুনঃগ্রহণের সুযোগ রেখেই তালাক দাও। ইদ্দতের সময় গুনতে থাক এবং

[৪১২] তালাক ও হিলাহ শরীয়াহ ও প্রচলিত আইনের তুলনামূলক আলোচনা, পূর্বোক্ত, পৃ-২৮।

তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর। ইদ্দত চলাকালে তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দিও না এবং তারাও বের হয়ে যাবে না।[৪১৩]

যে সব স্ত্রীলোককে তালাক দেয়া হয়েছে তারা তিন বার মাসিক ঋতু আসা পর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখবে। তাদের স্বামীরা যদি পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনে রাজী হয় তাহলে তাহারা এ অবকাশের মধ্যে তাদেরকে নিজেদের স্ত্রীরূপে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী হবে।[৪১৪] এর সাথে এও নির্দেশ রয়েছে যে, তিন মাসের এ সময়ের মধ্যে স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দিও না বরং নিজের কাছেই রাখো। আশা করা যায় সহাবস্থানের ফলে পুনরায় আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপনের কোনো উপায় বের হবে।

(গ) তালাক তিন মাসে ৩ বার দিতে হবে

পবিত্র কোরআনের ভাষ্য মোতাবেক তালাক তিন মাসে এবং তিন বারে দিতে হবে। যাকে শরিয়তের পরিভাষায় তালাকে সুন্নাহও বলা হয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'তালাক দুই বার দাও অতঃপর হয় স্ত্রীকে সোজাসুজি ফিরাইয়া লইবে অন্যথায় সোজাসুজি তাহাকে বিদায় করিয়া দেবে। [৪১৫]তিনবারে তালাক দিলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মীমাংসা করার সুযোগ থাকবে। যাতে করে চূড়ান্তভাবে তালাক হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

(ঘ) মীমাংসা/নিষ্পত্তি করার জন্য সালিশ নিয়োগ

তালাকের হাত থেকে পরিবারকে রক্ষার জন্য সালিশের ওপর ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। হাদিসে বলা হয়েছে, যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনোবিরোধ মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে কর তাহলে তোমরা স্বামীর পরিবার থেকে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন বিচারক পাঠাও। তারা দু'জন যদি বাস্তবিকই অবস্থার সংশোধন করতে চায় তাহলে আল্লাহ তাদের জন্য সে তওফিক দান করবেন।[৪১৬]

বাহিরের অনাত্মীয় লোক বিচারে বসলে কোনো এক পক্ষের দিকে ঝুঁকে পড়ার ধারণা হতে পারে। কিন্তু উভয়েরই আপন আত্মীয় যদি এ মীমাংসার ভার গ্রহণ করে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ পক্ষের কথা বলে তাহলে এ ধরনের কোনো ধারণার অবকাশ থাকে না। এ জন্য আত্মীয় ও আপন লোককে এ বিরোধ মীমাংসার ভার দিতে বলা হয়েছে।[৪১৭]

---

[৪১৩] সূরা তালাক, আয়াত-১

[৪১৪] সূরা বাকারা, আয়াত-২২৮।

[৪১৫] সূরা বাকারা, আয়াত-২২৯।

[৪১৬] নাসাঈ শরীফ।

[৪১৭] আহকামুল কুরআন, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ ২৩১।

হযরত আলীর খেদমতে এক দম্পত্তি বহুসংখ্যক লোক সমভিব্যবহারে উপস্থিত হলে তিনি ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করলেন। তারা উত্তরে বললেন-এই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে তার মীমাংসা চাই। তখন হযরত আলী (রা) বললেন-উভয়ের আপন আত্মিয়ের মধ্য থেকে এক-একজনকে এ বিরোধ মীমাংসায় নিযুক্ত করে দাও। যখন দু'জন লোককে নিযুক্ত করা হলো তখন হযরত আলী (রা) বললেন তোমাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা কি জান? তারপরে তিনি নিজেই বললেন।[৪১৮]

(ঙ) পবিত্রাবস্থায় তালাক দান

তালাক দানের সময় সীমার মধ্যে যৌন আকর্ষণের কারণে হয়তো তালাক দান থেকে বিরত থাকতে পারে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও তাদেরকে তাদের ইদ্দতের মধ্যে পুনঃ গ্রহণের সুযোগ রেখেই তালাক দাও। ইদ্দতের সময় গুনতে থাক এবং তোমাদের প্রতি পালককে ভয় কর।'[৪১৯]

আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, হায়েজ অবস্থায় নয় বরং তহুরে তালাক দিতে হবে। এর কারণ নিম্নরূপঃ

১. হায়েজ অবস্থায় নারীরা সাধারণত খিটখিটে মেজাজ ও চঞ্চলমতি হয়ে যায়। এ সময় তাদের শারীরিক অবস্থার মধ্যে এমন কিছু পরিবর্তন ঘটে যে, তাদের থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন সব কথা বার্তা প্রকাশ পায়, যা তারা নিজেরা ও স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকাশ করা পছন্দ করে না। এ হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক নিগুঢ়তত্ত্ব। এ জন্য হায়েজ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে বিবাদ ঘটে তার ভিত্তিতে তালাক নিষেধ করা হয়েছে।

২. হায়েজ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক থাকে না, যা তাদের পারস্পরিক চিত্তাকর্ষণ ও প্রেম ভালবাসার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এ সময় উভয়ের মাঝে তিক্ততা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। এ প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যাবার পর আশা করা যায় যে যৌন আকর্ষণ পুনরায় স্বামী-স্ত্রীকে দুধ চিনির মত পরস্পর মিলিয়ে দেবে এবং যে মলিনতা স্বামীকে তালাক দেয়ার দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছিল তা দূর হয়ে যাবে।[৪২০]

---

[৪১৮] পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮০।

[৪১৯] আল কুরআন, তালাক, আয়াত ১।

[৪২০] স্বামী স্ত্রীর অধিকার, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৮।

(চ) তিন তালাকের পর স্ত্রীকে পাওয়া যাবে না

তালাকের পথে এতটা প্রতিবন্ধকতা রাখার পর সর্বশেষ এবং সবচেয়ে কঠিন যে প্রতিবন্ধকতা রাখা হয়েছে তা হচ্ছে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মুগাল্লাজা (অফেরতযোগ্য) তালাক দেবে, সে এ স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ে করতে পারবে না। যে পর্যন্ত না সে অপরের কাছে বিয়ে না বসবে এবং সে ব্যক্তিও তার সাথে যৌন সম্ভোগের পর স্বেচ্ছায় তালাক না দেবে। মহান আল্লাহর বাণী 'অতঃপর (দুই তালাক দেয়ার পর) স্বামী যদি স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) তালাক দেয় তবে এ স্ত্রী লোকটি তার জন্য হালাল (পুনরায় বিবাহ যোগ্য) হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য পুরুষের সাথে তার বিয়ে না হয় এবং সে তাকে স্বেচ্ছায় তালাক না দেয়।[৪২১]

এ হচ্ছে এমনি এক কঠিন শর্ত, যার কারণে কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দেয়ার পূর্বে শত বার চিন্তা করতে বাধ্য হবে। যতক্ষণ সে ভাল করে চিন্তা ভাবনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে না পৌছবে যে, এ স্ত্রীর সাথে তার আর বসবাস করা সম্ভব নয় ততক্ষণ সে তৃতীয় তালাকের নামও নেবে না। দুই বার দুই তালাক দেয়ার পর পুনরায় স্ত্রীকে ফেরৎ নিতে হলে দু'জন সাক্ষী রাখতে হবে কেননা স্বামী হয়ত পরবর্তীতে তার ওয়াদা ভঙ করে আবার তালাক দিতে পারে। সে জন্য সাক্ষী রাখতে হবে। তালাকের ক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থান সদাসর্বদা নারীর পক্ষে এবং সকল চেষ্টা প্রচেষ্টার মূল হাচ্ছে যেন জালাক ঠেকানো যায়

হিলা

হিলা[৪২২] শব্দের আভিধানিক অর্থ কৌশল।[৪২৩] অন্য কথায় হিলাকে ধোঁকাও বলা যেতে পারে। 'হিলা' শব্দটি উর্দুতে ব্যবহৃত হয়, তবে ফারসি ও আরবি ভাষায় এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। শরীয়তেও হিলাহ-এর বদলে তাহলীল শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো অবৈধ কাজকে বৈধ করার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাকে হিলাহ বলা হয়। শরীয়তের কোনো বিধান বিশেষত তালাক এড়ানোর জন্য আমাদের সমাজে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাকে হিলাহ বলা হয়। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে সাধারণত তিন তালাকপ্রাপ্তা কোনো

---

৪২১ আল কুরআন সূরা বাকারা ২৩০।

৪২২ আরবি শব্দ। স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর স্ত্রীর যদি অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায় এবং বতমান স্বামী যদি তালাক দিয়ে দেয় তাহলে স্ত্রী প্রথম স্বামীর কাছে আবার বিবাহের মাধ্যমে ফিরে যেতে পারে। তাবে ২য় স্বামীর সাথে দৈহিক মিলত হতে হবে। আর স্বেচ্ছায় বাধ্য হয়ে নয় সে স্ত্রীকে তালাক দিবে তাহলেই কেবল প্রথম স্বামী তাকে বিবাহ করতে পারবে।

৪২৩ তালাক ও হিলাহ শরীয়াহ ও প্রচলিত আইনের তুলনামূলক আলোচনা পূর্বাক্ত, পৃ-৫৯।

মহিলা যদি তায় পূর্বতন স্বামীর কাছে ফিরে যাবার জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাকে হিলাহ পদ্ধতি বলা হয়।

শরীয়তে নিকাহ-এ মুহাল্লাল এর ব্যবস্থা রয়েছে। নিকাহ এ মুহাল্লাল এমন বিয়েকে বলা হয় যা শুধুমাত্র পূর্বতন স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়াকে বৈধ বা হালাল করার জন্য করা হয়েছে। এ ধরনের বিবাহকে প্রায় সব ইমামগণই তাদের মাযহাবে নিকাহ তাহলীল বা নিকাহ মুহাল্লাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৪২৪]

আমাদের দেশের লোকদেরকে সাধারণত ধর্মভীরু বলা হয়, কারণ দেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে এক ধরনের আবেগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু শরিয়তের মৌলিক ভিত্তি কুরআন ও হাদিস মোতাবেক জীবনের সামগ্রিক দিক ও বিভাগ পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহ ও আন্তরিকতা তেমন দেখা যায় না। ঠিক একই ভাবে আমরা লক্ষ্য করি তালাক দানের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান ও স্পিরিট মোটেও লক্ষ্য করা হয় না। বরং খেয়াল খুশিমত যখন তখন যেভাবে মন চায় সেভাবে তালাক দেয়া হয়। আবার একইভাবে তালাক দানের পর যখন পরিবারিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়েন তখন আবার যেনতেন ভাবে শরীয়তের বিধান উপেক্ষা করে স্ত্রীকে পাওয়ার জন্য পাগলপারা হয়ে পড়েন। এখানে অনেকে মনে করেন যে, তালাক দেয়া স্ত্রীকে পুনরায় নিয়ে আসা কোনো ধরনের কঠিন কাজ নয়।

আমাদের দেশে প্রচলিত হিলার যে ব্যবস্থা রয়েছে তা সত্যই দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। এখানে হিলার নামে এক ধরনের প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হয়। এই প্রতারণা মূলত করা হয় আল্লাহ ও তার রাসূলের (সা) সাথে। কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর পুনরায় তাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন এবং তালাক দানের পরই এই কেবল ভুল বুঝতে পারেন তালাক দেয়ার সময় নয়। স্কুল সংশোধনের জন্য একজনকে ঠিক করে তার নিকট শর্তসাপেক্ষে বিয়ে দেয়া হয়। শর্ত হলো এরূপ নির্দিষ্ট সময়ের পর তাকে তালাক দিয়ে দেবে। তার সাথে রাত্রিযাপন করবে কিন্তু যৌন মিলন করতে পারবে না। হিলাহকারী উক্ত মহিলাকে তালাক দিলে তার পূর্বতন স্বামী তাকে বিয়ে করবে এবং পূর্বের ন্যায় ঘর সংসার করবে।

আমাদের সমাজে কি ধরনের হিলা বিয়ের প্রচলন রয়েছে নিম্নের উদাহরণ থেকে এর কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে। ১৫ জানুয়ারি ২০০৩ তারিখের প্রথম আলো

---

[৪২৪] প্রাগুক্ত, পৃ ৫৯।

পত্রিকার রিপোর্ট মোতাবেক জানা যায়, বগুড়া জেলার আদমদীঘি থানার কুন্ডুগ্রাম ইউনিয়নের শিববাটি গ্রামের জয়দেবপুর পাড়ায় ঘটনাটি ঘটে।

মুর্শিদার ভাষ্য মোতাবেক বিগত সাত বছর পূর্বে একই গ্রামের প্লাষ্টিক সামগ্রী বিক্রেতা আব্দুর রহীমের সাথে তার বিয়ে হয়। অভাবের কারণে তাদের মধ্যে ছোটখাট ঝগড়া প্রায় লেগেই থাকত। ঘটনার দিন এ ধরনের ঝগড়া চলার সময় হঠাৎ স্বামী তাকে মৌখিক তালাক দিয়ে বসেন। পরে তালাক উচ্চারণ করা তার জ্বল হয়েছে স্বীকার করলেও বেঁকে বসেন গ্রামের সমাজপতিরা। গ্রামের মান্নান মুন্সী সালিশ বালিয়ে পৃথক করে দেন স্বামী ও স্ত্রীকে। এক সময় গ্রাম থেকে আড়িয়ে দেয়া হয় স্বামী আঃ রহীমকে। তিনটি সন্তান নিয়ে ধারণ কষ্টের মধ্যে পড়েন। মুর্শিদা স্বামীকে ফিয়ে পাওয়ার আশায় ঘুরতে থাকেন সমাজপতিদের দ্বারে দ্বারে। এ সময় মান্নান মুন্সী ফতোয়া জারী করেন হিলা বিয়ে ছাড়া স্বামীকে ফিরে পাওয়ার কোনো পথ নেই। হিলা বিয়েতে রাজী করানো হয় মুর্শিদাকে। গ্রামে কোনো পাত্র না পাওয়ায় পাশ্ববর্তী আলতাফ নগর স্টেশন থেকে প্রায় ৭০ বছরের একবৃদ্ধ ফকিরকে ধরে এনে বিয়ে পড়িয়ে দেওয়া হয় মুর্শিদার সাথে। বিয়ে পড়ল মান্নান মুন্সী নিজেই। বৃদ্ধের সঙ্গে চলে মুর্শিদার ১২ দিনের নতুন বৈবাহিক জীবন। এরপর সমাজপতিদের নির্দেশে ১২ দিন পর বৃদ্ধ তালাক দেয় মুর্শিদাকে। বৃদ্ধকে রেখে আসা হয় স্টেশানে। মুর্শিদার এখন চলছে ৩ মাস ১০ দিনের ইদ্দতকালীন সময়। স্বামী আব্দুর রহিম এখনও গ্রামছাড়া। মুর্শিদা জানায় তার স্বামীকে ফিরে পাবার জন্য সমাজপতিদের চাপিয়ে দেয়া এ কঠিন সিদ্ধান্ত তিনি মেনে নিয়েছেন।[৪২৫]

নেকাহ তাহলীল

তালাকের আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, সুন্নাত নিয়ম মোতাবেক তালাক দানের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। স্ত্রী উক্ত স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায়। দু'জনের বিবাহ বিচ্ছেদ অপরিহার্য হওয়ায় তারা আর কোনোভাবেই একত্রে থাকতে পারে না। কেবলমাত্র একটি পন্থায় সীমিত ক্ষেত্রে স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ে করতে পারে। পবিত্র কুরআনের বিধান মোতাবেক তা হলো, 'সে স্ত্রীলোকটিকে অপর স্বামী বিয়ে করবে। তারপর দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক দেয়, তারপরে যদি তারা পূনমিলিত হতে চায় এবং

[৪২৫] প্রথম আলো, ১৫ জানুয়ারি ২০০৩।

আল্লাহর বিধান কায়েম রাখতে পারবে বলে যদি মনে করে, তাহলে তাদের দু'জনের পুনরায় বিবাহ হতে কোনো দোষ নেই।[৪২৬]

পবিত্র কুরআনের আলোচ্য আয়াত হতে দু'টি জিনিস অন্তর পরিস্কার হয়ে উঠে। তা হলো কোনো মানুষ তার স্ত্রীকে চূড়ান্তভাবে তালাক দিলে কেবলমাত্র এভাবে পুনরায় বিয়ে করা যাবে প্রথমতঃ উক্ত মহিলার অন্য পুরুষের সাথে বিয়ে হতে হবে কোনো ধরনের শর্তবিহীনভাবে। দ্বিতীয়ত উক্ত স্বামীর সাথে সহবাস হতে হবে অর্থ্যাৎ স্বাভাবিকভাবে তাদের ঘর-সংসার চলবে। এমতাবস্থায় যদি স্বামী মারা যায় অথবা তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তবে পূর্বতন স্বামী ইচ্ছা করলে তাকে পুনরায় বিয়ে করতে পারবে।

আল্লামা আলুসীর মতে আয়াতাংশে 'যাওজান' শব্দ থেকে দ্বিতীয় বিবাহ 'তানকেহু' শব্দ থেকে সহবাস করা বুঝায়।[৪২৭] পবিত্র কুরআনের আলোচ্য আয়াতের মত হাদিস থেকেও সহবাসের শর্ত বুঝা যায়। রাকায়া নামক এক ব্যক্তির প্রাক্তন স্ত্রী এসে রাসূলে করীম (সা) এর খেদমতে আরজ করল, আমি বর্তমানে আবদুর রহমান ইবনে যুবায়েরের স্ত্রী, কিন্তু তার পুরুষত্ব নেই। এজন্য আমি আমার প্রাক্তন স্বামীর সাথে আবার বিবাহিত হতে চাই। তখন নবী করিম (সা) বললেন, না তা পারবে না যতক্ষণ তুমি তোমার বর্তমান স্বামীর মধু পান করবে এবং সে পান করবে তোমার মধু।[৪২৮]

ইকরামা নামক তাবেয়ী বলেছেন, পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২৩০ নাম্বার আয়াতটি আয়েশা নামক একজন মহিলা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তার বর্তমান স্বামীর সঙ্গে যদি তার যৌনসঙ্গম হয়ে থাকে এবং সে যদি তাকে তালাক দেয় তবে পূর্বের স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ হতে পারে। উপর্যুক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলুসী বলেন, কেবলমাত্র বিবাহ কিংবা যৌনসঙ্গম হলেই চলবে না তাদেরকে স্বামী স্ত্রীর মত স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে হবে। এক রাত বা সুনির্দিষ্ট কোনো সময়ের জন্য বা চুক্তি ভিত্তিক হলে চলবে না। এমতাবস্থায় যদি তাকে তার স্বামী কোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ করা ব্যতিত তালাক দেয় তবে সে ক্ষেত্রে প্রথম স্বামীর নিকট যাওয়ার সুযোগ থাকবে।

বাংলাদেশের সমাজে সচরাচর আমরা দেখতে পাই, কোনো ব্যক্তি রাগের মাথায় তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দিল। পরক্ষণে অনুতাপ অনুশোচনা জাগল, ঘর

---

৪২৬ সূরা বাকারা, আয়াত ২৩০।

৪২৭ পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৮৯।

৪২৮ পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৮৯।

সংসারের বিধ্বস্থরূপ দেখে ভীত হয়ে পড়ল, স্ত্রীর প্রতি দীর্ঘদিনের প্রেম ভালবাসার কথা মনে পড়লো। ছেলে মেয়েদের করুণ চাহিনি দেখে ঘাবড়িয়ে গেলো। সুন্দর গুছানো সংসারের ভাঙা চেহারা দেখে মনে ভীষণ খারাপ লাগল। এমতাবস্থায় পরিবারের সদস্য ও আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে কোনো এক ব্যক্তিকে দিয়ে বিয়ে পড়িয়ে দিল। এক রাত থাকতে দিল আবার ক্ষেত্র বিশেষে বিয়ে পড়িয়ে আলাদা রেখে পরদিন অথবা নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তার নিকট থেকে তালাক দিয়ে নিজেই আবার বিয়ে করল।

আমাদের সমাজে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত এ রীতিটি কুরআন ও হাদিস কর্তৃক স্বীকৃত ও সমর্থিত নয় বরং এটি সম্পূর্ণরূপে মনগড়া নিজেদের প্রয়োজনে তৈরি করা বা উদ্ভাবিত পন্থা যাকে ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক এক জঘন্য পন্থা বলা যেতে পারে। এ বিয়েতে বিবাহকারী পুরুষ লোকটি যেমন স্ত্রী লোকটিকে নিজের স্ত্রীরূপে কল্পনা করতে পারে না। মনে করে এক রাতের জন্য তাকে অন্যের বিবাহ উপযোগী করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ঠিক তেমনি মহিলার অনুরূপই ভেবে থাকে। সুতরাং একরাতের এ দৈহিক মিলনের ব্যবস্থা রীতিমত এক ধরনের লজ্জাকর অবস্থা। এ ধরনের নিলজ্জ ও বেহায়াপনামূলক কাজ ইসলাম কোনোভাবেই সমর্থন করতে পারে না। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের সমাজে এটি আজ ব্যাপকভিত্তিক রীতিতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে সংঘঠিত হাজার হাজার ঘটনাবলীর মধ্যে পূর্বল্লোখিত ঘটনাটি একটি উদাহরণ মাত্র।

ইসলামী শরীয়তে এ ধরনের বিয়ের অবস্থান

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান। সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত ইসলামে আল্লাহ মানব জাতির কল্যাণের বিধান দিয়েছেন। যে বিধান অবশ্য মানবীয় সৌকর্যের অন্তর্ভূক্তও বটে। অতএব ইসলামী শরিয়তে এ ধরনের বিয়ে সম্পূর্ণ হারাম এবং কবিরা গুনাহর নামান্তর। এ সম্পর্কে নিম্নের হাদিসসমূহ থেকে আমরা এর অভিশাপ বা নিষিদ্ধতা সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করতে পারব।

হাদিস

১. হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন, 'আল্লাহর অভিশাপ তাদের ওপর যারা হিলাহ করায় এবং যার জন্য হিলাহ করানো হয়।'[৪২৯]

২. আব্দুল্যাহ ইবনে মাসুদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) অভিশাপ দিয়েছেন যে হিলাহ করে এবং যার জন্য করা হয়।[৪৩০]

---

[৪২৯] তালাক ও হিলাহ শরীয়াহ ও প্রচলিত আইনের তুলনামূলক আলোচনা পূর্বোক্ত, পৃ-৬০।

৩. নবী করিম (সা) কে হালালকারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, না এরূপ বিয়ে করা যাবে না। বিয়ে হবে শুধু তাই যা অনুষ্ঠিত হবে পারস্পরিক আগ্রহে, যাতে কোনোরূপ ধোকাবাজী থাকবে না। যা করা হলে আল্লাহর কিতাবের সাথে করা হবে না কোনোরূপ ঠাট্টা বিদ্রুপপূর্ণ আচরণ। আর তার পরে পরস্পরে মধু মিলন হতে হবে।[৪৩১]

৪. উকবা ইবনে আমের বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর (সা) বলেছেন, আমি কি তোমাদের ভাড়া (উধার) করা ষাঁঢ় সম্মন্ধে বলবো? সাহাবাগণ বললেন, অবশ্যই। হুজুর সাঃ তখন বললেন, ঐ ব্যক্তি যে হিলাহ করে। আল্লাহর অভিশাপ তার ওপর যে হিলাহ করে, আর যার জন্য করা হয়।[৪৩২]

৫. ইবনে শায়বা ও আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ হযরত উমর রাঃ থোক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমার কাছে এরূপ হালালকারী ও যার জন্য হালাল করা হয় উভয়কে আনা হলে আমি তাদেরকে পাথর মেয়ে হত্যা করব।[৪৩৩]

৬. এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে (বা) জিজ্ঞাসা করলেন, আমি একটি মেয়ে লোককে বিয়ে করেছি এ উদ্দেশ্যে যে, আমি তাকে তার স্বামীর জন্য হালাল করে দেব, সে আমাকে কিছুই আদেশ করেনি এবং কিছুই জানা যায়নি। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তখন জবাবে হযরত উমর (রা) বললেনঃ না এরূপ বিয়ে জায়েজ নেই। বিয়ে শুধু তাই হবে, যা হবে ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে। তোমার পছন্দ হলে তাকে রেখে দেবে। আর পছন্দ না হলে তাকে আলাদা করে দেবে। যদিও এরূপ বিয়েকে রাসুল (সা) এর জামানায় সুস্পষ্ট জেনার মধ্যে গণ্য করত। এরূপ বিয়ের মাধ্যমে ২০ বছর দাম্পত্য জীবন যাপন করলেও আয়া ব্যাভিচারীই থেকে যাবে। যদি জানা যায় যে, তার উদ্দেশ্য ছিল অপরের জন্য হালাল করা[৪৩৪]

৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, এক ব্যক্তি স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। অতপর সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছে।

---

[৪৩০] পূর্বোক্ত, পৃ-৬০।

[৪৩১] পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৮৯।

[৪৩২] তালাক ও হিলাহ শরীয়াহ ও প্রচলিত আইনের তুলনামূলক আলোচনা, পূর্বোক্ত, পৃ-৬০।

[৪৩৩] পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৯০।

[৪৩৪] পূর্বোক্ত, পৃ-৩৯০।

তার সম্পর্কে আপনি কি বলবেন, জবাবে তিনি বললেন, সেই ব্যক্তি তো আল্লাহর নাফরমানী করেছে, এজন্য তিনি তাকে লজ্জিত করেছেন। সে শয়তানে আনুগত্য ক। ফলে তার জন্য মুক্তির আর পথ খোলা রাখা হয়নি। [৪৩৫]

তাহলীল সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত

ইমাম মালেক, আহমাদ বিন হাম্বল, সুফিয়ান সাওরী, আহলে জাহের, হাসান বসরী ইব্রাহীম নাথয়ী কাতালাহ, লাইস, ইবনে মুবারক প্রমুখের মতে, হালাল করার জন্য বিয়ে করা হাতাম এবং এ বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। ইমাম শাফেয়ীর মতে তাহলীলের শর্ত না লাগালে বিয়ে সহীহ হবে। ইমাম আবু হানিফা ও যুকারের মতে আকদ (বিয়ে সংগঠনের শর্তাবলী) এর মধ্যে তাহলীলের শর্ত লাগালে বিয়ে মাকজহ তাহরীমি হবে (প্রায় হারাম)। তবে প্রথম স্বামীর জন্য স্ত্রী হালাল হায় যাবে। দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দিলে বা মারা গেলে এ স্ত্রীকে প্রথম স্বামী বিয়ে করতে পারবে।

হানাফী মাজহাবের দু'জন বিশিষ্ট ইমামের মত

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, হালাল করার শর্তে বিয়ে করলে বিয়ে ফাসেদ হবে এবং এ বিষয়ের মাধ্যমে স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। ইমাম মুহাম্মদের (র) মতে, তাহলোীলের শর্তারোপ করে বিয়ে করলে বিয়ে সহীহ হবে কিন্তু প্রথম স্বামীর জন্য (যার জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে বিয়ে করা হলো) ঐ স্ত্রী হালাল হবে না। অর্থ্যাৎ প্রথম স্বামী তাকে বিয়ে করতে পারবে না।[৪৩৬]

তাহলীল বিয়ে সম্পর্কে যেহেতু আল্লাহর রাসূল (সা.) লানত করেছেন, তাদের উধার করা যাড় ও জ্বেনাকারীর সাথে তুলনা করেছেন। অতএব এ বিয়ে কোনোবস্থায় বৈধ নয়। আমাদের সমাজে হিলা বিয়ের প্রচলনের মাধ্যমে একটি কুরআন হাদিস নিষিদ্ধ বস্তুর প্রচলনকে চালু রাখা ও এর মাধ্যমে অশ্লীলতার বন্যা প্রবাহিত করার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে এটিকে পঙ্কিলময় সমাজে পরিনত করতে দেয়া কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না।

---

[৪৩৫] পূর্বোক্ত, পৃ-৩৯০।

[৪৩৬] আব্দুল মান্নান: ইসলামে তালাকের বিধান ঃ নেকাহর গুরুত্ব, (অপ্রকাশিত), দারুল ইফতা, ঢাকা।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো এই যে, রাগের বশবর্তী হয়ে একত্রে তিন তালাক দানের পর যদি হিলা করার মাধ্যমে স্ত্রীকে ফিরিয়ে পাওয়া যায় তবে তালাক হয়ে যাবে একটি অতি মামুলি জিনিস। এ কাজ করতে কেউ পরোয়া করবে না। আর যদি এভাবে তালাক দিয়ে স্ত্রী ফিরিয়ে পাওয়া না যায় তবে সবাই তালাকের কথা ভাবতে দশ বার চিন্তা করবে।

যেনা

যেনা শব্দটি একটি আরবি শব্দ। ইংরেজিতে এর প্রতিশব্দ হলো Adultery[437] ও fornication[438] (বাংলায় যার অর্থ যেনা বা ব্যভিচার অথবা অবৈধ যৌন সম্পর্ক)। সাধারণভাবে এর অর্থ হলো বিবাহবন্ধন ব্যতিরেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে যৌন সহবাসের মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ। 'যেনা শব্দটির পারিভাষিক অর্থ 'নিজ স্বামী বা স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারী বা পুরুষের সহিত যৌনকর্ম।'[৪৩৯]

ফিকহশাস্ত্রের পরিভাষায় যেনার সংজ্ঞা হলো: বালেগ ও বুদ্ধিমান দুইজন নারী পুরুষের বৈবাহিক বন্ধন ব্যতিরেকে স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে একজনের যৌনাঙ্গে অপরজনের যৌনাঙ্গে প্রবিষ্ট করানো হইলে তাকে যেনা বলে।'[৪৪০]

আলোচ্য সংজ্ঞাটির মাধ্যমে যে বিষয়টি বুঝানো হয়েছে তা হলো, নারী ও পুরুষের বিবাহ বহির্ভূত যৌন মিলন। সাধারণভাবে যেনা বা ব্যভিচার চলতে বুঝায় 'একজন পুরুষ ও একজন নারীর বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী হওয়া ছাড়াই যৌন সংগমে লিপ্ত হওয়া।[৪৪১] যেনা বা ব্যভিচারের এই কাজ যে, নৈতিকতার দিক থেকে অত্যন্ত খারাপ ধর্মীয় দৃষ্টিতে অতি বড় গুনাহ কিংবা সামাজিকতার দিক দিয়ে জঘন্য কদর্য ও আপত্তিকর, সে সম্পর্কে প্রাচীনতম যুগ হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমগ্র মানব সমাজ সম্পূর্ণ একমত।[৪৪২]

যেনা বা ব্যাভিচারের সংজ্ঞা নিম্নোক্ত হাদিস থেকে স্পষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানিফা (রা) যেনার নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, 'এমন কোনো নারীর সহিত

---

437 Bangla English Dictionary, Bangla Academy, Dhaka, 1994, p. 237

438 SAMSAD English Bangla Dictionary First Edition, Pallabi Publishers, Dhaka, 1987, p. 14

৪৩৯ বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খণ্ড, প্রথম ভাগ, ইসলামিক আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৪৩।

৪৪০ প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩

৪৪১ মওদুদী, সাইয়েদ আবুল আলা: তাফহীমুল কোরআন, ৯ম খণ্ড, খায়রুন প্রকাশনী, পৃ ৭০।

৪৪২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

তাহার সম্মতিতে তাহার যৌনাঙ্গে কোনো পুরুষের সঙ্গমক্রিয়াকে যেনা বলে, যে তাহার স্ত্রী ও নহে। এবং স্ত্রী হওয়ার সন্দেহ ও বিদ্যমান নাই।[৪৪৩]

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অনুসারীদের সংজ্ঞা হলো, তাদের মতে যেনা হইল যৌন অঙ্গকে এমন যৌন অঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করানো, যাহা শরিয়াতের দৃষ্টিতে হারাম, কিন্তু স্বভাবত উহার গ্রহি আগ্রহ বা আকর্ষণ হইতে পারে।[৪৪৪]

মালেকী মতালম্বীদের মতে যেনার সংজ্ঞা হলো নিম্নরূপ। 'শরিয়ত ভিত্তিক অধিকার কিংবা উহার কোনোরূপ সন্দেহ ছাড়াই যৌনাঙ্গে বা গুহ্য দ্বারে পুরুষ বা নারীর সাথে রতিক্রিয়া করা[৪৪৫]

'ব্যাভিচার হইল এমন একটি খারাপ কাজ যাহা অন্যান্য খারাপ কাজের পথ খুলিয়া দেয়। ব্যাভিচার শুধুমাত্র নিজেই একটি ঘৃণ্য কাজ এবং আত্ম সম্মানের সাথে অসংহতিপূর্ণ নহে। বরং উহা অন্যান্য খারাপ কাজ সংঘঠনে প্ররোচণা দেয়। ইহা পরিবারের ভিত্তি ধ্বংস করিয়া দেয়। যে সকল শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়াছে অথবা করিবে তাহাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে উহ্য কাজ করে। ইয়া দ্বারা খুন এবং বিবাদ সংঘটিত হয়। ইহাতে মান-সম্মান এবং সম্পদের হানিঘটে এবং ইহা স্থায়ীভাবে সামাজিক বন্ধন শিথিল করিয়া দিতে পারে। কেবলমাত্র পাপ হিসেবে ইহাকে পরিত্যগ করা উচিত নহে বরং ইহার প্রতি সর্বপ্রকার মোহ অথবা ইচছা পরিত্যাগ করা।[৪৪৬]

যেনা বা ব্যভিচার একটি নিন্দিত ও ঘৃণিত কাজ। ইসলামী আইন যেনাকে ইসলামী রাষ্ট্রে একটি দণ্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। আর যেনাকারীগণ পরকালে এভাবে উঠবে যে, তাদের লজ্জা স্থান পচে গলে পড়বে আর সেখান থেকে দূর্গন্ধ বের হবে। অর্থাৎ পরকালেও তারা ব্যাপক শাস্তি ভোগ করবে। আবার অন্যদিকে যেনাকারী যদি বিবাহিত হয় তবে তাদের অপরাধ আরো গুরুতর এবং তাদের শাস্তি আরো কঠোর। ইসলাম মনে করে যে, ব্যভিচারের পথ বন্ধ করার জন্য বিবাহের পথ খোলা ও সহজ লভ্য করা উচিত। তাই ইসলামে যৌন মিলনের যাবতীয় পথকে সহজ করা হয়েছে। অতএব যৌন কামনা পরিতৃপ্তির বৈধ উপায় থাকা সত্ত্বেও অবৈধ পন্থা অনুসরণ করলে তাকে শাস্তি দেয়া যুক্তিযুক্ত অন্যথায়

---

[৪৪৩] বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খণ্ড, প্রথম ভাগ, ইসলামিক আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ-৪৩

[৪৪৪] মওদুদী, সাইয়েদ আবুল আলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

[৪৪৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

[৪৪৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

সমাজে এ দুষ্ট ব্যাধি ব্যাপকতা লাভ করবে এবং সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে।

যেনার সাক্ষী

ইসলামের প্রাথমিক যুগেও যেনাকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হত। তৃতীয় হিজরিতে এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে থাকে। তখনও এটি আইনগত অপরাধরূপে গণ্য হয়নি। ইহার জন্য রাষ্ট্র, পুলিশ ও আদালত তখনো এ পর্যায়ে কোনো কাজ শুরু করে নাই, বরং তখনো ইহা একটি সামাজিক বা পারিবারিক অপরাধরূপে গণ্য ছিল। এই পর্যায়ে তখনো পরিবারের লোকদেরই নিজস্বভাবে শাস্তি দেয়ার অধিকার ছিল।[৪৪৭] এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাহারাই কুকর্মে লিপ্ত হইবে, তাহাদের সম্পর্কে তোমাদের নিজেদের মধ্য হইতে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর। এ চারজন লোক যদি সাক্ষ্য দান করে, তবে তাহাদিগকে (স্ত্রীদেরকে) ঘরের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখ যতদিন না তাহাদের মৃত্যু হয়।'

কোরআনের আলোচ্য আয়াত হতে সে জিনিসটি প্রকাশ পায় তা হলো যেনা বা ব্যাভিচারের শাস্তি দানের জন্য অবশ্যই চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। চারজনের কম লোক অর্থাৎ জেন লোকও যদি সাক্ষী দেয় তবে কোনোভাবেই অপরাধী হিসেবে শাস্তি দেয়া যাবে না। আমাদের বাংলাদেশের সমাজে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে যে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় তা মোটেও ঠিক নয়। ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর করার জন্য শর্ত হলো। যখন তা যথাযথ সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে যেনা হিসেবে সাব্যস্ত করা যাবে। এজন্য নিম্নের শর্তাবলি অবশ্যই পূরণ করতে হবে-

১. চারজনকে সাক্ষী থাকতে হবে, যারা স্বচক্ষে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন- এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করবেন।
২. ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করার অর্থ হলো পুরুষের যৌনাঙ্গকে নারীর যৌনাঙ্গের ভিতর প্রবিষ্ট করাতে স্বচক্ষে দেখেছেন।
৩. সাক্ষীগণ ধার্মিক হবে।
৪. তারা হবেন সৎ।
৫. তারা আদালতে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করবেন।

---

[৪৪৭] পূর্বোক্ত, পৃ-৩৯০।

৬. বিচারক সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতা ও তাদের সাক্ষ্যের বিষয়ে নিশ্চিত হবেন।

৭. এ সাক্ষ্য অবশ্যই চাপ প্রয়োগ করা ব্যতীত হতে হবে। চাপ প্রয়োগ করে সাক্ষ্য দিলে তা কার্যকর করা হবে কেবল তখনই যখন ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক শাস্তি কার্যকর করা যাবে। তবে এর জন্যও শর্ত হলো, পরিবেশ থাকতে হবে।

৮. যদি কোনো কারণে সাক্ষীগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তবে তা অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে বলে অনেক আইনবিদ মনে করেন।[৪৪৮]

৯. সাক্ষ্য দানকারীকে সুস্থ ও মোটামুটি জ্ঞানী হতে হবে। কেননা পাগল ও বোকা প্রকৃতির ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

১০. কোনো কুমারী অথবা স্বামীহীন নারী গর্ভবতী হলে এবং সে অবৈধ গর্ভের স্বীকারোক্তি করিলে তা যেন প্রমাণের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

১১. যেনাকারী বা যেনাকারিণী কোনো পর্যায়ে, এমনকি শাস্তি কার্যকর করা কালে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলে অথবা কোনো সাক্ষ্য তার সাক্ষী প্রত্যাহার করলে অথবা সাক্ষীগণের প্রদত্ত সাক্ষ্যতে গরমিল দেখা গেলে যেনা প্রমাণিত হবে না এবং এজন্য শাস্তিও কার্যকর করা যাবে না। তবে যদি চারজনের অধিক কেউ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তবে তা সাধারণত ধর্তব্য নয়।[৪৪৯]

যেনার মত অপরাধের শাস্তি কার্যকর করার জন্য উপর্যুক্ত যে সব শর্তাবলি আরোপ করা হয়েছে তা থেকে একটি বিষয় অন্তত স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হলো, উপর্যুক্ত শর্তাবলি এক সাথে কোনো ঘটনায় পাওয়া যাবে না। কেননা কোনো যেনাকারী অন্তত মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজে এভাবে কখনো যেনা বা ব্যাভিচারে লিপ্ত হতে পারে না।

যেনার শাস্তি

ব্যভিচার হইল এমন অপরাধ যা কোনো ব্যক্তির শরীর এবং সম্মানের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়। পবিত্র কুরআনে এর জন্য যে শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে তা নিম্নরূপ-

> 'ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করিবে। আল্লাহর বিধান কার্যকরী করণে উহাদিগের প্রতিদ্বয় যেন তোমাদিগকে প্রভাবান্বিত না

[৪৪৮] বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

[৪৪৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদিগের একটি দল যেন উহাদিগের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।[৪৫০]

একে অপরের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ নয় এমন পুরুষ এবং নারীর মধ্যে সংঘটিত যৌন সংসর্গ যিনা বা ব্যভিচারের অন্তর্গত। কাজেই ব্যভিচার সংঘটনকারী পক্ষের যে কোনো একজন অথবা উভয়ে যদি অন্য কারও সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের যে অবৈধ যৌন সম্পক স্থাপন করে, তবে তা ব্যভিচার হিসেবে গণ্য হবে। আবার যদি উভয় পক্ষই অবিবাহিত হয়, তবুও সে অবৈধ যৌন সম্পর্ক যিনার অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ক) বিবাহিত অবস্থার সংজ্ঞা যা ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তিযোগ্য করে

পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড (রজম) প্রযোজ্য হওয়ার জন্য যে বৈবাহিক অবস্থার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে ব্যভিচারী ব্যক্তির সুস্থ বোধশক্তি থাকতে হবে, প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে, মুসলিম হতে হবে, স্বাধীন হতে হবে। একই সঙ্গে তার বৈধভাবে বিবাহিত দাম্পত্য সম্পর্ক থাকতে হবে, যাতে বৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ বিদ্যমান থাকে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এ ধরনের বৈবাহিক অবস্থাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, 'যিনা' অভিব্যক্তিটি বেআইনি যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। অর্থাৎ, যেখানে ব্যভিচারকারী পক্ষদের মধ্যে যে কোনো একজন তৃতীয় কোনো ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকে, অথবা উভয় পক্ষই অবিবাহিত থাকে, কিংবা একজন বিবাহিত এবং অপরজন অবিবাহিত থাকে সেসব ক্ষেত্রেও যিনা শব্দটির প্রয়োগ করা হয়।

ইংরেজি ভাষায় বিবাহিতদের ব্যভিচার Adultery অবিবাহিতদের ব্যভিচার (Fornication)-এর মধ্যে পার্থক্য আছে। Adultery বলিতে এমন বেআইনি যৌনসঙ্গমকে বুঝায় যাতে সংশ্লিষ্ট পক্ষের যে কোনো একজন বিবাহিত থাকে। সোজা কথায় বিবাহিত ব্যক্তি তার স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করাকে এ্যাডাল্টারি বা বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্ক আর Fornication বলতে এমন যৌনসঙ্গম বুঝায় যাতে উভয় পক্ষই অবিবাহিত থাকে।

দুই ধরনের ভিন্ন বেআইনি যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামে দুইটি ভিন্ন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। অবিবাহিতদের ব্যভিচারের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উচয়কেই একশত কশাঘাত করছি সুনির্দিষ্ট রহিয়াছে (২৪ঃ ২) এবং বিবাহিতদের মধ্যে সংঘটিত ব্যভিচারের শাস্তি পাথর মারিয়া হত্যা করা। এই শাস্তিরর বিষয়টি আমরা হাদিসে

[৪৫০] সূরা আন নূর আয়াত ২।

দেখিতে পাই। ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, এইরূপ গুরুতর অপরাধের জন্য কঠিন শাস্তি আরোপকারী ইসলামই একমাত্র ধর্ম নয় বরং সমাজের সুস্বাস্থ্য এবং নৈতিকতা রক্ষার জন্য আরও অনেক ধর্ম আছে যাতে এইরূপ কঠিন শাস্তি সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এইখানে Oil Testament-এর কয়েকটি দেওয়া হলো–

(১) এবং যে লোক অপর কোনো লোকের স্ত্রীর সাথে ব্যাভিচার করে এমন কি আমায় প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে যে ব্যাভিচারী এবং ব্যভিচারিণীকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দিয়ে হইবে।[৪৫১]

(২) কোনো অল্প বয়স্কা নারী অর্থাৎ কুমারী কোনো পুরুষের সাথে বাগদত্তা অবস্থায় থাকাকালীন সময়ে যদি কোনো লোক তাহাকে শহরে দেখিতে পায় এবং তাহার সাথে শয়ন করে তবে তু তাহাদিগকে উভয়কে নগরের ফটকে নিয়া আসিবে এবং তাহাদিগকে পাথর মারিবে এবং মারিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিবে। [৪৫২]

বাইবেল ছাড়াও খৃস্টানদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

(৩) 'নারীর অবস্থান অনুসারে তাহার শাস্তি কার্যকরী করিবার পদ্ধতির তারতম্য হয়, অপরাধী স্ত্রীকে তাহার প্রেমিকসহ গলা টিপিয়া হত্যা করা হইবে এবং বাকদত্তা যে মহিলাকে প্ররোচিত করা হইয়াছে তাহাকে পাথর মারিতে হইবে। [৪৫৩]

"আইন অনুসারে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করিবার একমাত্র স্বীকৃত পদ্ধতি হইল পাথর মারিয়া হত্যা করা ওপর বর্তায়।[৪৫৪]

হাদিসে আমরা দেখিতে পাই যে, ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার বিধান বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ বিন মাসুদ (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলিয়াছেন যে, কোনো মুসলমান, যে সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। তার জীবন নেওয়া বৈধ নয় নিম্নলিখিত তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া: (১) বিবাহিত ব্যভিচারী, (২) জীবনের প্রতিশোধ হিসাবে জীবন (কিসাস) এবং (৩) দীন (ইসলাম) পরিত্যাগকারী।[৪৫৫]

---

[৪৫১] মওদুদী, সাইয়েদ আবুল আলা, প্রাগুক্ত, পৃ ৭২

[৪৫২] মওদুদী, সাইয়েদ আবুল আলা, প্রাগুক্ত, পৃ ৭২

[453] Dictionary of the Bible, Hastings (ed), vol. III, p. 223

[454] Chese and Black Encyclopaedia Biblica, P. 2722

[৪৫৫] সহিহ বুখারী, কিতাবুল দিয়াৎ, হাদিস নং ৬৮৭৮-৬৮৭৯, কিতাবুল কাসামা ওয়াল মুহারাবা, হাদিস নং ১৬৭৬

পবিত্র কুরআনের নির্দেশ এবং সুন্নাহর নির্দেশের মধ্যে এই বিষয়ে অধিকাংশ ফকীহর মতে মৌলিক কোনো পার্থক্য নাই। দুই জন অবিবাহিত লোক যখন যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হয় তখন তারা সামাজিক নৈতিক ভিত্তিকে ধ্বংস করে। কিন্তু যখন এমন দু' জন লোক ব্যভিচারে লিপ্ত হয় যাদের মধ্যে একজন বিবাহিত তখন তা উপরোক্ত অপরাধের চাইতেও জঘন্য অপরাধ করে, কারণ তা দ্বারা তারা শুধুমাত্র সামাজিক নৈতিকতাই ধ্বংস করে না বরং তারা বিবাহের পবিত্রতাও নষ্ট করে। ব্যভিচারের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির প্রকৃতি সম্পর্কে আইনজ্ঞদের মধ্যে মতের পার্থক্য আছে। তবে এ বিষয়ে অধিকাংশ ফকীহের মধ্যে ঐকমত্য হয়েছে যে, বিবাহিত লোকের ব্যভিচারের শাস্তি হলো পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা (রজম) এবং অবিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচারের শাস্তি হলো একশত কশাঘাত। তবে বিবাহিত লোকদের শাস্তির ক্ষেত্রে পাথর মারার সাথে কশাঘাতের শাস্তি যুক্ত করা আবশ্যক কিনা এবং অবিবাহিতদের শাস্তির ক্ষেত্রে কশাঘাতের সাথে নির্বাসন যুক্ত করা আবশ্যক কিনা তা নিয় মতভেদ রয়েছে।

(৪) উবাদা বিন সামিত (রা) বণিত একটি হাদিসে রাসূল (সা.) বলেন, 'আমার নিকট হইতে (শিক্ষা) গ্রহণ কর। আল্লাহ তাহাদের (নারীদের) জন্য একটি পথের আদেশ দিয়াছেন। যখন অবিবাহিত পুরুষ কোনো অবিবাহিত নারীর সাথে ব্যভিচার করে তখন তাহাদিগকে একশত কশাঘাত কর এবং এক বৎসরের নির্বাসন দাও। আর যখন কোনো বিবাহিত পুরুষ কোনো বিবাহিত নারীর সাথে ব্যভিচার করে তখন তাহাকে একশত কশাঘাত কর এবং পাথর মারিয়া হত্যা কর।

(৫) ইমাম আহম্মদ, দাউদ আল জাহিবি এবং ইশাক বিন রাহাওই (র.) উপরোক্ত হাদিসের ভিত্তিতে মত প্রকাশ করে যে, বিবাহিত ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে দুই ধরনের শাস্তি-কশাঘাত এবং পাথর মারা এবং উভয় শাস্তি প্রদান করা উচিত। তবে অধিকাংশ আইনবিদ মনে করে যে, 'একই অপরাধর জন্য দুইটি শাস্ত্রি একত্রে প্রদান করা যুক্তিসংগত নহে। কারণ শুধুমাত্র একটি ব্যতিক্রম ছাড়া মহানবী (সা) নিজে কখনও দুইটি শাস্তি প্রদান করেন নাই।'

জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন যে, 'কোনো ব্যক্তি ব্যভিচার করিলে মহানবী (সা) তাহাকে একশত কশাঘাতের শাস্তি প্রদান করেন। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেলো যে, অপরাধী বিবাহিত এবং তখন মহানবী (সা) তাহাকে পাথর মারিয়া হত্যায় শাস্তি প্রদান করেন।'

অবিবাহিত লোকদের ব্যভিচারের ক্ষেত্রে দুইটি শাস্তি প্রদান করা আবশ্যক কিনা এ নিয়েও মতভেদ রয়েছে। ইমাম আল শাফিঈ, ইমাম আহম্মদ, দাউদ আল

জাহিরি, সুফিয়ান আস-সাওরী এবং ইবন আবি লায়লার মতে, 'এই অপরাধে একশত কশাঘাতের পাশাপাশি এক বছরের নির্বাসনও প্রযোজ্য।' অন্যদিকে ইমাম মালিক এবং ইমাম আওযায়ী (রহ.)-এর মতে, পুরুষ অপরাধীকে একশত কশাঘাত এবং এক বৎসর নির্বাসন দেওয়া আবশ্যক এবং মহিলা অপরাধীকে একশত কশাঘাত দিলেই তা যথেষ্ট হিসাবে গণ্য হইবে। তাকে নির্বাসন দিবার আবশ্যক পড়ে না।'

নির্বাসন দ্বারা বুঝানো হয় যে, অপরাধীকে তার আবাসস্থল হতে এমন একস্থানে পাঠাতে হবে, যেখানে কছর নামায অনুমোদিত। জায়েদ বিন আলী এবং ইমাম জাফর সাদিক-এর মতে কারাবাসের মাধ্যমে নির্বাসনের উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে। ইমাম আবু হানিফা এবং তার সাথে বিখ্যাত সঙ্গীগণ ইমাম আবু ইউসুসফ এবং ইমাম জাব্বার এবং ইমাম আহম্মদের মতে, অবিবাহিত লোকদের ব্যভিচারের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট শাস্তি হইল একশত কশাঘাত। শাস্তির কাযী তাহার সুবিবেচনায় তাযির-এর আকারে প্রদান করিতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ, কাযী যদি দেখিতে পান যে, ব্যভিচার সংঘটনকারী ব্যক্তি নৈতিক মূল্যবোধহীন এবং সংশ্লিষ্ট নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক এত গভীর যে, উক্ত অপরাধ পুনরায় সংঘটনের আশংকা রহিয়াছে তখন কাযী তাহাদের উভয়কে নির্বাসনের শাস্তি প্রদান করিতে পারেন।'

পবিত্র কুরআন এবং হাদিসের ভিত্তিতেবলা যায় যে, যিনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষ যদি অবিবাহিত হয়, তবে তাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত প্রদান করতে হবে; আর তারা যদি ইতোমধ্যে বিবাহিত হয় তবে তাদের পাথর মারিয়া হত্যা করা হবে।

তবে কিছু চিন্তাবিদ মত প্রকাশ করেন যে, পবিত্র কুরআনে যিনার শাস্তি হিসেবে যে অভিব্যক্তি ব্যক্ত করা হয়েছে তা সাধারণ প্রকৃতির এবং তহার মধ্যে সকল ধরনের যিনা বিবাহিত অথবা অবিবাহিত, স্বাধীন অথবা দাস অন্তর্গত। কাজেই এইরূপ পার্থক্য পবিত্র কুরআনে সমর্থন পায় না। শুধুমাত্র একশত কশাঘাতের শাস্তি সুনির্দিষ্ট আছে। পবিত্র কুরআনের কোথাও যিনার শাস্তির (পাথর মারিয়া হত্যা) অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় নাই। তাছাড়াও পাথর মারিয়া হত্যার সমর্থনে যে সমস্ত হাদিসের ওপর নির্ভর করা হয়েছে তাদের মধ্যে ঐক্য নাই এবং তারা তা প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছন যে, সূরা আন-নূর নাজিল হইবার পরে ঐরূপ শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। বুখারী এবং মুসলিমে একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (র) বর্ণনা করেছেন যে, উমর বিন খাত্তাব (রা) একবার মহানবী (সা)-র বসবার যে উচ্চস্থানটি তার পাদদেশে বসলেন এবং বললেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ মহানবী (সা)-কে সভ্য দিয়ে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাহার নিকট

কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তার নিকট যাহা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাহাতে পাথর নিক্ষেপ করবার আয়াত অন্তর্ভূক্ত রহিয়াছে। আমরা ইহা আবৃত্তি করেছে, আমাদের স্মৃতিতে ধারণ করে রেখেছে এবং ইহা অনুধাবন করেছি। আল্লাহ রাসূল পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিবার শাস্তি প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার পরে আমরাও পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যায় শাস্তি প্রদান করিয়াছি। আমার ভয় হয় যে, সময় অতিবাহিত হইবার সাথে জনগণ না জানি ইহা ভুলিয়া যায় এবং বলে যে, আমরা আল্লাহর কিতাবে পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যার শাস্তি দেখিতে পাই না এবং আল্লাহর নির্দেশিত দায়িত্ব পরিত্যাগ করিয়া বিপথে না যায়। যে ক্ষেত্রে বিবাহিত নারী-পুরুষ কর্তৃক সংঘটিত ব্যভিচার প্রমাণিত হয় তখন তাহাদের পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যার দায়িত্বের কথা আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত আছে।[৪৫৬]

সকলের সামনেই কিতাব রহিয়াছে এবং তাহার কোথাও রযম-এর উল্লেখ নাই। আল্লামা আল-সুয়ুতি এই বিষয়ের সকল হাদিস পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, রযম সম্পর্কে আয়াত নাযিল হইয়াছে মর্মে দাবি যে হাদিসের ওপর ভিত্তি করিয়া করা হয় বিচ্ছিন্ন (ahead) এবং তাহা কুরআনের বিধানকে বাতিল করিতে পারে না অথবা উহার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি করে।'

এখন প্রশ্ন জাগে যে, 'সূরা আন-নূরে নির্দিষ্ট শাস্তি চূড়ান্ত হিসাবে মনে করা হইলে পাথর নিক্ষেপ করিয়া শাস্তির যে বিধান রহিয়াছে তাহা বাতিল হিসাবে গণ্য করিতে হয় এবং ইহা যদি প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা) সূরা আন-নূর অবতীর্ণ হইবার পরেও ব্যভিচারের জন্য পাথর মারিয়া হত্যার শাস্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইলে পবিত্র কুরআনে সুনির্দিষ্ট শাস্তিকে সংশোধন করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করিতে হয়।' এই সকল লোক এই ঘটনা সম্পর্কে আজ যে পবিত্র কুরআনে যে শাস্তির কথা সুনির্দিষ্ট রহিয়াছে তাহা অবিবাহিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এবং পাথর নিক্ষেপ করিয়া শাস্তির যে বিধান মহানবী (সা) নির্দিষ্ট করিয়াছেন তা বিবাহিত ব্যক্তিদের জন্য। আল-আল্লামা বদর উদ্দিন আল আইনি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে মহানবী (সা) সূরা আন-নূর অবতীর্ণ হইবার পরে পাথর নিক্ষেপ ভরিয়া পাপ্তি প্রদান করিয়াছেন। ইফ্ফ-এর ঘটনা সম্পর্কে সূরা আন-নূর অবতীর্ণ হয় এবং এইজন্য ইহার অবতীর্ণকাল হিজরী ষষ্ঠ বর্ষের অধিক হইতে পারে না। সন্দেহাতীতভাবে এই বিষয়ে আরও বর্ণনা রহিয়াছে যাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, সূরাটি ষষ্ঠ হিজরীর পূর্বেই নাজিল হইয়াছে বলিতে গেলে চতুর্থ অথবা পঞ্চম হিজরিতে, কিন্তু কেউ দাবি করেন না যে, সূরাটি ষষ্ঠ হিজরির পরে অবতীর্ণ হয়েছে। আবু হুরায়রা

[৪৫৬] মওদুদী, সাইয়েদ আবুল আলা, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৩।

(রাঃ)-এর একটি হাদিস আছে যে, অপরাধীকে উক্তরূপ শাস্তি প্রদানকালে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি সপ্তম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।'

তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলাম আইনবিদগণ, বিশেষত চার মাজহাবের ইমামগণ (ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল) এবং অন্যান্য বিজ্ঞ আইনবিদ সিদ্ধান্ত দেন যে, পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার বিধানের অস্তিত্ব এখনও আছে এবং তা সুন্নাহ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত।' এই প্রশ্নটি মহানবী (সা)-র নিকট করা হয় কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যাকারী হিসাবে। তিনি বলিয়াছেন যে, কিতাব অনুসারে বিবাহিত ব্যভিচারী এবং বিবাহিত ব্যভিচারিণীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হইবে। কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মহানবী (সা)-র চাইতে কে বেশি নির্ভরযোগ্যতার দাবি করিতে পারে? এই নীতিটি হযরত আবু বকর, উমর এবং তাহাদের পরে অন্য খলীফাগণও অনুসরণ করিয়াছেন। বিবাহিত অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ রহিত করা হলে এই সকল খলীফা মহানবী (সা)-র আদেশ অনুসরণ করিতেন না। যদিও কুরআনের আয়াতসমূহের কোথাও মৃত্যুদণ্ডের উল্লেখ নাই তবুও নিঃসন্দেহে নিম্নলিখিত আয়াতে মৃত্যুদণ্ডের ইঙ্গিত পাওয়া যায়ঃ

> 'তোমাদের নারীদিগের মধ্যে যাহারা ব্যভিচার করে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হইতে চারিজন সাক্ষী তলব করিবে; যদি তাহারা সাক্ষ্য দেয়, তবে তাহাদিগকে গৃহে অবরুদ্ধ করিবে যে পর্যন্ত না তাহাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ তাহাবের জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা করেন।[৪৫৭]

এইখানে অনেক উলামার মতে মৃত্যুদণ্ডের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাঁরা মনে করেন যে, 'পথ' অভিব্যক্তিটি সুনির্দিষ্ট শাস্তি হিসাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এই আয়াত ছাড়াও আরও স্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য হাদিস রহিয়াছে যাতে মৃত্যুদণ্ডাদেশের শাস্তি এখনও যে কার্যকরি আছে তা প্রদর্শন করে।

আবু উমামা বলিয়াছেন যে, বিদ্রোহীরা উসমান বিন আফফান (রা) ঘর ঘেরাও করিয়া ফেলিতেন। তিনি উঁচু পাহাড়ের ওপর আরোহন করেন এবং বলেন, 'আমি আল্লাহর নামে তোমাদের নিকট বলিতেছি যে, তোমরা কি জান না যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন যে, নিম্নলিখিত কারণ ব্যতিরেকে কোনো মুসলিমের রক্ত বিবাহের পরে ব্যভিচার, ইসলাম গ্রহণ করিবার পর লওয়া আইনসংগত নহে। কারণগুলি হইল ইসলাম ত্যাগ এবং অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তিকে খুন করা এবং যাহার জন্য তাহাকেও হত্যা করিতে হইবে। আল্লাহর কসম আমি অজ্ঞতার দিন অথবা ইসলামের দিনে কখনও ব্যভিচার করি নাই, আমি ইসলাম গ্রহণ করিবার পর তাহা হইতে পশ্চাৎমুখ হই নাই, তাছাড়া আমি এমন কোনো লোককে হত্যা করি নাই

---

[৪৫৭] সূরা নিসা, আয়াত: ১৫।

যাহা আল্লাহ বেআইনী করিয়াছেন। কাজেই কি কারণে তোমরা আমাকে হত্যা করিবে। [৪৫৮]

হযরত আয়েশা (রা) বলিয়াছেন যে,

> মহানবী (সা) বলিয়াছেন যে, কোনো বিবাহিতের কর্তৃক ব্যভিচার সংঘটিত হইলে, কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিবার পর তাহা পরিত্যাগ করিলে অথবা কোনো ব্যাক্তিকে হত্যা করিলে উক্ত অপরাধী ব্যতীত অন্য কোনো মুসলমানের রক্ত ক্ষরণ করা আইনসংগত নহে। [৪৫৯]

হযরত উসমান (রা) থেকে বণিত একটি বক্তব্যে বলা হয়েছে যে,

> 'আল্লাহর নবী বলেন যে, তিনটি অপরাধ ব্যতীত কোনো মুসলমানের রক্ত ক্ষরণ করা আইনসংগত নহে। প্রথমত: বিবাহ করিবার পর যে ব্যভিচার করে তাহার শাস্তি হইল পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা (রজম), দ্বিতীয়তঃ যে পরিকল্পিতভাবে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে তাহার জন্য কিসাস প্রযোজ্য, তৃতীয়ত: যে ইসলাম গ্রহণ করিবার পর তাহা ত্যাগ করে তাহার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। [৪৬০]

খারিজী এবং অন্য যে সব লোক ব্যভিচারী নারীকে পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যায় বিশ্বাস করে না তাহারা তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণের জন্য নিম্নলিখিত আয়াতের উদ্ধৃতি নিয়াছেন–

> 'বিবাহিত হইবার পর যদি তাহারা ব্যভিচারী করে তবে তাহাদের শাস্তি স্বাধীন নারীর অর্ধেক। [৪৬১]

তারা যুক্তি দেয় যে, এই আয়াতে কোনো এক ব্যভিচারী বিবাহিতা-দাসী বালিকার জন্য যে শাস্তি নির্দিষ্ট করা হইয়াছে তা বিবাহিতা-মুসলিম স্বাধীন নারীর শাস্তির অর্ধেক। কোনো স্বাধীন বিবাহিতা ব্যাভিচারিণী নারীর শাস্তি যাদি পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা হয়ে থাকে তবে তাস্পষ্ট যে, অপরাধী দাসী বালিকাটির শাস্তি তার অর্ধেক হতে পারে না। এই আয়াতটি তাই তাদের মতে নিরঙ্কুশ প্রমাণ যে, পাথর মেরে হত্যার শাস্তির অস্তিত্ব ইসলামে নাই। মুহসানাত অভিব্যক্তির যথাযথ প্রয়োগের দিকে সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করলেই উপরোক্ত যুক্তির অসারতা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

---

[৪৫৮] তিরমিজি, নাসাই, ইবনে মাজাহ।

[৪৫৯] নাসাঈ শরীফ।

[৪৬০] নাসাঈ শরীফ।

[৪৬১] সুরা আন নিসা, আয়াত-২৫।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একশত কশাঘাত নির্দিষ্ট হয়েছে অবিবাহিত মুসলিম স্বাধীন ব্যভিচারী নারীর জন্য তার অর্ধেক নির্দিষ্ট হয়েছে বিবাহিক দালী-বালিকার জন্য। এটা অতি স্পষ্ট যে, বিবাহিত স্বাধীন মুসলিম নারী ব্যভিচার করিলে তার শাস্তি মৃত্যুণ্ড হওয়া উচিত। কারণ সে তার পরিবার এবং স্বামীর উভয়েরই আশ্রয় ভোগ করে এবং এই জন্য তার শাস্তি পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা। যদিও পরিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে পাথর নিক্ষেপ করে শাস্তির বিধান উল্লেখ নাই তবুও উহ্যভাবে তার নির্দেশ রয়েছে আল্লাহর নবী বুঝিতে পেরেছেন এবং প্রয়োগ করেছেন এবং তিনি ব্যতীত অন্য কে আর কুরআন ভাল বুঝিতে পারে?
উপরোক্ত বর্ণনা হইতে ইহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, বিবাহিত পুরুষ অথবা নারী ব্যভিচার করিলে তাহার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্য কিছু নয়।

(খ) ব্যভিচারের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা

আবদুল্লাহ বিন উমর বলিয়াছেন যে, ব্যভিচার সংঘটন করিয়াছে এমন একজন ইহুদি এবং মহিলা-ইহুদিকে আল্লাহর নবীর নিকট উপস্থিত করা হইল। আল্লাহর নবী ইহুদির নিকট আসিলেন এবং বলিলেন যে, যে ব্যভিচার করে তাহার সম্পর্কে তওরাতে তোমরা কি দেখিতে পাও? তাহারা বলিল, আমরা তাহাদের মুখ বাঁধিয়া তাহাদিগকে গাধার পিঠে চড়াই এবং তাহাদিগকে একে অপরের উল্টা দিকে বসাইয়া নগরে ঘুরানো হয়। আল্লাহর নবী বলিলেন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের তওরাত নিয়া আস। তাহারা উহা নিয়া আসিলেন এবং যে পর্যন্ত না পাথর নিক্ষেপ করিবার বর্ণনায় আসেন সে পর্যন্ত তাহা পড়িতে থাকেন। যে ব্যক্তি তাহা পড়িতেছিলেন তিনি পাথর নিক্ষেপ করিবার বর্ণনার ওপর হাত স্থাপন করিয়া ছিলেন। এবং তাহার হাত রাখা স্থানের পূর্বে ও পরে পড়িতেছিলেন। আবদুল্লাহ বিন সানাম সেই সময় আল্লাহর নবীর নিকট বসিয়াছিলেন। নবী তওরাতের পাঠককে হাত উঠাইতে বলিলেন। তিনি হাত উঠাইলেন এবং দেখা গেল যে, তাহার নিচে পাথর নিক্ষেপ করিবার বর্ণনা রহিয়াছে। আল্লাহর নবী তাহাদের উভয়ের শাস্তির রায় ঘোষণা করিলেন এবং তাহাদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করা হইল। আবদুল্লাহ বিন উমর বলিলেন, পাথর নিক্ষেপকারীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম এবং আমি দেখিয়াছি যে, পুরুষ ইহুদি তাহার শরীর দিয়া মহিলা-ইহুদিকে রক্ষা করিতেছেন।[৪৬২]

[৪৬২] মুসলিম শরীফ।

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে ইসলামী আইনবিদদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। ইমাম শাফিঈ, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম আহমদের মতে, কোনো বিবাহিত যিম্মি ব্যভিচারে লিপ্ত হলে সে বিবাহিত মুসলমানের ন্যায় একই শাস্তির অধীন হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক এ মতের সঙ্গে একমত নন। তাঁদের মতে, এ ধরনের শাস্তি মূলত মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য, অমুসলিমদের জন্য নয়।

তাঁরা যুক্তি প্রদান করেন যে, কঠোর এ শাস্তি কেবল 'মুহসিন' বা নৈতিকভাবে সুরক্ষিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মুহসিন হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছেড়

(ক) আল্লাহ ও পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং অন্তর্গত ধর্মীয় চেতনা থাকা;

(খ) স্বাধীন ব্যক্তি হওয়া এবং বৈধ উপায়ে যৌন চাহিদা পূরণের সুযোগ থাকা;

(গ) বিবাহিত হওয়া।

এই তিনটি উপাদানের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নৈতিকভাবে সুরক্ষিত বলে গণ্য হন। যেহেতু অমুসলিম ব্যক্তি ইসলামী আকিদাগত বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত নন, তাই তাঁকে মুসলমানের সমপর্যায়ের 'মুহসিন' হিসেবে বিবেচনা করা নিয়ে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। তবে এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণকারীরা নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সেই ঘটনার উল্লেখ করেন, যেখানে তিনি এক ইহুদি পুরুষ ও এক ইহুদি নারীকে ব্যভিচারের অপরাধে রজমের শাস্তি প্রদান করেছিলেন। তাঁদের মতে, এটি অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ শাস্তি প্রয়োগের বৈধতার প্রমাণ। তবে অপরপক্ষ যুক্তি দেন যে, নবী (সা.) ঐ ক্ষেত্রে তাওরাতের বিধান অনুসারে বিচার করেছিলেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাও তাদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী বিচার গ্রহণে সম্মত ছিল।

সাক্ষ্য দানের পদ্ধতি

ব্যভিচারের শাস্তি শুধুমাত্র তখনই আরোপ করা যায় যখন তা চারজন ধার্মিক ও সৎ সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। সাক্ষীদের উপস্থিতিতে অপরাধের প্রকৃতি পরীক্ষা করা আবশ্যক। সাক্ষীরা যদি সম্পূর্ণভাবে ঘোষণা করেন যে তারা অপরাধ সংঘটনের সময় 'দৈহিক সংযুক্ত অবস্থায়' তা প্রত্যক্ষ করেছে এবং তাদের সাক্ষ্যের সত্যতা প্রকাশ্য ও গোপনভাবে যাচাই করা হয়, তখনই সেই সাক্ষ্য অনুযায়ী ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর করা হয়। স্বীকারোক্তিও বৈধ তখনই গণ্য হবে যখন তা চাপ প্রয়োগ ছাড়া স্বেচ্ছায় দেওয়া হয় এবং স্বীকারোক্তির পূর্ণ জ্ঞান থাকে।

কিছু আইনবিদ মনে করেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে, তবে তা বিশ্বাসযোগ্য এবং তাকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিতে হয়। স্বীকারোক্তি কারীর

প্রাপ্তবয়স্কতা এবং সুস্থ মস্তিস্কের অবস্থা অতিরিক্ত শর্ত হিসেবে গণ্য হয়। কারণ কোনো নাবালক অথবা মানসিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। চারটি ভিন্ন জায়গায় উপস্থিত হয়ে চারবার স্বীকারোক্তির যে শর্তটি রয়েছে তাতে অনেক আইনবিদ একমত।

ইমাম শাফিঈ'র মতে একবার স্বীকারোক্তি ব্যভিচারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হিসাবে গণ্য হয়। কারণ তিনি আইনকে সর্বক্ষেত্রেই এক বলে গণ্য করেন, কোনো অবস্থার স্বীকারোক্তি, স্বীকারোক্তিকৃত ঘটনা প্রকাশের উপায় মাত্র, এই উদ্দেশ্যে একবার স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট হিসাবে গণ্য হয়। বিপরীতক্রমে সাক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে এবং তাহারা সৎ হইলে তাহা সকল সন্দেহ নিরসনের জন্য উপকার আসে। এবং তাহা মানে পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি বিধানে সহায়ক হয়। অথচ একই ব্যক্তির বার বার ঘোষণার মাধ্যমে সেইরূপ কোনো অতিরিক্ত সন্তুষ্টি আহরণ করা হয় না।

ইমাম শাফিঈ এইখানে যে মত ব্যক্ত করেছেন অধিকাংশ আইনবিদই তার বিরোধিতা করেছেন। তাদের যুক্তি হলো, মঈজের মাস'আলায় মহানবী (সা) শাস্তির আদেশ দেননি যতক্ষণ না সে তার অপরাধ চারটি ভিন্ন স্থানে চার স্বীকার করতেন। উদাহরণস্বরূপ মায়িজ (র.) একাধিকবার মহানবীর নিকট স্বীকার করেছিলেন এবং চতুর্থ বারের পর তাকে পাথর নিক্ষেপের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। আবদুল্লাহ বিন বুরাইদা বলেন যে, 'তিনি তাহার পিতার নিকট শুনিয়াছেন যে, মায়িজ বিন মালিক আল-আসলামী আল্লাহর রাসূলের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, 'আল্লাহর রাসূল, আমি নিজেই অপরাধ করিয়াছি। ব্যভিচার করিয়াছি এবং আমি আন্তরিকভাবে আকাঃক্ষা করি যে, আপনি আমাকে পবিত্র করিবেন। তিনি তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া তাকাইলেন। পরের দিন মায়িজ আবার তাহার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, 'আল্লাহর রাসূল, আমি ব্যভিচার করিয়াছি।' আল্লাহর নবী দ্বিতীয়বার তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া থাকাইলেন এবং তিনি তাহাকে তাহার লোকদের নিকট এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, 'তোমরা জান যে তাহার মাথায় কোনো অসুবিধা আছে কিনা?[৪৬৩]

তারা তর মাথায় অসুবিধা আছে মর্মে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, 'আমরা যতটা বিচার করিতে পারি তাহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, আমাদের মধ্যে তিনি একজন আনী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কিন্তু নহে।' তিনি (মায়িজ) তৃতীয় বারের মত আসিলেন এবং মহানবী (সা) তাহাকে পুনরায় পূর্বের ন্যায় প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহার সম্পর্কে তাহাদিগের নিকট জানিতে চাইলে তাহারা বলিলেন যে,

---

[৪৬৩] শামসুর রহমান, গাজী, ইসলামের দণ্ডবিধি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তাহার কোনো অসুবিধা নাই অথবা তাহার মাথায়ও কোনো অসুবিধা নাই। যখন সে চতুর্থবারের মত আসিল তখন তাহার জন্য একটি গর্ত খোঁড়া হইল এবং মহানবী (সা) তাহার ওপর রায় ঘোষণা করিলেন এবং তাহাকে পাথর নিক্ষেপ করা হইয়াছিল।[৪৬৪]

ব্যভিচারের জন্য সুনির্দিষ্ট শাস্তি শুধুমাত্র মহিলার গর্ভধারণের ঘটনার ওপর ভিত্তি করিয়া দেওয়া যায় কিনা তাহা সম্পর্কে মতভেদ আছে। যে সকল মহিলার স্বামী নাই অথবা যে সকল দাসীর প্রভু নাই এমন মহিলাকে গর্ভধারণ করিলে তাহা তাহার বাভিচার সম্পর্কে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে। মালিকিও একই অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ আইনবিদ এই মতের সাথে একমত নয়। তারা বলেন যে, শুধুমাত্র গর্ভধারণই কোনো মহিলাকে এইরূপ কঠিন শাস্তিযোগ্য করিয়া তোলে না। শরীয়তের মৌলিক আদর্শ অথবা নীতিই হলো সন্দেহের সুবিধা আসামির প্রতি দেয়া। মহানবী (সা)-এর হাদিসও এই নীতির দিকে আলোকপাত করে। 'শাস্তি যতটা পরিহার করা যায় ততটা পরিহার কর। অপর একটি হাদিস আছে যাহাতে বলা হইয়াছে, তোমরা ক্ষমতার আওতায় যতটা আছে ততটা শাস্তি তুমি মুসলমান হইতে পরিহার কর। যদি তাহা পরিত্যাগ করিবার অন্য কোনো পথ থাকে। কারণ ইমাম ক্ষমা করিয়া যদি কোনো ভুল করেন তবে তাহা ভুলভাবে শাস্তি আরোপ করিবার চাইতে ভাল।'

শাস্তি কার্যকর করার পদ্ধতি

কশাঘাতের শাস্তি প্রদান পদ্ধতি ইসলামে পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ আছে। প্রধান বিষয়গুলো হলো-

(১) যে সকল লাঠিতে কোনো গিট নাই তা দ্বারা শাস্তি প্রদান করতে হবে এবং সহ্যের মাত্রার মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ খুব কঠিনভাবে নয় আবার হালকাভাবেও শক্তি ব্যবহার করা যাবে না। হযরত আলী (রা) যখন শাস্তি প্রদান করতেন, তখন তিনি লাঠির গিট মসৃণ করে লইতেন, যাতে তা অতি শক্তিশালী আঘাত সৃষ্টি না করে। অপরপক্ষে অতিমাত্রায় মোলায়েম হওয়া শাস্তির উদ্দেশ্যে সাধনে অপর্যাপ্ত হিসাবে গণ্য হয়। কাজেই লাঠিটি বেশি শক্ত অথবা নরম হওয়া উচিত নয়। কোনো ব্যক্তিকে যখন শাস্তি প্রদান করা হয় তখন তাকে

[৪৬৪] ইমাম মুসলিম, সহিহ মুনাবিধ কিতাবল।

তার কটির কাপড় ব্যতীত সকল কাপড় খুলিয়া ফেলিতে হয়, কারণ এইভাবে শাস্তি আরোপ করলে তা সর্বোত্তমভাবে কার্যকরী হয়।

(২) একশত কশাঘাতের সকল কশাঘাত শরীরের একই জায়গায় প্রদান করা যায় না। কারণ ত জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দেখা দিতে পারে এবং কোনো কশাঘাতেই মাথায়, মুখমণ্ডলে এবং গোপন অংগে প্রদান করা যায় না। মহানবী (সা) একবার শাস্তি প্রদানকারীকে বলেছেন যে, শাস্তি প্রদানের সময় মুখমণ্ডল, মাথা এবং গোপন অংগে আঘাত যেন না করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৩) শাস্তি প্রদানকালে পুরুষ লোকদের দাঁড় দাঁড় করানো হয়, নারীদের বসানো হয় এবং নারীদের পোশাক এমনভাবে বাঁধা হয় যাতে দেহের কোনো অংশ প্রকাশ না পায়। ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানের সময় আব্রু রক্ষা করতে হবে। নারী ও পুরুষ উভয়ের শাস্তি সমান।

(৪) পবিত্র কুরআনে কশাঘাত প্রদানকালে Jald (যিলদ) শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছে যা Jild (যালদ) শব্দটি হতে জন্ম নিয়েছে আইনবিদগণ তাই বর্ণনা করেছেন, কশাঘাত এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে চামড়ার নিচে কোনো ক্ষত সৃষ্টি হয়।

(৫) শাস্তি প্রদানকারীকে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করতে হবে না, তেমনি হালকাভাবে দিতে হলেও হবে না, যাতে অপরাধীর ক্ষতি না হয়।

(৬) অত্যাধিক গরম অথবা অতিরিক্ত ঠান্ডার সময় কশাঘাত প্রদান করা যায় না। শীতের সময় রৌদ্রের মধ্যে এবং গরমের দিনে ছায়ায় ছায়ায় বসিয়ে কশাঘাতের শাস্তি প্রদান করতে হবে।

(৭) অপরাধীকে কোনো গাছের সাথে বেঁধে খালি পিঠে কশাঘাত দেওয়া ঠিক নয়।

(৮) অপরাধীর শরীরের অবস্থা অনুসারে কশাঘাত কয়েক দিনে ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে, তবে একই দিনে শাস্তি দেওয়া উত্তম।

(৯) নিষ্ঠুর ব্যক্তি কর্তৃক শাস্তি প্রদান করা ঠিক নয়। ইসলামী আইন সম্পর্কে জ্ঞাত এমন পণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক শাস্তি প্রদান করা উচিত। কারণ শাস্তি যেন ইসলামী আদর্শ ও নীতি অনুসারে প্রয়োগ করা হয়।

(১০) অপরাধী যদি অসুস্থ থাকে এবং তা আরোগ্য সম্ভব হয় তবে আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি স্থগিত রাখা আবশ্যক। কিন্তু কাজী যদি দেখতে পান যে, অসুস্থতা আরোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই তখন একশত

লাঠি একত্র করিয়া অপরাধীর শরীরে একত্রে আঘাত করে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান পালন করা হয়।

(১১) স্ত্রীলোকের কোলের শিশু যখন স্তন ত্যাগ করিতে থাকে, তখন তাকে শাস্তি প্রদান করিতে হয়।

সংক্ষেপে, কশাঘাতের শাস্তি দিতে গেলে সব শর্ত ও বিধি যথাযথভাবে মানা আবশ্যক, যাতে ইসলামের নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী শাস্তি কার্যকর হয়।

শাস্তি কার্যকর করার পরিবেশ

ইসলামী শরীয়ত, সমাজ ও রাষ্ট্রে যেনা বা ব্যভিচারকে একটি গুরুতর অপরাধ হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এইটি দণ্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তবে এই শাস্তি কে, কখন এবং কীভাবে এবং কোথায় প্রযোগ করা হবে তা নির্ভর করে সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবেশের ওপর। যে সমাজে ইসলাম সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়, মানুষের মৌলিক চাহিদা যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিবাহের নিশ্চয়তা নেই, সেখানে চুরি বা ব্যাভিচারের শাস্তি কার্যকর করা বাস্তবসম্মত নয়। উদাহরণস্বরূপ, চুরি করলে হাত কাটা বা ব্যভিচারের জন্য বেত বা পাথর মারার মতো শাস্তি প্রয়োগ করা সেখানে শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে? এ বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া খুবই জরুরি। নিম্নের আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

যেনা ব্যাভিচারের শাস্তি সম্পর্কে মহান রাব্বুল আলামীন সূরায়ে নূরের ২ নম্বর আয়াতে বলেছেন, 'ব্যাভিচারী নারী ও ব্যাভিচারী পুরুষ উভয়ের প্রত্যেককেই ১০০টি বেত্রাঘাত কর।[৪৬৫]

প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা কুরতুবী (রঃ) উক্ত আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যার ব্যাপারে সকলেই একমত যে, শরয়ী হুদুদ বা দণ্ড প্রয়োগের বিধান রাষ্ট্র প্রধান বা তার স্থলাভিষিক্তের জন্যই প্রযোজ্য।[৪৬৬] অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যার সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছাড়া এবং সরকার ব্যতীত কোনো অবস্থায় ইসলামী দণ্ডবিধি কার্যকর করা যাবে না। সরকার বা সরকারের প্রতিনিধি কেবল তা বাস্তবায়ন করতে পারেন অন্য কেউ নয়। বাংলাদেশের মত মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র যেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ আইন প্রতিষ্ঠিত সেখানে ইসলামী দণ্ডবিধির কার্যকারিতার অবকাশ নেই।

---

[৪৬৫] সুরা নুর, আয়াত ২।

[৪৬৬] আল্লামা কুরতুবী আল জামে লী আহকামিল কুরআনিল কারীম, দারুল ফিকির, বৈরুত।

ইমাম আবু বকর আল জাসসাহ (মৃত্যু ৩৭০ হিঃ), আহকামুল কুরআনে হুদুদ বা ইসলামী দণ্ডবিধি সংক্রান্ত কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করার পর বলেন, 'উলামায়ে কিরাম সকলেই অবগত যে, শরিয়ী দণ্ড প্রয়োগের আদেশ কেবলমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, জনসাধারণের জন্য নয়। সুতরাং (হুদুদ সংক্রান্ত) আয়াতের অর্থ এরূপ হবে যে, মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান শাসকগণই (চোরদের হাত কাটবেন এবং ব্যাভিচারীদের) বেত্রাঘাত করবেন।[৪৬৭]

ইমাম আবু বকর আল জাছছাছ এর এই বক্তব্য যা তিনি পবিত্র কোরআনের 'হদ' সম্পর্কিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন তা হলো, ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারই কেবল ব্যভিচারীদের শাস্তি দিতে পারেন। এ বিষয়ে সকল ইসলামী পণ্ডিতগণ একমত পোষণ করেন।

ইসলামী আইন রাষ্ট্র বা সরকার ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়ার অধিকার দেয় না। আলোচিত আয়াতে 'বেত্রাঘাত কর' হুকুম শুধুমাত্র রাষ্ট্র ও বিচারকমণ্ডলীর জন্য প্রয়োজ্য। মাওলানা মওদুদী বলেছেন, 'ইসলামী আইন রাষ্ট্র সরকার ছাড়া অপর কাহাকেও যেনাকারী পুরুষ ও নারীর বিরুদ্ধে কোনোরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং শাস্তি দেয়ার অধিকার দেয় না। সে আদালত ব্যতীত অন্য কাহাকেও তাহাদিগকে শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা প্রদান করে না। আলোচ্য আয়াতে তাহাদিগতে বেত্রাঘাত কর বলিয়া যে হুকুম দেয়া হইয়াছে, তা জনসাধারণকে দেয়া হয় নাই, দেয়া হইয়াছে ইসলামী রাষ্ট্রে শাসক ও বিচারকমণ্ডলীকে। এই ব্যাপারে মুসলিম উম্মতের সব ফকীহই সম্পূর্ণ একমত।[৪৬৮]

হুদুদ সংক্রান্ত পবিত্র কোরআনের উপর্যুক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যায় মাওলানা মওদুদী অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। অন্যান্য উলামায়ে কিরামদের মত তিনি ইসলামী দণ্ডবিধি[৪৬৯] কার্যকর করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের সাথে সাথে উলামায়ে কিরামদের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এখানে উলামায়ে কিরাম বলতে ঐ সকল ওলামাদের তিনি বুঝিয়েছেন যারা বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, পণ্ডিত এবং আদালতের কার্যক্রমের সাথে জড়িত। আমরা বিভিন্ন সময়ে লক্ষ্য করে থাকি যে, একদল আলেম যাদেরকে যোগ্যতার কারণেই আদালতের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়।

---

[৪৬৭] আবু বকর আল জাছছাছ: আহকামুল কুরআনুল কারীম, খণ্ড-৩, সুহায়িল একাডেমী, পৃ ২৮৩।

[৪৬৮] মওদুদী, সাইয়েদ আবুল আলা, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৩।

[৪৬৯] আতত্বহাবী, আবু জাফর: মুখতাছারু ইখতিলাফিল ওলামা দারুল বাছাইয়ের আল ইসলামিয়া, খণ্ড ৩, পৃ ৩০৮।

ইমাম আবু জাফর আততৃহাবী (র) (মৃত্যু ৩২১ হি) বলেন, 'হুদুদ বা ইসলামী দণ্ডবিধি কার্যকর করবে কে? শরিয়ী দণ্ড কার্যকর করবেন ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান ও প্রশাসক। অন্য কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তা কার্যকর করবে না।

আল্লামা কাছানী (র) (মৃত্যু ৫৮৭ হি) তাঁর বিখ্যাত ফিকাহ গ্রন্থ বাদায়েউস সানায়েতে উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, শরিয়ী দণ্ড কার্যকর করার অন্যতম শর্ত হলো মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান অথবা তার পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি (ইসলামী আদালত)-ই শরয়ী হুদুদ বা ইসলামী দণ্ডবিধি কার্যকর করবেন।

আল্লামা ইবনে আবেদীন (রহ) (মৃত্যু ১২৫২ হিঃ) একই বিষয়ে তার ব্যাখ্যায় বলেন, 'হদ' বা ইসলামী দণ্ডবিধি কার্যকর করা ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের সাথেই নির্দিষ্ট।[৪৭০] স্বামী মনিব এবং অন্যায় কাজ সরাসরি প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তিও প্রয়োগ করতে পারে।[৪৭১]

ইসলামী দণ্ডবিধি বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ আততাশরী উল জ্বিনাই আল ইসলামীতে বিখ্যাত ইসলামী পশ্চিম, ইসলামী আইনবিশারদ ও কায়রোস্থ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আব্দুল কাদের আওদাহ উল্লেখ করেন, 'সকল ফকীহগণ এ বিষয়ে একমত যে, 'হদ' যা দণ্ডবিধি ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান বা তার স্থলাভিষিক্ত ছাড়া অন্য কেউ কার্যকর করতে পাবে না। কারণ 'হদ' আল্লাহ তায়ালার হক এবং তা প্রবর্তিত হয়েছে সমাজের কল্যাণের জন্য। তাই 'হদ' কার্যকরের বিষয়টি সমাজ প্রধানের ওপরই অর্পিত হবে আর তিনি হবেন রাষ্ট্র প্রখান। 'হদ' কার্যকরে ইজতিহাদের প্রয়োজন পড়ে। আর তা পূর্ণ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বা হাড়াছাড়ির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এ বিষয়টি রাষ্ট্র প্রধানের ওপরই ন্যস্ত করা কর্তব্য। আর রাষ্ট্র প্রধান নিজেও 'হদ' কার্যকর করতে পারেন এবং অন্যের মাধ্যমেও তা কার্যকর করাতে পারেন। মনিব তার মাসের ওপর 'হদ' প্রয়োগ করতে পারবেন কিনা এবিষয়ে ইমাম আবু হানিফা (ক) এর মাঝে ও ইমাম শাফেয়ী (রা.), ইমাম মালেক (রা.) এবং ইমাম আহমদ (রা) মাঝে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে যেহেতু দাস প্রথা বিদ্যমান নেই সেহেতু এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা নেই।[৪৭২]

---

[৪৭০] ইমাম আলাউদ্দিন আল কাছানী, বাদায়েউস সানায়ে কিতাবুল হুদুদ অধ্যায়, দারুল কিতাব, দেওবন্দ, ভারত, ৫ম খণ্ড, পৃ-৩২৪।

[৪৭১] আত তাজীর

[৪৭২] ইবনে আবেদীন, রোদ্দুল মুহতার তাজীর অধ্যায় খণ্ড-৪, এস এম সাইদ কোম্পানী, করাচী, পৃ. ৩৬০।

ইসলামের দৃষ্টিতে ফাতওয়ার প্রায়োগিক বিধান

আমাদের সমাজে কতিপয় ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, কোনো একটি ঘটনা বিশেষত যেনা ব্যভিচার অথবা তালাক সংঘটিত হওয়ার পর গ্রামের সাধারণ মানুষ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রামের সরদার ও মাতব্বরগণ নিজেদের ইচ্ছা বা অভিপ্রায় বাস্তবায়নের জন্য শরীয়ত-কে টেনে আনেন। তারা তখন শরীয়ত মত বিচার ফায়সালার কথা উলেখ করেন। তারা যে শরীয়তের দোহাই দিয়ে নিজেদের হীন স্বার্থ চরিভার্থের জন্য সচেষ্ট হন সে শরীয়ত তাদের এ কাজকে কখনও অনুমোদন করে না।

ইসলামী আইনবেত্তাগণ সকলেই একমত যে, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ছাড়া শরীয়তের দণ্ডবিধি সম্পর্কিত কোনো ফাতওয়া বা রায় কার্যকরী করা যায় না। ইসলামী রাষ্ট্র বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ও এটি কার্যকরী করার দায়-দায়িত্ব সরকার বা প্রশাসনের। কোনো ব্যক্তি বিশেষ এ কাজ করতে পারে না। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দণ্ডবিধি সম্পর্কিত কোনো বিধান কার্যকরী করার কোনো প্রশ্নই উঠে না। নিচের উদ্ধৃতি থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন: 'ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর প্রত্যেককে একশ'টি করে বেত্রাঘাত কর।[৪৭৩]

প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা কুরতুবী (র।) উক্ত আয়াতের তাফসীরে উলেখ করেন, 'এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, শরয়ী হুদুদ বা দন্ড প্রয়োগের বিধান রাষ্ট্র প্রধান বা তার স্থলাভিষিক্তের জন্যই প্রযোজ্য।'

ইমাম আবু বকর আল-জাছছাছ (মৃত্যু ৩৭০ হি) আহকামুল কুরআনে (খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৮৩) হুদুদ সংক্রান্ত কয়েকটি আয়াত ব্যাখ্যায় বলেন, 'উলামায়ে কিরাম সকলে অবগত যে, শরিয়ী দণ্ড প্রয়োগের আদেশ মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, জনসাধারণের জন্য নয়। সুতরাং চোরদের হাত কাটা বা ব্যভিচারীদের বেত্রাঘাত কেবল মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান বা শাসকদের দায়িত্ব।

(৬) ইসলামী দণ্ডবিধি বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ 'আত তাশরীউল জিনাঈ আল-ইসলামী' তে শায়খ আব্দুল কাদের আউদাহ উল্লেখ করেন, 'সকল ফকীহগণ এ বিষয়ে একমত যে, 'হদ' বা ইসলামী দণ্ডবিধি কেবলমাত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান বা তার স্থলাভিষিক্ত ছাড়া অন্য কেউ কার্যকর করতে পারবে না। কারণ 'হদ' আল্লাহ তা'আলার হক এবং তা সমাজের কল্যাণের জন্য প্রবর্তিত হয়েছে। তাই 'হদ'

---

[৪৭৩] আওদাহ, আব্দুল কাদের: আডডাপরিটল জিনাই আল ইসলামী মুয়াস সাধাতুর রিসালাহ, ১২ ১৬২২ খ্রিঃ পৃ. ৪৪৪।

কার্যকরের বিষয়টি সমাজ বা রাষ্ট্র প্রধানের ওপরই অর্পিত হবে। 'হদ' কার্যকর করতে ইজতিহাদের প্রয়োজন পড়ে আর তা পূর্ণ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বা ছাড়াছাড়ির সম্ভাবনা রয়েছে তাই এ বিষয়টি রাষ্ট্র প্রধানের ওপরই ন্যস্ত করা কর্তব্য, আর রাষ্ট্রে এখান নিজেও হদ কার্যকর করতে পারেন এবং অন্যের মাধ্যমে ও তা কার্যকর করতে পারেন।

মনিব তার দাসের ওপর 'হদ' প্রয়োগ করতে পারবেন কিনা এ বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা (র) এর থাকে ও ইমাম শাফেয়ী (রা), ইমাম মালেক (র), ইমাম আহমদ (৩) এর মাঝে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে যেহেতু কোথাও দাস প্রথা সেই তাই এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা নেই।

ইসলামী আইন রষ্ট্রে সরকার ছাড়া অপর কাহাকেও যিনাকারী পুরুষ ও নারীর বিরুদ্ধে কোনোরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করার এবং শাস্তি দেওয়ার অধিকার দেয় না। সে আদালত ব্যতীত অন্য কাকেও তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে না। আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে 'বেত্রাঘাত কর' বলিয়া যে হুকুম দেয়া হয়েছে তা জনসাধারণকে দেওয়া হয় নাই, দেওয়া হইয়াছে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক ও বিচারকমণ্ডলীকে। এই ব্যাপারে মুসলিম উম্মাতের সব ফকীহই সম্পূর্ণ একমত।

উপরোক্ত কিতাব সমূহের বক্তব্য ধারা এ কথাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, জনগণ 'হদ' প্রয়োগের কোনো অধিকার রাখে না বরং বিষয়টি সম্পূর্ণ মুসলিম সরকারের ওপর ন্যস্ত।[৪৭৪]

ইসলামী দণ্ডবিধি (হদ)

আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যতদূর সম্ভব তোমরা মুসলমানদের থেকে হদ প্রতিহত কর। যদি রেহাই দেয়ার কোনো উপায় থাকে তবে তাকে তার পথে ছেড়ে দাও (অভিযোগ থেকে রেহাই দাও)। কারণ ইমামের (কর্তৃপক্ষের) শাস্তি প্রদান করে ভুল করার তুলনায় ক্ষমা করে ভুল করা উত্তম।[৪৭৫]

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির পার্থিব অসুবিধাগুলোর মধ্যে কোনো একটি অসুবিধা দূর করে দেয়, আল্লাহ তার আখেরাতের অসুবিধাগুলোর একটি

---

৪৭৪ সূরা নূর, আয়াত-২।

৪৭৫ আবুল হাছান আলী, আল মুরগীসনানী: আল হিদায়া', মাকতারা থানভী, দেওবন্দ ইউ.পি ভারত , ১৪০০ খ্রিঃ পৃ. ৫১।

অসুবিধা দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। বান্দাহ যতক্ষণ তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে আল্লাহও ততক্ষণ তাকে সাহায্য করতে থাকেন।[৪৭৬]

৩. সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেন: মুসলমান একে অপরের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করতে পারে না এবং তাকে শত্রুর হাতেও সমর্পন করতে পারে না বা তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারে না। কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে লেগে থাকে, আল্লাহও তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের কোনো অসুবিধা দূর করে দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার অসুবিধাগুলোর মধ্যে একটি অসুবিধা দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন। [৪৭৭]

৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) মাইয ইবনে মালেক (রা)-কে বলেন: আমি তোমার ব্যাপারে যা জানতে পেরেছি তা কি সত্য? তিনি বলেন, আমার সম্পর্কে আপনি কি খবর পেয়েছেন? তিনি বলেনঃ আমি জানতে পারলাম, তুমি অমুকের বাঁদীর ওপর পতিত হয়েছো (যেনা করেছ)। তিনি বললেন হাঁ। অতঃপর তিনি চারবার স্বীকারোক্তি করেন। তিনি তা সম্পর্কে রায় দিলে তদানুযায়ী তাকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করা হলো।[৪৭৮]

আবু ঈসা বলেন এ হাদিসটি হাসান।

৫. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাইয আল-আসলামী (রা) রাসুলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে বলেন, এই ব্যক্তি (মাইয) যেনা করেছে। তিনি তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। মাইয (রা)-ও অপর দিকে ঘুরে এসে বলেন, এই ব্যক্তি যেনা করেছে। তিনি পুরায় তার থেকে মুখ ঘুরিয়ে দেন। মাইয় (রা)-ও অপর দিক থেকে ঘুরে এসে পুনর্বার বলেন, যে আল্লাহর রাসুল। এই ব্যক্তি যেনা করেছে। চতুর্থধারে তিনি তার সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন এবং তদানুায়ী কাকে হাররার প্রান্তরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করা হয়। পাথরের আঘাতে জর্জরিত হয়ে তিনি পলায়ন করে এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। ঐ লোকটির হাতে ছিল উটের চোয়ালের হাড়। সে তা দিয়ে তাকে আঘাত করে এবং অন্য লোকরাও আঘাত করে। ফলে তিনি মারা যান। লোকেরা রাসূল (সা)-এর কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করে যে, তিনি পাথরের আঘাত খেয়ে এবং

---

[৪৭৬] মওদুদী, সাইয়েদ আবুল আলা, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৬।

[৪৭৭] বুখারী, মুসলিম, দারেমি।

[৪৭৮] আবু দাউদ, মুসলিম শরীফ।

সাক্ষাৎ মৃত্যুর স্পর্শ পেয়ে ভয়ে পালাচ্ছিলেন। রাসূল (সা) বলেনঃ তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন? আবু ঈসা বলেন, এ হাদিসটি হাসান।

৬. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি নবী (সা) এর কাছে এসে যেনায় লিপ্ত হওয়ার স্বীকারোক্তি করে। তিনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পুনরায় সে তার অপরাধ স্বীকার করে। তিনি পুনরায় তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। সে এভাবে তার নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য দিল। নবী (সা) বলেন। তুমি পাগল নাকি? সে বলল না। তিনি জিজ্ঞেন করেন। তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, হাঁ। তিনি আর সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তাকে ঈদের মাঠে দিয়ে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করা হলো। পাথরের আঘাত খেয়ে সে পলায়ন করতে থাকলে তাকে গ্রেফতার করে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করা হয়। রাসূল (সা) তার সম্পর্কে ভাল কথা বলেছেন (তার প্রশংসা করেছেন)। কিন্তু তিনি নিজে তার জানাযা পাড়ননি । সহীহ বুখারী ও মুসনাদে আবদুর রাযযাকে উল্লেখ আছেঃ নবী (সা) মুসলমানদের সংগে নিয়ে তার জানাযা পড়েছেন। অবশ্য তিনি তাকে রজম করার দিন তার। জানাযা পড়েননি, বরং পরের দিন জানাযা পড়েছেন। [৪৭৯] আবু ঈসা বলেন, এ হাদিসটি হাসান ও সহীহ।

একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এ হাদিস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা বলেছেন, যেনাকারী নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষী দিলে (স্বীকারোক্তি করলে) তার ওপর যেনার শাস্তি কার্যকর হবে। ইমাম আহমাদ ও ইসহাকের এই মত (আবু হানীফারও এই মত)। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলেম বলেছেন, একবার যেনার অপরাধ স্বীকার করলেই দণ্ড কার্যকর হবে। ইমাম মালেক ও শাওিপর এই মত। শেষোক্ত দুই ইমাম আবু হুরায়রা ও যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) বর্ণিত হাদিস নিজেদের মতের অনুকুলে দলিল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। হাদিসটি হলো-

৭. 'দুই ব্যক্তি নিজেদের মধ্যকার ঝগড়া মীমাংসার জন্য রাসূল (সা)-এর কাছে পেশ করে। তাদের একজন বলে, হে আল্লাহর রাসূল। আমার ছেলে এই ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে যেনা করেছে। নবী (সা) বলেন। হে উনাইস। তার স্ত্রীর কাছে যাও। যদি সে যেনার অপরাধ স্বীকার করে তবে তাকে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) কর।' মহানবী (সা) এ হাদিসে তাকে একথা বলেননি যে, যে চারবার স্বীকারোক্তি করলে তাকে রজম কর।

---

[৪৭৯] তুহফামুল আহ্ওয়াযী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ, ৬৯৫-৬৯৬।

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহ থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, যে কোনোভাবে কাউকে শাস্তি দেয়া ইসলামের কাম্য নয়। এজন্য ইসলাম যতদূর সম্ভব শাস্তি এড়িয়ে যাওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নবী করিম (স) স্পষ্ট বলেছেন ভুলক্রমে শাস্তি দেয়া অপেক্ষা শাস্তি না দিয়ে ভুল করাও ভাল। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, শাস্তি দানের বিষয়কে পারতপক্ষে পরিহার করা। রাসূলুল্লাহ (স) এও বলেছেন সম্ভব হলে তোমার ভাই-এর দোষত্রুটি গোপন রাখ। এখানে দোষত্রুটি বলতে একেবারে ছোট খাট দোষ ত্রুটি রয় বরং দণ্ডবিধির আওতায় আসে এমন দোষত্রুটিকে বুঝানো হয়েছে।

সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় করণীয়

উপর্যুক্ত কুরআন, হাদিস ও ইসলামী স্কলারদের অভিমত অনুযায়ী ইসলামী সমাজ ব্যতিত ইসলামী হদ বা দণ্ডবিধি কার্যকর করা যাবে না। এ বিষয়ে কোনো ধরনের প্রশ্ন তোলা অবান্তর এতদসত্ত্বেও প্রশ্ন দাড়ায়। আলোচ্য অপরাধের শাস্তি বিধানের অথবা সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কোনো নীতি বা পন্থা অবলম্বন করা হবে নাকি কোনো কিছু না করেই সমাজকে তার আপন গতিতে ছেড়ে দেয়া হবে এর জবাবে বলা যায় সমাজকে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ছেড়ে দিলে সেখানে মূল্যবোধ নীতি নৈতিকতা ও শৃঙ্খলা কিছুই থাকবে না। এমতাবস্থায় সমাজের মূল্যবোধ ও শৃঙ্খলা সংরক্ষণকল্পে অবশ্যই একটি নীতিমালা ও আইন থাকতে হবে যা সমাজকে অমানুষের সমাজে পরিণত করতে সহায়তা করবে।

অতএব সামগ্রিক বিষয় পর্যালোচনা করে আমরা একথা বলতে পারি যে, ইসলামী সমাজে দণ্ডবিধি সম্পর্কিত শাস্তিসমূহ যথাসম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে। তবে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইনের দারস্থ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশে ফাতওয়ার ব্যবহার অপ্রব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার সম্পর্কিত পিএইচডি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে যে বিষয়টি চোখে পড়েছে তা হচ্ছে আমাদের গ্রামীণ সমাজে কতিপয় ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, সন্দেহবশত অথবা খুবই ঠুনকো অভিযোগে গ্রাম্য সালিশ বসিয়ে কোনো নারীকে শাস্তি দিতে। অথচ ইসলাম সুস্পষ্টভাবে বিধান দিয়েছে যে, কোনো নারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দিলে তা একদিকে যেমন শাস্তিযোগ্য অপরাধ অন্যদিকে কবিরাহ গুনাহ। তাই ইসলামি বিধানে প্রতি আন্তরিক থাকলে আমাদের উচিত নিজস্ব কল্যাণ ও সমাজের সুরক্ষার জন্য শাস্তি পরিহারের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে।

উপসংহার

ইসলামী শরীয়ত এবং ইসলামী আইন ব্যবস্থা স্পষ্টভাবে শাস্তি ও দণ্ডবিধির সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করেছে। হদ বা দণ্ডবিধি এমন একটি প্রক্রিয়া, যা শুধুমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের মাধ্যমে এবং বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালত ও শাসকের অধীনে কার্যকর করা যায়। কোনো ব্যক্তি বা সাধারণ জনগণ নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী ইসলামী শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবে না। প্রমাণ হিসেবে কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী পণ্ডিতদের মতামত নির্দেশ করে যে, শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বদা শান্তি, মীমাংসা এবং ক্ষমার প্রাধান্য দেওয়া উচিত। নবী করিম (সা) নিজেও বলেছেন, যেকোনো ভুলে শাস্তি দেওয়া অপেক্ষা ক্ষমা করা উত্তম।

সামাজিক বাস্তবতায় দেখা যায়, বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজে সন্দেহজনক বা ক্ষুদ্র অভিযোগের ভিত্তিতে সালিশে কোনো নারীকে শাস্তি দেয়া হয়। পিএইচডি গবেষণার মাধ্যমে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। ইসলাম এমন কোনো কাজকে অনুমোদন করে না; মিথ্যা অভিযোগ বা অযথা শাস্তি একদিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ, অন্যদিকে কবিরাহ গুনাহ। তাই ইসলামী বিধান অনুসারে শাস্তি প্রয়োগ সর্বদা সীমিত ও দায়িত্বশীল হতে হবে।

সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অবশ্যই নীতি, আইন এবং আদালতের কার্যক্রমকে ব্যবহার করতে হবে। ইসলামী সমাজে দণ্ডবিধি সম্পর্কিত শাস্তি যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলাই উত্তম, তবে রাষ্ট্রীয় আইন ও নৈতিক নিয়ম-কানুনের মাধ্যমে সমাজকে অরাজকতা ও নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা, সহনশীলতা, এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা।

সারসংক্ষেপে বলা যায়, ইসলামী সমাজে দণ্ডবিধি ও হদ কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সরকারই মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত, এবং শাস্তি সর্বদা এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে সমাজের নৈতিকতা, মানবিকতা এবং সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা পায়। ব্যক্তিগত স্বার্থ, বিদ্বেষ বা অগোছালো প্রক্রিয়া কখনোই ইসলামী শাস্তির উদ্দেশ্য হতে পারে না।

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা গ্রন্থ

১. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ, ধর্মে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৭৪।

২. ব্রহ্ম, ড. তৃপ্তি: বাংলার ইসলামী সংস্কৃতি, কলিকতা, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ।

৩. রহমান, শেখ মুহাম্মদ লুৎফর: ইসলাম, রাষ্ট্র ও সমাজ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭।

৪. আওদা, আব্দুল কাদের: দীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য, অনু: মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ঢাকা আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৮।

৫. আব্দুল খালেক: নারী নারী নির্যাতনের রকমফের, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮১।

৬. কাসেম, প্রিন্সিপাল আবুল: ধর্ম, সমাজ ও বিজ্ঞান, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২।

৭. ওবায়দুল্লাহ শাদরুশ শরীয়াতুল আসগার, 'শরহে বেকায়াহ', অনুবাদ ও সম্পাদনায় মোহাম্মদ হাদিসুর রহমান, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৩।

৮. উসমানী তাক্বী মাওলানা: উসুলে ইফতা, করাচীঃ ইদারাতুল কোরআন ওয়াল উসুমূল ইসলামীয়া, ১৯৮৫।

৯. আব্দুল ওহাব খাল্লাফ, ইসলামি আইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (অনুবাদ-মাওলানা ছমির উদ্দীন), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬।

১০. রাম, মালিক, নারী ও ইসলামী শিক্ষা, অনুবাদ: মাহমুদা বেগম নেকু, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

১১. রহীম, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল: পরিবার ও পারিবারিক জীবন, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৮।

১২. চৌধুরী, হাসান আলী: ইসলামের ইতিহাস, ঢাকা, আইডিয়াল লাইব্রেরি, ১৯৮৯।

১৩. আজরফ, অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ: জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১।

১৪. খান, আব্বাস আলী, ইসলাম ও জাহিলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব, ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯১।
১৫. জালাল উদ্দীন আসার উমরী সাইয়েদ, ইসলামী সমাজে নারী (অনুবাদ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক) আধুনিক প্রাকশনী, ঢাকা, ১৯৯১।
১৬. সিদ্দিকী, ড. মাযহান উদ্দিন, ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্ম, অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ হাসান, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১।
১৭. চাঁদ ড. তারা, ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১।
১৮. সালাহুদ্দীন, মুহাম্মদ, ইসলামে মানবাধিকার, অনু. মুহাম্মদ আবুত তাওয়াম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২।
১৯. মওদুদী, সাইয়েদ আবুল আলাঃ স্বামী স্ত্রীর অধিকার, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯২।
২০. মওদুদী, সাইয়েদ আবুল আলাঃ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখা, ঢাকা, আবুল আ'লা মওদুদী রিসার্চ একাডেমী, ১৯৯২।
২১. আল খতিব, ফুয়াদ আবদুল হামিদ, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যস্থা, ১৯৯৩।
২২. মাওলানা, শামসুল হকঃ তাফসীর আহকামুল কুরআন, ঢাকা, ১৯৯৩।
২৩. তালিব, আবদুল মান্নানঃ বাংলাদেশে ইসলাম, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪।
২৪. সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী, ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি, ঢাকা, সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী রিচার্স একাডেমী, ১৯৯৪।
২৫. থানবী, মাওলানা আশরাফ আলীঃ ইসলামের দৃষ্টিতে নারী, অনুবাদ, মাওলানা কারামত আলী নিযামী, ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ১৯৯৪।
২৬. আলী, ফাতেমাঃ ইসলামে নারী, ঢাকা, মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৪।
২৭. জাফর, আবুঃ ইসলাম ও আত্মঘাতি মুসলমান, ঢাকা, পালাবদল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ১৯৯৪।
২৮. আতি, হামমুদাহ আবদালঃ ইসলাম একমাত্র জীবন বিধান, অনুবাদ, মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৪।

২৯. উমরান, আবদেল রহিম: ইসলামী ঐতিহ্য পরিবার পরিকল্পনা, অনুবাদ: শামসুল্ অলম, ঢাকা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ১৯৯৫।
৩০. আলী, আবুল হাছান, আল মুরগীসনানী: 'আল হিদায়া', মাকতারা থানভী, দেওবন্দ, ইউ .পি ভারত , ১৪০০।
৩১. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খণ্ড, প্রথম ভাগ, ইসলামিক আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৬।
৩২. মনুসর, আহমদ: বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (স), ঢাকা, তাসনিম পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬।
৩৩. বদরুদ্দৌজা, সৈয়দ: হযরত মুহাম্মদ (সা) তার শিক্ষা ও অবদান, দ্বিতীয় খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭।
৩৪. আবুল বাশার, মোহাম্মদ: মুসলিম পারিবারিক আইন কানুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৭।
৩৫. আবদুর রহিম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭।
৩৬. হামেদ আলী, সাইয়েদ: ইসলাম আপনার কাছে কি চায়, (অনু. আব্দুস সহীদ নাসিম), সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭।
৩৭. আনসারী, মাওলানা ইদরীস: মুসলমান স্বামী ও মুসলমান স্ত্রী, অনুবাদ: মাওলানা মুতীউর রহমান, ঢাকা, দারুল কিতাব, ১৯৯৭।
৩৮. মনিরুজ্জামান শাহ: মানব জীবনে ইসলাম, প্রথম খণ্ড, শায়খুল হিন্দ একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮।
৩৯. আল কারজাভী, ড. ইউসুফ: ইসলামী পূনর্জাগরণ সমস্যা ও সম্ভাবনা, অনুবাদ: মুহাম্মদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী, ঢাকা, ওয়াদুদ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮।
৪০. চৌধুরী আলীমুজ্জামান, ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও বাংলাদেশে মুসলিম আইন, মহানগর 'ল' বুক সেন্টার, ঢাকা ১৯৯৮।
৪১. উমরী, ড. আকরাম জিয়া আল: রাসূলের (সা.) যুগে মদীনার সমাজ রূপ ও বৈশিষ্ট্য, অনু. মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম, ঢাকা, ইসলামিক ইনস্টিটিউটি অব ইসলামিক থট, ১৯৯৮।
৪২. ইউনুস, মোহাম্মদ: চিরায়ত শান্তি ও স্থায়ী কল্যাণ, ঢাকা, ১৯৯৮।

৪৩. ইসলামী বিশ্ব কোষ, পঞ্চম খণ্ড, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮।
৪৪. তালাক ও হিলা শরীয়াহ ও প্রচলিতে আইনের তুলনামূলক আলোচনা: বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, ঢাকা, ১৯৯৯।
৪৫. তালিব, আবদুল মান্নান (সম্পাদক): ইসলামী আইন ও বিচার, ঢাকা ইসলামী রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, ১৯৯৯।
৪৬. আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ: বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন প্রচেষ্টায় মুসলিম এইড বাংলাদেশ-এর ভূমিকা: ইসলামী মডেলের একটি সমীক্ষা, এমফিল থিসিস, সেশন ১৯৯৩-১৯৯৪, ঢাকা: রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯।
৪৭. আবদুল হাই, মুহাম্মদ: নারী অধিকার, মাহবুব প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০।
৪৮. মওদুদী, সাইয়্যেদ আবুল আ'লা, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব, ঢাকা, জানুয়ারি ২০০১।
৪৯. মোহন, ইকবাল কবীর: বুক অব ইসলামিক নলেজ, ভেনাস প্রকাশনী, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ, ২০০১।
৫০. সরকার, সাহাব উদ্দিন: নারী নির্যাতনের রকমফের, ঢাকা, কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০১
৫১. গুপ্ত, প্রমোদ বন্ধুসেন: ধর্মদর্শন, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা, ২০০২।
৫২. আবু সুলাইমান, ড. আবদুল হামিদ আহমদ: ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, অনুবাদ মোঃ জয়নুল আবেদীন মজুমদার, ঢাকা, বি.আই, টি টি, ২০০২।
৫৩. মাহবুবুর রহমান, আত-তাশরী'উল ইসলামী ওয়া উকুবাতুল মুজরিমীন, রাজশাহী, আল-মাকতাবাতুশ শাফি'য়ীয়া, প্রথম সংস্করণ, ২০০২।
৫৪. রমেশচন্দ্র মুন্সী, শ্রী: ধর্মতত্ত্ব পরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, ২০০২।
৫৫. সাম্ভলী, মাওলানা মুহাম্মদ বুরহানুদ্দীন: পারিবারিক সংকট নিরসনে ইসলাম, অনুবাদ, অধ্যাপক আবুল কাসেম ছিফাতুল্লাহ, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩।

৫৬. সাঈদী, মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন: তাফসীরে সাঈদী, গ্লোবাল প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ, ২০০৩।
৫৭. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, তৃতীয় সংস্করণ, লেখক মণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪।
৫৮. আবদুল রশিদ মতিন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইসলামী প্রেক্ষিত (অনু. এ কেএম সালেহ উদ্দিন), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ঢাকা ২০০৫।
৫৯. ইবনে আবেদীন, রোদ্দুল মুহতার তাজীর অধ্যায় খণ্ড-৪, এস এম সাইদ কোম্পানী, করাচী।
৬০. শামসুর রহমান, গাজী, ইসলামের দণ্ডবিধি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
৬১. ইমাম আলাউদ্দিন আল কাছানী, বাদায়েউস সানায়ে কিতাবুল হুদুদ অধ্যায়, দারুল কিতাব, দেওবন্দ, ভারত, ৫ম খণ্ড।
৬২. আতত্ত্বহাবী, আবু জাফর: মুখতাছারু ইখতিলাফিল ওলামা দারুল বাছাইয়ের আল ইসলামিয়া, খণ্ড ৩।
৬৩. আবু বকর আল জাছছাছ: আহকামুল কুরআনুল কারীম, খণ্ড-৩, সুহায়িল একাডেমী।
৬৪. আল্লামা কুরতুবী আল জামে লী আহকামিল কুরআনিল কারীম, দারুল ফিকির, বৈরুত।
৬৫. মওদুদী, সাইয়েদ আবুল আলা: তাফহীমুল কোরআন, ৯ম খণ্ড, খায়রুন প্রকাশনী।
৬৬. ড. মোঃ ময়নুল হক, ইসলাম: পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
৬৭. আব্দুল মান্নান: ইসলামে তালাকের বিধানঃ নেকাহর গুরুত্ব, (অপ্রকাশিত), দারুল ইফতা, ঢাকা।
৬৮. সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল ওয়াসায়া, বাবু কাযাইন নাজরী আনিল মাই, রাশিদীয়া লাইব্রেরি, ১ম খণ্ড, ঢাকা।
৬৯. হজ্জাতুল্লাহিলো বালিগাহ, ২য় খণ্ড।
৭০. তুহফামুল আহ্ওয়াযী, ৪র্থ খণ্ড

৭১. আল কুরআন
৭২. তিরমিযি শরীফ, ৩য় খণ্ড
৭৩. সহীহ আল বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড
৭৪. মুসলিম শরীফ
৭৫. ইঞ্জিল শরীফ

ইংরেজি গ্রন্থ

1. Tylor, E. B.: Primitive Culture, Tr. John Murray, 1871, 3rd edition, 1891, vol.1,
2. Hermann Lotza, Outlin of Philosophy of Religion, Conybear's Tran's, 1892.
3. Jevons, F. B.: An Introduction to the History of Religion, Rethceeu, London, 1896
4. Jastrow, Ch. M.: The study of Religion, Alen and Co Ltd. London, 1901.
5. Caldecott and Mackintosh: Selection from the Literature of Theism, T and T. Clark, 1904.
6. Hoffding, H.: The Philosophy of Religion, Macmillan, London, 1906.
7. George Galloway: Principles of Religious Development, Macmillan, London, 1909.
8. Leuba, J.H: Psychological Study of Religion, Macmillan, 1912
9. Marett, R. R. The Threshold of Religion, 2nd ed., Methuin, London, 1914
10. Emile Durkheim, Elementary froms of the Religions Life, Tr. Geo, Allen and Unwin, 1915
11. Emile Durkheim, Elementary from ofthe Religions Life, Tr. Geo, Alen and Unwin, 1915.
12. Coe, G. A.: Psychology of Religion, Chicago University Press, Chieago, 1916.

13. Pringle-Pattison, A.S.: The idea of God in the Light of Recent Philosophy, Clarendon press, 1917.
14. Dougall, W. Me.: Social Psychology, 12th ed., Cambridge University Press, 1917
15. Bradley, F.H: Essays and Addresses on the Philosophy of Religion, Dent, 1921.
16. Hartland, E. S.: Articles in Encyclopaedia of Religion and Ethics, T. and T. Clark, 1921.
17. Frazer, Sir James, The Golden Bough, Macmillan, 3d ed., vol.1, 1923
18. Thouless, R. H: Introduction to the Psychology of Religion, Cambridge University, London, 1923.
19. Chatterjee, Satish Chandra: The problem of Philosophy, The University of Calcutta, Calcutta, 1964
20. Dictionary of the Bible, Hastings (ed), vol. III
21. Chese and Black Encyclopaedia Biblica.

ড. মুহাম্মদ আবু ইউসুফ একাধারে একজন গবেষক, শিক্ষাবিদ, কলামিস্ট, রাজনীতি বিশ্লেষক ও সমাজসেবী। তিনি লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুরের উত্তর কেরোয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। উত্তর কেরোয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় (বোর্ড স্কুল) থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে রায়পুর আলিয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে হাদিস শাস্ত্রে কামিল পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে অনার্স (স্নাতক), মাস্টার্স, এমফিল এবং পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। পেশাগত জীবনে ১৯৯৬ সালে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। ২০০৪ সালের এপ্রিলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন এবং শিক্ষক সমিতির নির্বাচিত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও বাংলাদেশ ইসলামী ইউনিভার্সিটি, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি, মানারাত ইউনিভার্সিটি, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটিতে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে 'বাংলাদেশের দরিদ্র বিমোচন প্রচেষ্টায় মুসলিম এইড বাংলাদেশ-এর ভূমিকাঃ ইসলামী মডেলের একটি সমীক্ষা' বিষয়ের উপর এম.ফিল এবং একই বিভাগ থেকে অধ্যাপক ড.আফতাব আহমদ-এর তত্বাবধানে 'বাংলাদেশের সমাজে ধর্মের ব্যবহার, অপব্যবহার, অসদ্ব্যবহার ১৯৯১-২০০১ : ফাতওয়ার একটি রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন।

১৯৯৫ সালে 'আমান' নামে চ্যারিটি ভিত্তিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন যা এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত। সংস্থাটি দেশব্যাপী মানব কল্যাণ ও দারিদ্য বিমোচনের কাজ সুনাম সুখ্যাতির সাথে করে আসছে। মুহাম্মদ আবু ইউসুফের গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্র বিস্তৃত। ইসলাম ও দারিদ্র বিমোচন, নারী অধিকার, সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ, ধর্মীয় নেতৃত্বের ভূমিকা, সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর একাধিক থিসিস, গবেষণা প্রবন্ধ রয়েছে। তিনি দৈনিক ইত্তেফাক, নয়াদিগন্ত, কালেরকণ্ঠ, আমার দেশ, যায়যায়দিন, সংগ্রাম পত্রিকায় কলাম লিখেন। বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য সেমিনার, প্রবন্ধ পাঠ, কর্মশালা, গোলটেবিল বৈঠক ও টিভি টকশো-তে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও সেমিনারের উদ্দেশ্যে আমেরিকা, বৃটেন, সৌদি আরব, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশ সফর করেন। ২০১৪ সাল থেকে বার্ডস নামে একটি শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের বিভিন্ন গবেষণা, শিক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন, নীতি-অধ্যয়ন ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি চার সন্তানের জনক। সহধর্মিনী নার্গিস ফারহানা শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকের দায়িত্ব পালন করেন।